PG BN S1-03 (DSC)

দ্বি-বার্ষিক স্নাতকোত্তর পাঠ্যক্রম

(সি.বি.সি.এস; এন.ই.পি ২০২০ অনুসরণে)

প্রথম ষাণ্মাসিক

বাংলার সমাজ ও সংস্কৃতি

বাংলা



পদ্মনাথ গোহাঞিবরুয়া মানবিক বিদ্যা অনুষদ

কৃষ্ণকান্ত সন্দিকৈ রাজ্যিক মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়

বিষয় বিশেষজ্ঞ মণ্ডলী

ড° উষারঞ্জন ভট্টাচার্য, অধ্যাপক, (অবসর প্রাপ্ত), বাংলা বিভাগ, গৌহাটি বিশ্ববিদ্যালয়

ড° জ্যোতির্ময় সেনগুপ্ত, সহযোগী অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ, প্রাগ্‌জ্যোতিষ মহাবিদ্যালয়

ড° কান্তারভূষণ নন্দী, সহকারী অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ, এল.ও.কে.ডি কলেজ

ড° সঞ্জয় ভট্টাচার্য, সহযোগী অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ, গৌহাটি বিশ্ববিদ্যালয়

পাঠ্যবিষয়ের সমন্বয় রক্ষাকারী : **ড° সৈকত রাউত**, কৃষ্ণকান্ত সন্দিকৈ রাজ্যিক মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়

ড° মৃণাল জ্যোতি গোস্বামী, কৃষ্ণকান্ত সন্দিকৈ রাজ্যিক মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়

অধ্যয়ন উপকরণ নির্মাণ গোষ্ঠীর সদস্য

অধ্যায়	লেখক
১, ৪ ও ৫	ড° ইন্দ্রাণী ভট্টাচার্য, জাগীরোড মহাবিদ্যালয়
২	ড° তিমির দে, পাণ্ডু মহাবিদ্যালয়
৩, ১০, ১১, ১২ ও ১৪	ড° সৈকত রাউত, কৃষ্ণকান্ত সন্দিকৈ রাজ্যিক মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়
৬	রিংকা দে, জাগীরোড মহাবিদ্যালয়
৭	ড° মধুমিতা সেনগুপ্ত, আর্য্য বিদ্যাপীঠ মহাবিদ্যালয়
৮ ও ৯	ড° জ্যোতির্ময় সেনগুপ্ত, প্রাগজ্যোতিষ মহাবিদ্যালয়
১৩	ড° বিশ্বজিৎ ভট্টাচার্য, করিমগঞ্জ মহাবিদ্যালয়

সম্পাদনা

বিষয়বস্তু ও ভাষা সম্পাদনা : ড. কান্তারভূষণ নন্দী, বাংলা বিভাগ, এল.ও.কে.ডি কলেজ
ড. সৈকত রাউত, কৃষ্ণকান্ত সন্দিকৈ রাজ্যিক মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়

গ্রন্থন বিভাগের সম্পাদনা : ড. সৈকত রাউত, কৃষ্ণকান্ত সন্দিকৈ রাজ্যিক মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়

This Self learning Material (SLM) of the Krishna Kanta Handique State Open University is made available under a Creative Commons Attribution-Non Commercial-Share Alike 4.0 License (international) http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/

ISBN :

কৃষ্ণকান্ত সন্দিকৈ রাজ্যিক মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের হয়ে পঞ্জীয়ক দ্বারা প্রকাশিত

মুখ্য কার্যালয় : পাটগাঁও, রাণী গেট, গুয়াহাটি- ৭৮১০১৭

নগর ক্যাম্পাস : রাষ্ট্রীয় সড়কপথ-২৭, রেশম নগর, খানাপাড়া, গুয়াহাটি-৭৮১০২২; www.kkhsou.in

পাঠ্য বিষয়ের পরিচয় : বাংলার সমাজ ও সংস্কৃতি

বর্তমান মডিউলটি CBCS দ্বারা প্রস্তাবিত NEP-2020 আদরা অনুযায়ী সাজানো একটি দ্বি-বার্ষিক স্নাতকোত্তর পাঠ্যক্রমের প্রথম ষাণ্মাসিকের জন্য গৃহীত পাঠ্য বিষয়। এই পাঠ্য বিষয়ের শিরোনাম 'বাংলার সমাজ ও সংস্কৃতি', শিরোনামটি মডিউলের অধীন পাঠে কী কী আয়ত্ত করা যেতে পারে, তার একটি সংক্ষিপ্ত বিবরণ দেয়। সমগ্র পাঠ্য বিষয়টি অধ্যয়ন করলে শিক্ষার্থী ও শিক্ষা অনুরাগীরা বাংলা সমাজ ও সংস্কৃতির বিশিষ্ট রূপগুলো সঙ্গে, তার পরিবর্তন-পরিবর্ধন ও সামগ্রিক গতি-প্রকৃতির সঙ্গে পরিচিত হবেন। বিশেষত জাতি হিসাবে বাঙালি জাতির উদ্ভব, বিস্তার, বিবর্তন ও যাপনকে এখানে পাঠ্য বিষয় হিসাবে নির্বাচন করা হয়েছে। শিক্ষার্থীদের বুদ্ধিবৃত্তির কৌতূহল এবং পরীক্ষা-ভিত্তিক উদ্দেশ্যের সমস্ত দিককে আয়ত্ত করার জন্য বাংলা সমাজ-সংস্কৃতির ইতিহাসে অন্তর্ভুক্ত এই সকল বিষয়কে নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। এই স্ব-অধ্যয়নমূলক বইটি শিক্ষার্থীদের জন্য একটি দিক-নির্দেশক সেতুবন্ধক মাত্র। আশা করা যায় আগ্রহী শিক্ষার্থীরা পাঠ্য অন্তর্গত পাঠগুলি ভালোভাবে আয়ত্ত করে তাদের সৃজনশীলতা এবং শেখার মান প্রদর্শন করতে সক্ষম হবেন এবং তাঁরা স্ব-শিক্ষা অর্জনের পথে সফলভাবে এগিয়ে যেতে পারবেন।

এই মডিউলটিতে সর্বমোট ১৪টি অধ্যায় রয়েছে। মডিউলটির প্রথম পাঠটির নাম 'মানব সংস্কৃতির পরিচয় ও ভারতীয় সমাজ-সংস্কৃতি'। যেখানে মূলত ভারতীয় মিশ্র সংস্কৃতির পরিচয়কে নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। পরবর্তী 'বাঙালি জাতি সংস্কৃতির ইতিহাস এবং বাঙালির সমাজ বিন্যাস' অধ্যায়টিতে বাঙালি জাতির সম্যক পরিচয় শিক্ষার্থীরা পাবেন। তৃতীয় অধ্যায়ে তুলে ধরা হয়েছে প্রাচীন বাংলার সামাজিক ও সাংস্কৃতিক জীবনকে। চতুর্থ, পঞ্চম, ষষ্ঠ অধ্যায়ে ক্রমান্বয়ে বাঙালির দৈনন্দিন যাপন, শিল্পকলা, ধর্মকর্ম ও ধ্যানধারণার দিকটিকে তুলে ধরা হয়েছে। বাংলার সমাজ সংস্কৃতিতে চৈতন্যদেবের প্রভাবকে কেন্দ্র করে পরবর্তী সপ্তম অধ্যায় নির্মিত হয়েছে। অষ্টম অধ্যায় বাংলার তুর্কী আক্রমণ ও নবাবী আমলের সময়টিকে তুলে ধরেছে। শিক্ষার্থী এই অধ্যায় পাঠ করে বাংলায় মুসলিম শাসনের ইতিবৃত্ত সম্পর্কে শিক্ষা অর্জন করতে পারবেন। এরপর নয়, দশ ও একাদশ 'ব্রিটিশ পর্ব ১/২ ও ৩' শীর্ষক অধ্যায়ে শিক্ষার্থীরা ভারতে ব্রিটিশ রাজত্বকালে সংঘটিত নানা সামাজিক ও রাজনৈতিক বিক্ষোভ সম্পর্কে জানতে ও শিক্ষা অর্জন করতে পারবেন। পরবর্তী দ্বাদশ, ত্রয়োদশ ও চতুর্দশ অধ্যায়ে 'স্বাধীনতা উত্তর বঙ্গীয় সমাজ ও সংস্কৃতি' নামে যে'কটি অধ্যায় রয়েছে তার মূল উদ্দেশ্য হল শিক্ষার্থীর জন্য স্বাধীনতা উত্তর বঙ্গীয় সমাজব্যবস্থা ও নবদ্ভূত দেশের রাষ্ট্র ব্যবস্থা সম্পর্কে বৌদ্ধিক জ্ঞান গড়ে তোলা। বঙ্গভঙ্গ থেকে শুরু করে দক্ষিণ আফ্রিকা থেকে ফিরে মহাত্মা গান্ধীর ক্রমান্বয় ভারতীয় জাতীয়তাবাদী আন্দোলনে যোগদান, বঙ্গীয় কংগ্রেস সরকারের পতন, যুক্তফ্রন্ট সরকারের ক্ষমতায়ন, কংগ্রেসের খাদ্য নীতি, বামফ্রন্ট সরকারের ঐতিহাসিক ভূমিনীতি সম্পর্কে এক বিস্তৃততর প্রেক্ষাপটকে ছুঁয়ে দেখার চেষ্টা করা হয়েছে। সাহিত্য যেহেতু সমাজ ও যাপনের সার্থক কায়াকল্প তাই সাহিত্যে পাঠ করতে যে ন্যূনতম সামাজিক জ্ঞান উপলব্ধি দরকার এই পাঠ্যক্রম শিক্ষার্থীকে তা সফল ভাবে দেওয়ার চেষ্টা করেছে।

এই পাঠ্য বিষয়গুলো অধ্যয়ন করার সময়, শিক্ষার্থী মূল পাঠের নীচে আয়তকার বাক্সের মধ্যে পাঠের অতিরিক্ত কিছু বিষয় 'জেনে রাখা ভালো' শিরোনামে জানতে পারবেন। আবার, 'অগ্রগতি নির্ধারক প্রশ্ন'-এর মাধ্যমে প্রদত্ত প্রশ্নাবলি শিক্ষার্থীর অধ্যয়নের অগ্রগতির স্ব-মূল্যায়নের সুবিধা দেবে। এই প্রশ্নাবলির উত্তর বা উত্তরের নির্দিষ্ট সংকেত 'অগ্রগতি নির্ধারক উত্তর-সংকেত'-এ উল্লেখ করা হয়েছে। 'অতিরিক্ত পঠন' বিভাগে উল্লিখিত বইগুলোও এই অধ্যায়ে আলোচিত বিভিন্ন ধারণার বিস্তারিত অধ্যয়নের জন্য সহায়ক, একইসঙ্গে এই অধ্যায়টি গড়ে ওঠার ক্ষেত্রে ঋণস্বীকারক হিসাবে গ্রহণ করা যেতে পারে। শিক্ষার্থী যদি এই বিষয় সম্পর্কে আরও জানতে চান তবে উল্লিখিত বইগুলো অধ্যয়ন করতে পারেন। কিছু নমুনা প্রশ্নও অধ্যায়ের শেষে 'আদর্শ প্রশ্নাবলি' হিসেবে দেওয়া হয়েছে।

বিষয় সূচি

অধ্যায় ১ : মানব সংস্কৃতির পরিচয় ও ভারতীয় সমাজ-সংস্কৃতি
ভারতীয় মিশ্র সংস্কৃতির স্বরূপ, ভারতীয় সমাজ-সংস্কৃতির অংশ হিসাবে বাঙালি সমাজের অবস্থান ও বিবর্তন

অধ্যায় ২ : বাঙালি জাতি ও সংস্কৃতির ইতিহাস এবং বাঙালির সমাজ বিন্যাস
প্রাচীন বাংলার ভৌগোলিক অবস্থান, বাঙালি জাতির পরিচয়, উদ্ভব ও ক্রমবিকাশ, বঙ্গের বাইরে বাঙালি জাতির পরিচয়

অধ্যায় ৩ : প্রাচীন বাংলার সাংস্কৃতিক ও সামাজিক পরিচয়
জীবনচিত্র, দৈনন্দিন জীবন, নগর ও পল্লীর জীবনাদর্শ, অন্ত্যজ বর্ণের জীবন ও যাপন চিত্র

অধ্যায় ৪ : বাঙালির সংস্কৃতি- দৈনন্দিন যাপন
বাঙালির খাদ্যাভ্যাস, সামাজিক আচার-ব্যবহার, জন্ম, মৃত্যু, বিবাহ আদি সামাজিক আচার-অনুষ্ঠান, পোশাক- পরিচ্ছেদ, অলঙ্কার, আসবাব, আমোদ-প্রমোদ, যানবাহন

অধ্যায় ৫ : বাঙালির সংস্কৃতি- শিল্পকলা
লোকায়ত শিল্প ও সংগীত, নৃত্য, মৃৎশিল্প, পাট শিল্প, বস্ত্র শিল্প, স্থাপত্য, ভাস্কর্য, চিত্র ও চারুকলা

অধ্যায় ৬ : বাঙালির সংস্কৃতি- ধর্মকর্ম ও ধ্যানধারণা
লৌকিক ধর্ম, বিশ্বাস, পৌরাণিক ধর্ম, বিশ্বাস ও উৎসব, বাংলার মেয়েলি লোকাচার, পার্বণ

অধ্যায় ৭ : চৈতন্যদেব ও বাংলার সংস্কৃতি
চৈতন্যদেব ও বাংলার সামাজিক রূপান্তর, চৈতন্যদেবকেন্দ্রিক বৈষ্ণবীয় সমাজের সংক্ষিপ্ত পরিচয় ও বিভিন্ন কীর্তন ঘরানা, খেতুরী উৎসব

অধ্যায় ৮ : তুর্কি আক্রমণ ও নবাবি আমল
তুর্কি আক্রমণ ও তার প্রতিফলন, বাংলার নবাব আমল ও বঙ্গীয় সমাজ-সংস্কৃতি

অধ্যায় ৯ : বাংলার সমাজ সংস্কৃতিতে ইংরেজ শাসন : ব্রিটিশ পর্ব-১
ব্রিটিশ শাসন প্রতিষ্ঠার পর্ব ও ব্যাপ্তি, নবজাগরণ, বাবু কালচার, জাতীয় কংগ্রেস প্রতিষ্ঠা, ইংরাজি শিক্ষার বিস্তার ও স্ত্রী শিক্ষা

অধ্যায় ১০ : মধ্যবিত্ত সমাজের উদ্ভব ও বিকাশ : ব্রিটিশ পর্ব-২
চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত, রায়তওয়ারি ব্যবস্থা, মধ্যবিত্ত সমাজের উৎপত্তির সংক্ষিপ্ত ইতিহাস, বাংলার মধ্যবিত্ত সমাজের লক্ষণ ও বৈশিষ্ট্য

অধ্যায় ১১ : বাংলার সমাজ সংস্কৃতিতে বিভিন্ন জাতীয় আন্দোলনের প্রভাব : ব্রিটিশ পর্ব-৩
বঙ্গভঙ্গ-বিরোধী আন্দোলন, মহাত্মা গান্ধীর আগমন, বিভিন্ন জাতীয় আন্দোলন, ট্রেড ইউনিয়ান, দেশভাগ, সভাসমিতি

অধ্যায় ১২ : স্বাধীনতা-উত্তর বঙ্গীয় সমাজ ও সংস্কৃতি-১

স্বাধীন ভারতবর্ষ, জাতীয় কংগ্রেসের অবস্থান, যুক্তফ্রন্ট সরকার, বাংলাদেশের গণবিক্ষোভ, অনুপ্রবেশ, উদ্বাস্তু সমস্যা

অধ্যায় ১৩ : স্বাধীনতা-উত্তর বঙ্গীয় সমাজ ও সংস্কৃতি-২

ভাষা আন্দোলন, নকশাল আন্দোলন, হাংরি আন্দোলন

অধ্যায় ১৪ : স্বাধীনতা-উত্তর বঙ্গীয় সমাজ ও সংস্কৃতি-৩

কলোনি প্রতিষ্ঠা, কংগ্রেসের খাদ্য ও ভূমি নীতি, পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা ও তার প্রতিফলন

অধ্যায় ১ : মানব সংস্কৃতির পরিচয় ও ভারতীয় সমাজ-সংস্কৃতি

বিন্যাস ক্রম

১.১ জ্ঞাতব্য বিষয়

১.২ পরিচিতি

১.৩ ভারতীয় মিশ্র সংস্কৃতি

১.৪ ভারতীয় মিশ্র সংস্কৃতির উপাদান

১.৫ ভারতীয় সমাজ সংস্কৃতি ও বাঙালি সমাজ

১.৫.১ বাঙালি জাতির পরিচয়

১.৫.২ বাঙালি সমাজ ও তার জাতিবিন্যাস

১.৬ বাঙালির ভাষা

১.৭ বাঙালির ধর্মসাধনা

১.৮ বাংলার অর্থনীতি

১.৯ অধ্যায় সংক্ষেপ

১.১০ অধ্যায়টি পাঠ করে আমরা কী শিখলাম

১.১১ অতিরিক্ত পঠন

১.১২ অগ্রগতি নির্ধারক উত্তর সংকেত

১.১৩ আদর্শ প্রশ্নাবলি

১.১ জ্ঞাতব্য বিষয়

এই অধ্যায় পাঠ করে শিক্ষার্থীরা—

- শিক্ষার্থীরা ভারতীয় ভাষা, ধর্ম, জাতিগোষ্ঠীর বিভিন্ন রীতিনীতির বৈচিত্র্য সম্পর্কে সম্যক ধারণা লাভ করতে পারবেন।
- বিভিন্ন জাতি ও সম্প্রদায়ের আগমন ও সংমিশ্রণে ভারতীয় সংস্কৃতির প্রেক্ষাপট কীরূপে গড়ে উঠেছে, তা অনুধাবন করতে পারবেন।
- ভিন্ন সংস্কৃতির সহাবস্থানে গড়ে ওঠা সমাজে পারস্পরিক শ্রদ্ধা ও সহনশীলতার গুরুত্ব বোঝানোর জন্য এই অধ্যায়টি পাঠ্যক্রমের অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।

১.২ পরিচিতি

মানব সংস্কৃতি মানুষের সৃষ্ট চিন্তা, বিশ্বাস এবং আচরণের একটি ধারাবাহিক প্রতিফলন বলা যায়। জীবজগতের মধ্যে শ্রেষ্ঠ ও শক্তিশালী জীব হচ্ছে মানুষ। মানুষ কেবল শারীরিক বিবর্তনের মধ্যে দিয়েই নিজেকে গড়ে তোলেনি বরং তার চিন্তাশক্তি, বিশ্বাস, শিল্প, সাহিত্য,

ভাষা, আচার-অনুষ্ঠান এবং সমষ্টিগত বৌদ্ধিক বিকাশের মাধ্যমে এক অনন্য সংস্কৃতি সৃষ্টি করতে সক্ষম হয়েছে। সংস্কৃতি হচ্ছে মানব সমাজের আত্মপরিচয়ের মূল ভিত্তি, যা সময়ের প্রবাহে রূপান্তরিত হয়েছে, সমৃদ্ধ হয়েছে এবং সভ্যতার প্রতিটি স্তরে পৌঁছে নতুন মাত্রা লাভ করেছে।

মানব সংস্কৃতির ইতিহাসের শেকড় আদিম যুগ থেকে বিশ্বায়নের যুগ পর্যন্ত বিস্তৃত। এই দীর্ঘ অভিযাত্রায় মানুষ ধীরে ধীরে ভাষার উন্মেষ ঘটিয়েছে, ধর্ম ও নৈতিক ধারণার জন্ম দিয়েছে, শিল্প ও সাহিত্যকে গড়ে তুলতে সক্ষম হয়েছে এবং এক দেশ থেকে অন্য দেশে জ্ঞান ও কৃষ্টির আদান প্রদানে নিজ জাতির মান বৃদ্ধি করেছে।

মানব সভ্যতার সূচনা হয়েছিল সহস্র বছর পূর্বে, যখন মানুষ প্রথমবারের মতো দলবদ্ধ জীবনযাপন শুরু করেছিল। শিকার, কৃষিকর্ম, গুহাচিত্র অঙ্কন ও আগুনের আবিষ্কারের মতো বিষয়কে প্রাচীন মানব সংস্কৃতির প্রাথমিক তথা মূল স্তম্ভ রূপে বিবেচনা করা হয়েছিল। মানব সংস্কৃতির সবচেয়ে প্রাচীন নিদর্শন পাওয়া যায় প্রাক্-ঐতিহাসিক যুগের গুহাচিত্রগুলোতে, যার মধ্যে অন্যতম ছিল ইউরোপের লাস্কো গুহা ও ভারতের ভীমবেটকা গুহাচিত্র ইত্যাদি যা আদিম মানুষের প্রাথমিক সাংস্কৃতিক চেতনার পরিচয় তুলে ধরে। এই পর্বের অন্যতম সাংস্কৃতিক অগ্রগতি ছিল মৌখিক ভাষার বিকাশ, যা ভাবের আদান-প্রদানকে সহজতর করে তুলেছিল। এই সময় থেকেই মানুষ প্রকৃতিকে দেবতা জ্ঞানে পূজা করতে শুরু করেছিল যা, পরবর্তীতে ধর্মের ভিত্তি স্থাপন করে। নব্যপ্রস্তর বা নিওলিথিক যুগে (খ্রিস্টপূর্ব ১০০০০-৩০০০) মানুষ শিকার ছেড়ে কৃষির জীবনকে বেছে নিয়েছিল। যার ফলে যাযাবর জীবন ছেড়ে স্থায়ী বসতি হিসেবে মানুষ সামাজিক সংগঠনের ভিত্তি হিসেবে গ্রাম গড়ে তোলে। বিভিন্ন ধাতব অস্ত্র ও পাত্রের ব্যবহারে সভ্যতার বিকাশে প্রযুক্তির প্রভাব স্পষ্ট হয় এই পর্বে। প্রাকৃতিক শক্তির পূজা, টোটেমিজম এবং অ্যানিমিজমের সূচনা এই পর্বের প্রাথমিক ধর্মীয় ধারণাকে স্পষ্টরূপে চিহ্নিত করে।

১.৩ ভারতীয় মিশ্র সংস্কৃতির স্বরূপ

মিশ্র সংস্কৃতি (Composite culture) বলতে বোঝানো হয় এমন একটি সংস্কৃতি, যা বিভিন্ন জাতি ধর্ম, ভাষা এবং সামাজিক ঐতিহ্যের মেলবন্ধনের ফলে উদ্ভূত হয়েছে। মিশ্র সংস্কৃতি একটি ঐতিহ্যগত এবং সামাজিক কাঠামো, যেখানে বিভিন্ন সাংস্কৃতিক উপাদান একে অপরকে প্রভাবিত করে এবং একটি ঐক্যবদ্ধ সমন্বিত সংস্কৃতি গঠন করে। ভারতবর্ষের সংস্কৃতি মিশ্র সংস্কৃতির অন্যতম উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত, কারণ ভারতবর্ষ একটি বিশাল দেশ। ইতিহাসের কাল থেকে এই ভারতবর্ষে চলমান মানবের ধারা প্রবাহিত হয়ে এসেছে। স্মরণাতীতকালে ভারতবর্ষে বিভিন্ন জাতি বিভিন্ন উদ্দেশ্য নিয়ে ভারতবর্ষে এসেছিল। একসময় ভারতবর্ষকে পদানত করতে ও অন্যান্য কারণে ভারতবর্ষে বিভিন্ন শক্তিশালী জাতি যেমন আর্য, অনার্য, দ্রাবিড়, চীন, শক, হুণ, পাঠান, মোগল এবং ইংরেজদের আগমন ঘটেছিল। তাদের মধ্যে কেউ এসেছিল ভারতবর্ষকে লুণ্ঠন করতে, আবার কেউ এসেছিল ভারতবর্ষকে শাসন করতে। এই বিভিন্ন জাতির মানুষেরা

তাদের সংস্কৃতির ছাপ ভারতভূমিতে রেখে গিয়েছিল। ভারতের বহমান নিজস্ব সংস্কৃতির সঙ্গে বহিরাগত বিবিধ জাতির সংস্কৃতির সমন্বয়ের ভারতবর্ষ হয়ে উঠেছিল মিশ্র সংস্কৃতির দেশ। তাই সঙ্গতকারণে কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁর 'ভারততীর্থ' কবিতায় ভারতবর্ষকে বলেছেন 'পুণ্যতীর্থ'। এই ভারতভূমি বহু জাতির ও বহু মানুষের সংস্কৃতির মিলনভূমি।

সংজ্ঞা ও স্বরূপ

ভারতীয় মিশ্র সংস্কৃতির সংজ্ঞা বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে ব্যাখ্যা করা যেতে পারে। ভারতীয় সংস্কৃতি একটি এমন সংস্কৃতি যেখানে একাধিক সংস্কৃতির উপাদান একত্রিত হয়ে একটি নতুন ও দৃঢ় সত্তা গঠন করেছে। এটি সাংস্কৃতিক, সামাজিক এবং ঐতিহাসিক প্রক্রিয়া। ভারতীয় মিশ্র সংস্কৃতির তাৎপর্য ব্যাখ্যা করতে গিয়ে বিভিন্ন পণ্ডিতেরা বিভিন্ন মত পোষণ করেছেন। ভারতীয় মিশ্র সংস্কৃতির তাৎপর্য বোঝানোর জন্য নিম্নে বিভিন্ন সমালোচকদের কিছু মন্তব্য তুলে ধরা হল :

(ক) ড. কোলাস মিশ্র সংস্কৃতির ধারণাকে ব্যাখ্যা করতে গিয়ে বলেছেন "মিশ্র সংস্কৃতি এমন একটি প্রক্রিয়া যা একটি নতুন সামাজিক কাঠামো তৈরি করে।" তাঁর মতে এটি একটি গতিশীল প্রক্রিয়া যেখানে সামাজিক বিভিন্ন উপাদান একে অপরকে প্রভাবিত করে এবং একটি সমন্বিত সাংস্কৃতিক পরিচয় তুলে ধরে।

(খ) ভারতীয় মিশ্র সংস্কৃতি সম্পর্কে সাহিত্যিক এ.কে. রামানুজনের মন্তব্য বিশেষভাবে প্রণিধানযোগ্য, "ভারতীয় সাহিত্যে একাধিক ধর্ম, ভাষা এবং জাতির সংস্কৃতির মিশ্রণ ঘটে, যা আমাদের সাহিত্যকে আরও সমৃদ্ধ এবং বৈচিত্র্যময় করে তোলে।" তিনি আরও মনে করেন, ভারতীয় সাহিত্য কখনও একক বা সুনির্দিষ্ট কোনো সংস্কৃতির প্রতিনিধিত্ব করে না, এটি বিভিন্ন সাংস্কৃতিক উপাদানের ফসল।

(গ) পণ্ডিত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মিশ্র সংস্কৃতির ধারণাকে ভারতীয় ভাষার মাধ্যমে প্রকাশ করেছেন। তিনি বলেছেন, "ভারতীয় ভাষাগুলির মধ্যে একাধিক সংস্কৃতির প্রভাব রয়েছে"। একে অপরের ভাষাগত বৈশিষ্ট্য গ্রহণ করে ভারতীয় ভাষাগুলি একটি সমৃদ্ধ ভাষিক ঐতিহ্য তৈরি করেছে।

(ঘ) সমাজবিজ্ঞানী নাজির আহমেদ মিশ্র সংস্কৃতির ধারণাকে সামাজিক প্রেক্ষাপটে ব্যাখ্যা করে বলেছেন "ভারতীয় সমাজে বিভিন্ন জাতি এবং ধর্মের মানুষের মধ্যে একধরনের সহযোগিতা ও সাংস্কৃতিক আদান—প্রদান ঘটে, যা মিশ্র সংস্কৃতির ভিত্তি তৈরি করে।"

(ঙ) ভারতীয় মিশ্র সংস্কৃতি সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের মন্তব্য বিশেষভাবে উল্লেখ্য, "ভারতবর্ষ কোনো নির্দিষ্ট ধর্ম বা জাতির দেশ নয়, এটি এক বহুমাত্রিক সভ্যতার মিলনক্ষেত্র। এখানে আর্য, অনার্য, মুসলমান, খ্রিস্টান সবাই মিলে এক স্বতন্ত্র ভারতীয় পরিচয় গড়ে তুলেছে।"

ভারতবর্ষ তার বৈচিত্র্যময় ইতিহাসের কারণে বিশ্বের অন্যতম প্রধান মিশ্র সংস্কৃতির দেশ হিসেবে পরিচিত। ভারতীয় মিশ্র সংস্কৃতি কোন একদিনে গড়ে ওঠেনি, এটি ধাপে ধাপে

বিভিন্ন প্রাচীন সভ্যতা ও জাতিগোষ্ঠীর সংযোগের মাধ্যমে বিকশিত হয়ে উঠেছে। ভারতীয় বৈচিত্র্যময় মিশ্র সংস্কৃতির ঐতিহাসিক বিবর্তনের প্রধান পর্যায়গুলো থেকে এর স্বরূপ সম্পর্কে একটি স্পষ্ট ধারণা পাওয়া যেতে পারে। পর্যায়গুলি হল :

(ক) সিন্ধু সভ্যতা ঃ (আনুমানিক খ্রিস্টপূর্ব ৩৩০০-১৫০০

সিন্ধু সভ্যতা শুধুমাত্র ভারতের উপমহাদেশেই নয়, সমগ্র বিশ্বের প্রাচীনতম নগর সভ্যতার মধ্যে অন্যতম। সিন্ধু সভ্যতা যে শহরগুলোকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছিল, তার উল্লেখযোগ্য শহরগুলোর মধ্যে রয়েছে — হরপ্পা (বর্তমান পাকিস্থান, পাঞ্জাব প্রদেশ) , মহেঞ্জোদারো (বর্তমান পাকিস্থান, সিন্ধুপ্রদেশ), কালিবঙ্গান, ধোলাভিরা, লোথাল। সিন্ধু সভ্যতার এই নগরগুলোর বিস্ময়কর বৈশিষ্ট্য হল সুপরিকল্পিত সুউচ্চ দুর্গ, শৃঙ্খলাবদ্ধ বাসস্থান এবং উন্নত জল নিষ্কাশন ব্যবস্থা। মহেঞ্জোদারোর 'গ্রেট বাথ' ছিল সিন্ধু সভ্যতার সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ স্থাপত্য শিল্প নিদর্শন।

সিন্ধু সভ্যতার অর্থনীতি মূলত কৃষিনির্ভর ছিল। তবে বাণিজ্যও অত্যন্ত সমৃদ্ধ ছিল। তাদের বাণিজ্য প্রসারিত হয়েছিল পারস্য উপসাগর মেসোপটেমিয়া (বর্তমান ইরাক) ও মধ্য এশিয়ার দেশগুলোর সঙ্গে। বাণিজ্যিক যোগাযোগের মাধ্যমে পারস্পরিক সংস্কৃতির আদানপ্রদানে ভারতীয় সংস্কৃতির সংমিশ্রণ ঘটে। নগরায়ন, বাণিজ্য স্থাপত্য ও সাংস্কৃতিক দিকগুলো সিন্ধু সভ্যতার বিস্ময়কর অবদান। যদিও এর পতন ঘটেছিল কিন্তু তার উত্তারাধিকার আজও বর্তমান ভারতীয় সমাজে ও সংস্কৃতিতে ছড়িয়ে আছে তার শিল্প, কৃষিব্যবস্থা, নগর পরিকল্পনা ও ধর্মীয় বিশ্বাসের মধ্যে।

(খ) বৈদিক যুগ (খ্রিস্টপূর্ব ২৫০০- ৫০০ অব্দ)

ভারতীয় সভ্যতা তার গতি, দিশা ও চরিত্র লাভ করেছিল বৈদিক যুগ থেকে। বৈদিক যুগ শুধুমাত্র প্রাচীন কিংবা ঐতিহাসিক যুগ নয়, এটি এক আর্ধমাত্বিক ও সাংস্কৃতিক অভিযাত্রা, যেখানে ধর্ম, দর্শন, সাহিত্য, সমাজব্যবস্থা ও জীবনচর্যার এক অনন্য সমন্বয় গড়ে উঠেছিল। প্রারম্ভিক বৈদিক যুগে আর্যসভ্যতা সিন্ধু ও পাঞ্জাব অঞ্চলে বিকশিত হয়। এই পর্বে ঋকবেদ রচিত হয়। এই সমাজ ছিল তুলনামূলকভাবে সরল ও সমানাধিকারের ওপর ভিত্তি করে গঠিত। এই সময় আর্যরা মূলত গোষ্ঠীগত জীবনযাপন করত, এবং তাদের পরিবারের প্রধান ছিলেন গৃহপতি। নারী সমাজে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করত এবং শিক্ষা ও ধর্মীয় কর্মকাণ্ডে অংশগ্রহণের অধিকার রাখত। গবাদিপশু পালন ছিল অর্থনীতির মূল ভিত্তি। পরবর্তী বৈদিক সমাজে বর্ণপ্রথার সূচনা ঘটে। ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় , বৈশ্য ও শূদ্র — এই বিভাজন সমাজকে দৃঢ় করে ও সময়ের সঙ্গে সঙ্গে এই প্রথা কঠোর হয়ে ওঠে। বৈদিক যুগে ধর্ম মূলত প্রকৃতি পূজার ওপর ভিত্তি করে গড়ে উঠেছিল। ইন্দ্র, অগ্নি, বরুণ ও সূর্য বিশেষভাবে পূজিত হতেন। এর পরবর্তীতে উপনিষদের যুগে ব্রাহ্মণ ও উপনিষদ রচিত হয়, যা ধর্মীয় চিন্তার গভীরতা বৃদ্ধি করেছিল। অদ্বৈতবাদ ও ব্রহ্মতত্ত্ব, কর্ম ও পুনর্জন্মের দর্শন, যোগচর্চা ও ধ্যান -এর ধারণা প্রতিষ্ঠিত হয়। বৈদিক যুগের চার বেদের যজুর্বেদের যজ্ঞ ও ধর্মীয় আচার সংক্রান্ত মন্ত্র, সামবেদের সংগীত ও স্তোত্র সংকলনগুলো

ভক্তিমুলক সঙ্গীতের প্রাচীনতম নিদর্শন, অথর্ববেদের দৈনন্দিন জীবনযাত্রা, চিকিৎসা মন্ত্র ও তন্ত্রের তথ্যসমূহ ভারতীয় সংস্কৃতির শক্তিশালী ভিত্তি তৈরি করেছে।

(গ) বৌদ্ধ ও জৈনসংস্কৃতি

ভারতের সাংস্কৃতিক ও দার্শনিক বিকাশের ইতিহাসে বৌদ্ধ ও জৈন সংস্কৃতির এক বিশাল অধ্যায় রয়েছে। খ্রিস্টপূর্ব ষষ্ঠ শতকে যখন ভারতীয় সমাজ ব্রাহ্মণ্যবাদী আচার ও কুসংস্কারের বেড়াজালে আবদ্ধ হয়ে পড়েছিল। তখন এই দুই ধর্ম প্রতিষ্ঠাপক মনীষী অর্থাৎ গৌতমবুদ্ধ এবং মহাবীর মানুষের মুক্তির বার্তা প্রচার করেছিলেন। যা শুধুমাত্র ভারতবর্ষেই নয়, সমগ্র বিশ্বে এক নতুন ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক বিপ্লবকে সৃষ্টি করেছিল। নির্বাণ লাভের পর গৌতম বুদ্ধ অহিংসাকে দুঃখমুক্তির পথ এবং আত্মজাগরণের বার্তা বলে প্রচার করেছিলেন। তিনি তার ধর্মকে চারটি মূল ভিত্তির ওপর প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন যা 'চতুরার্য সত্য' নামে পরিচিত। সম্রাট অশোক (খ্রিস্টপূর্ব ২৭৩-২৩২ অব্দ) বৌদ্ধধর্মকে সমাধিকভাবে প্রসারিত করেছিলেন, তিনি বিভিন্ন দেশে চীন, জাপান, কোরিয়া, শ্রীলঙ্কা , মিয়ানমার বৌদ্ধ ধর্ম প্রচার করেন। নালন্দা ও বিক্রমশীলা মহাবিহার স্থাপিত হয়, যা বৌদ্ধ সংস্কৃতির প্রধান কেন্দ্র হয়ে উঠেছিল । এই যুগের সাঁচি ও অমরাবতীর স্তূপ, অজন্তা ও ইলোরার গুহাচিত্র গৌতম বুদ্ধের বানী , তার জীবনচক্র ও ধর্ম প্রচারের চিত্রশিল্পের অনন্য নিদর্শন হয়ে রয়েছে।

অন্যদিকে জৈনধর্মের ২৪তম তীর্থঙ্কর মহাবীর রাজপরিবারের হয়েও কঠোর তপস্যার মাধ্যমে 'কেভাল জ্ঞান' (পরমজ্ঞান) লাভ করে মানুষের মধ্যে অহিংসা, আত্মসংযম ও সত্যবাদিতা প্রচার শুরু করেন। জৈন ধর্মের মূল ভিত্তি ছিল ত্রিরত্ন এবং অহিংসা, সত্য, অপরিগ্রহতা ও ব্রহ্মচর্য নীতির উপর গড়ে ওঠেছিল। জৈনধর্ম মূলত বণিক ও ব্যবসায়ীদের মধ্যে জনপ্রিয় হয়ে উঠেছিল। গুজরাট, রাজস্থান, কর্ণাটক ও তামিলনাড়ুতে এর বিস্তৃতি ঘটেছিল। রনকপুর জৈন মন্দির, দিলওয়ারার জৈনমন্দিরগুলি জৈনস্থাপত্যের অনন্য নিদর্শন রাখে। বৌদ্ধ ও জৈন সংস্কৃতির প্রভাব ভারতে ও বিদেশে বিস্তারিত হওয়ার ফলে সেই পর্বে অহিংসা, মানবতা ও মূল্যবোধ এবং ধর্মীয় শিক্ষা ভারতীয় সমাজকে নতুন গতিপথ দেখায়।

(ঘ) মধ্যযুগীয় বহিরাগত সংস্কৃতির প্রভাব ও সংমিশ্রণ

গুপ্তযুগ ও মৌর্যযুগের সংস্কৃতি ভারতবর্ষের ইতিহাসে অনেক রাজবংশের উত্থান ও পতনের সাক্ষ্য হয়েছে, কিন্তু খুব কম সাম্রাজ্যই এমন স্থায়ী প্রভাব রেখে গেছে যেমনভাবে রেখেছিল গুপ্ত সাম্রাজ্য। খ্রিস্টীয় চতুর্থ থেকে ষষ্ঠ শতক পর্যন্ত বিস্তৃত এই সাম্রাজ্যকে ভারতের স্বর্ণযুগ (Golden age) বলে অভিহিত করা হয়েছে। কারণ এইসময় বিজ্ঞান, গণিত, সাহিত্য, শিল্প , দর্শন এবং প্রাশাসনিক কাঠামো অসাধারণ উন্নতি লাভ করেছিল। গুপ্ত সাম্রাজ্যের শাসকরা একদিকে রাজনৈতিক ঐক্য স্থাপন করেছেন অন্যদিকে সাংস্কৃতিক ও বৌদ্ধিক বিকাশে নতুন দিগন্তের সূচনা করেছেন। গুপ্ত সাম্রাজ্যের সূচনা হয়েছিল শ্রীগুপ্ত নামক ক্ষত্রিয় রাজপুরুষের হাত ধরে। তাঁর উত্তরসুরি চন্দ্রগুপ্ত প্রথম, তার পুত্র সমুদ্রগুপ্ত ও দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্ত গুপ্ত সাম্রাজ্যের

সর্বোচ্চ বিস্তার ঘটান। গুপ্ত শাসকদের শাসনব্যবস্থা ছিল দক্ষ ও সুসংগঠিত। অর্থনীতি ও বাণিজ্যিক ক্ষেত্রে কৃষিজাত উৎপাদন এবং ভারতের বাণিজ্যিক কেন্দ্রগুলো (তাম্রলিপ্ত, পাটলিপুত্র , উজ্জয়িনী) আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের কেন্দ্র হয়ে উঠেছিল। গুপ্তরাজারা স্বর্ণ ও রৌপ্য মুদ্রা প্রচলন করেছিলেন। গুপ্ত সাম্রাজ্যের প্রধান দান হিন্দু সংস্কৃতি। এইসময় নতুন ভাষা ও সমাজ গঠিত হয়েছিল ও পুরাণ রচিত হয় এবং পৌরাণিক হিন্দু সমাজের পত্তন হয়েছিল। শিক্ষা ও সাহিত্যচর্চায় গুপ্ত আমল ছিল এক অবিস্মরণীয় সময়। এই সময় প্রতিষ্ঠিত নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয় পরবর্তীতে বিশ্বের শ্রেষ্ঠ বিদ্যাপীঠে পরিণত হয়েছিল। সংস্কৃত ভাষার ব্যাপক প্রসারে কালিদাসের অভিজ্ঞান শকুন্তলম, মেঘদূতম, রঘুবংশম নাটক সংস্কৃত সাহিত্যের নতুন দিক উন্মেচিত করে। বাণভট্টের 'হর্ষচরিত' নাটক ভারতীয় ঐতিহাসিক সাহিত্যের অন্যতম শ্রেষ্ঠ রূপে পরিগণিত। আর্যভট্ট তার গ্রন্থে শূন্যের ধারণা, দশমিক সংখ্যা পদ্ধতি ও পৃথিবীর ঘূর্ণনের বিষয় উল্লেখ করেন, অন্যদিকে বরাহমিহিরের জ্যোতির্বিদ্যা, ধন্বন্তরি চিকিৎসাবিদ্যার অবদানের ফলে গুপ্তযুগের বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির চরমভাবে বিকশিত হয়ে ওঠে। এই যুগের অজন্তার ১৬ ও ১৭ নং গুহাচিত্র, দেওঘরের দশাকার মন্দির, সারনাথ, ভিতরগাও ভারতবর্ষের চিরন্তন গৌরব। কিন্তু সুলতানগঞ্জের বুদ্ধমূর্তি, নালন্দার তাম্রনির্মিত সুবৃহৎ বুদ্ধমূর্তি এবং সর্বোপরি দিল্লির লৌহস্তম্ভ ও মথুরার গুপ্ত মূর্তি শিল্প গুপ্তযুগের কারুশিল্পের বাস্তব প্রমাণ।

(ঙ) ইসলামিক প্রভাব ও মোগল সাম্রাজ্যের সাংস্কৃতিক দিক

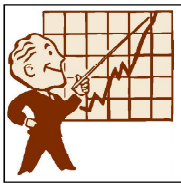
সুজলা সুফলা ভারতবর্ষের বুকে রাজত্ব করার উদ্দেশ্যে বহু জাতি বারে বারে ভারতবর্ষকে আক্রমণ করেছিল। রাজধানী দিল্লিকে কেন্দ্র করে পাঁচটি প্রধান রাজবংশের অধীনে ভারতবর্ষ শাসিত হয়েছিল। তাদের মধ্যে ছিলেন কুতুবউদ্দিন আইবক, ইলতুতমিস , আলাউদ্দিন খিলজি, ফিরোজ শাহ তুঘলক ও সিকান্দার লোদি। যাদের স্থাপত্য, সাহিত্য, সংগীত ও ভাষা, খাদ্যাভাসের প্রসারে ভারতীয় সংস্কৃতিতে ইসলামিক সংস্কৃতির সংমিশ্রণ ঘটায়। কুতুব মিনার, সিবি দুর্গ, কোটলা দুর্গের স্থাপত্য, ফরাসি ভাষার প্রসার ও উর্দু ভাষার বিকাশ ভারতীয় সাহিত্য ও ভাষার ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য অবদান রেখেছিল। এর পরবর্তীতে মোগল সাম্রাজ্য ভারতীয় সংস্কৃতিকে নতুন উচ্চতায় পৌঁছে দেয়। তাজমহল, ফতেহপুর সিক্রি, গোল গম্বুজ, লালকেল্লা প্রতিটি স্থাপত্যে ভারতীয় ঐতিহ্যের প্রতীক। মোগল দরবারে প্রচলিত তানসেনের ধ্রুপদ সংগীত ও বাদ্যযন্ত্র হিসেবে সেতার, তবলা ও সরোদ এর প্রচলন ভারতীয় সংস্কৃতিকে নতুন মর্যাদা দান করেছিল। শুধুমাত্র তাই নয়, মোগল চিত্রকলা, খাদ্য ও পোশাকের সংমিশ্রণে ভারতীয় সংস্কৃতির বিকাশ সাধন হয়। পরবর্তী মোগল যুগের সাহিত্যিক অবকাশে ভারতীয় ভাষা ও সাহিত্যগুলো পরিপুষ্ঠি লাভ করেছিল। ধর্মীয় সমন্বয়ের ফলে ভারতীয় সাহিত্যে এবং সংস্কৃতিতে সুফিবাদের প্রভাব লক্ষণীয়।

(চ) ব্রিটিশ শাসন ও পাশ্চাত্য প্রভাব

ভারতীয় সমাজ ও সংস্কৃতিতে ব্রিটিশ শাসন এক আমূল পরিবর্তন নিয়ে এসেছিল। পলাশীর

যুদ্ধ ও বক্সারের যুদ্ধের পর ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি ধীরে ধীরে ভারতীয় উপমহাদেশে আধিপত্য বিস্তার করে এবং সিপাহী বিদ্রোহের (১৮৫৮) পর ভারতবর্ষ সরাসরি ব্রিটিশ সরকারের অধীনে চলে যায়। এই সময় ভারতীয় সংস্কৃতি ও জীবনধারায় পশ্চিমা প্রভাব দৃঢ়তর হয়ে ওঠে। আইন ও বিচার ব্যবস্থার দিক থেকে আধুনিক প্রাশাসনিক কাঠামো তৈরি হয়। এই সময় ব্রিটিশরা অর্থনৈতিক বিকাশের ক্ষেত্রে রেলপথ নির্মাণ, টেলিগ্রাফ, ব্যাঙ্কিং ব্যবস্থা, বন্দর ও শহরায়নের মাধ্যমে আধুনিক অর্থনীতিতে বিকাশ সাধন করে। এই সময় কলকাতা, বোম্বাই (মুম্বাই), মাদ্রাজ, দিল্লি বাণিজ্যিক কেন্দ্র হিসেবে গড়ে ওঠে। লর্ড ম্যাকেলে প্রবর্তিত ইংরেজ শিক্ষানীতি এবং কলকাতা, মাদ্রাজ ও বোম্বেতে বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা, পশ্চিমা শিক্ষার প্রভাবে সমাজ সংস্কারমূলক বিভিন্ন আন্দোলন ভারতীয় শিক্ষা ও সংস্কৃতিতে নতুন দিগন্তের সূচনা করে। সংবাদের মতো গণমাধ্যম আধুনিক সাহিত্যে ও সমাজে জাতীয়তাবাদীর চেতনার উত্থান ঘটিয়েছিল এবং ভারতবর্ষের স্বাধীনতার পথে অগ্রসর হয়েছিল।

ভারতবর্ষ এক বহুবিচিত্র সংস্কৃতির দেশ। এখানকার সংস্কৃতি যুগ যুগ ধরে বিভিন্ন জাতি, ধর্ম, ভাষা ও আচার-অনুষ্ঠানের সংমিশ্রণে গড়ে উঠেছে। বহিরাগত ও অভ্যন্তরীণ সংস্কৃতির সমন্বয়ে ভারতীয় মিশ্র সংস্কৃতি এক অভিন্ন ঐতিহ্যে রূপান্তরিত হয়েছে। সুপ্রাচীনকাল থেকে এ দেশের সামাজিক বিন্যাসে আর্য-অনার্য, দ্রাবিড়-মঙ্গোলয়েড, মুসলিম-খ্রিস্টানসহ বহু জনগোষ্ঠীর সহাবস্থান এক বৈচিত্র্যপূর্ণ কিন্তু সুনির্দিষ্ট ঐক্যের রূপ সৃষ্টি করেছে। এই বিভিন্ন পর্যায়গুলোর ধর্মীয় সহনশীলতা, ভাষাগত বৈচিত্র্য, খাদ্যাভ্যাসের পরিবর্তন, পোশাকের রূপান্তর,উৎসব পালনের পদ্ধতি ও জীবনচর্যার ভিন্নতা মিলেমিশে এক সৌহার্দ্যের সুদৃঢ় ভিত্তি গড়ে উঠেছে।



অগ্রগতি নির্ধারক প্রশ্ন

১. মিশ্র সংস্কৃতির সংজ্ঞা ও স্বরূপ নিরূপণ করুন। (২০০ শব্দের মধ্যে)

১.৪ ভারতীয় মিশ্র সংস্কৃতির উপাদান

সংস্কৃতির উপাদান বলতে বোঝায় সেই মৌলিক উপকরণ বা বিষয়সমূহ যা বিভিন্ন উৎস থেকে উপাদান গ্রহণ করে একটি সংস্কৃতি নতুন রূপ পায়। এই উপাদানগুলোকে কয়েকটি ভাগে ভাগ করা যায়, যেমন—

(ক) জাতি জনগোষ্ঠীর সংমিশ্রণ

প্রাক্-ঐতিহাসিককাল থেকে আধুনিক যুগ পর্যন্ত ভারতের ভূখণ্ডে নানা জাতি, নৃগোষ্ঠী। ও সম্প্রদায়ের মানুষের আগমন ঘটেছে। আর্যদের আগমন, তার পরবর্তীতে শক, হুণ, কুষাণ, পাঠান,মোগল এবং সর্বশেষ ব্রিটিশ। ব্রিটিশদের মতো বহিরাগতরা শুধু রাজনৈতিক আধিপত্য বিস্তার করেনি; তাঁরা এদেশের সমাজ-সংস্কৃতির গভীরে প্রবেশ করে বৈচিত্র্যপূর্ণ জনগোষ্ঠীর সৃষ্টি করেছে। এই ভূখণ্ডের আদিম বাসিন্দারা ছিলেন মূলত অস্ট্রিক, দ্রাবিড় এবং মঙ্গোলয়েড

নৃগোষ্ঠীর মানুষ। পরবর্তীকালে আর্যদের আগমন এবং তাদের সঙ্গে এদেশীয় অনার্যদের সংঘাত ও সহাবস্থান এক নতুন সামাজিক কাঠামোর সূচনা করে, যার ভেতর থেকে জন্ম নেয় বর্ণাশ্রম প্রথা। মধ্যযুগে মুসলিম শাসকদের আগমন নতুন এক ধর্মীয়, ভাষাগত ও সাংস্কৃতিক মাত্রা যোগ করে। এই সমাজে এই ভিন্নতাকে প্রতিদ্বন্দ্বী না ভেবে পরিপূরক হিসেবে গ্রহণ করার ঐতিহাসিক প্রবণতা ভারতীয় জনগোষ্ঠীর সংমিশ্রণকে একটি সফল সহাবস্থানের আদর্শ উদাহরণ হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করেছে।

(খ) ভাষা বৈচিত্র্য

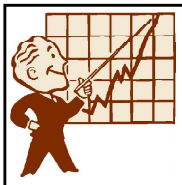
ভাষা ও সাহিত্য হল সংস্কৃতির অন্যতম প্রধান উপাদান, যখন একাধিক ভাষা পারস্পরিক আদান-প্রদান এবং রূপতাত্ত্বিক ও ধ্বনিতাত্ত্বিক পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে যায়, তখন একটি নতুন ভাষিক সংস্কৃতি গড়ে ওঠে। ভারতীয় ভাষাগুলিতে সংস্কৃত, পালি, প্রাকৃতের পাশাপাশি আরবি,ফারসি, তুর্কি , ইংরেজি ও পর্তুগিজ ভাষার প্রভাব রয়েছে। যেমন উর্দু ভাষা গড়ে উঠেছে হিন্দি ও ফারসি ভাষার সমন্বয়ে। ভারতে ২২টি সংবিধান স্বীকৃত ভাষা রয়েছে এবং ১৯৫০এর বেশি স্থানীয় ভাষা ও উপভাষা প্রচলিত। ভারতীয় ভাষা বৈচিত্র্যের সূচনা হয়েছে প্রাচীন সভ্যতার যুগ থেকে। সিন্ধু সভ্যতা থেকে শুরু করে বৈদিক যুগ যেখানে সংস্কৃত ভাষার সূচনা হয়। এর সঙ্গে গ্রাম্য, আঞ্চলিক ও বহিরাগতভাষার সংস্পর্শে ভারতীয় ভাষা নতুন রূপ ধারণ করে। মধ্যযুগের আরবি , ফারসি ও তুর্কি প্রভাব এবং পরবর্তী আধুনিককালে ব্রিটিশ শাসনের সময় পর্তুগিজ, ও ইংরেজি ভাষার সংযোজনের ফলে ভারতের ভাষাগত মানচিত্রটি আরও বহুমুখী হয়ে ওঠে।

(গ) ধর্মীয় সহাবস্থান

ভারতীয় সংস্কৃতির প্রাচীনতম ঐতিহ্য নিহিত রয়েছে তার বিভিন্ন ধর্মাবলম্বী মানুষের সংমিশ্রণে ও তাদের সহাবস্থানের ধারাবাহিকতার মধ্যে। শত শত প্রজন্ম ধরে এই ভূমি বিভিন্ন ধর্ম, বিশ্বাস ও আচার অনুষ্ঠানে মানুষের মিলনভূমি হয়ে উঠেছে। যেখানে হিন্দু, বৌদ্ধ, জৈন, মুসলিম , শিখ , খ্রিস্টান ও অন্যান্য ধর্মাবলম্বী মানুষেরা একত্রে বসবাস করে আসছে। এই ধর্মীয় সহাবস্থানের ফলে একে অপরের আদর্শ ও রীতির মাধ্যমে এক নতুন সম্মিলিত সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য গড়ে তুলেছে। প্রাচীন সভ্যতা থেকে মধ্যযুগ পর্যন্ত ভারতের সংস্কৃতিতে ধর্মের অগাধ বৈচিত্র্য লক্ষ করা যায়। বৈদিক ও উপনিষদের ধারা, বৌদ্ধ ও জৈন ধর্ম, মধ্যযুগীয় সুফি ও ভক্তি আন্দোলনের জীবনদর্শন এর প্রভাবে মানবতাবাদ এবং নৈতিক মূল্যবোধ জাগ্রত হয়। ধর্মীয় সহাবস্থানের ফলে সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক প্রভাবে সহমর্মিতা ও সহানুভূতির বোধ জাগ্রত হয়। উৎসবাদি ও অনুষ্ঠানে ধর্মীয় ভিন্নতা এক অনন্য জাতিশক্তি ও ঐক্যের বার্তা বহন করে। ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলন ও আধুনিক সংবিধানেও ধর্মনিরপেক্ষতার মূল নীতি প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, যা সকল ধর্মীয় সম্প্রদায়ের অধিকার ও স্বাতন্ত্রকে সম্মান করে।

ভারতীয় সংস্কৃতি এক সুদীর্ঘ ইতিহাসের বহমান স্রোতে গড়ে ওঠা এক বহুস্তরীয় ও বহুবিচিত্র

রূপের প্রতিফলন। ভারতীয় সংস্কৃতির প্রতিটি উপাদান বহিরাগত প্রভাব ও দেশীয় ঐতিহ্যের সংমিশ্রণে গঠিত এক যৌথ পরিচয়ের সাক্ষ্য বহন করে। এই উপাদানগুলো যেমন পরস্পর থেকে ভিন্ন তেমনি সেগুলোর আন্তঃসম্পর্ক ও সামঞ্জস্য ভারতের সাংস্কৃতিক শক্তির মূল উৎসকে চিহ্নিত করে।



অগ্রগতি নির্ধারক প্রশ্ন

১. ভারতীয় মিশ্র সংস্কৃতির উপাদান সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করুন। (২০০ শব্দের মধ্যে)

১.৫ ভারতীয় সমাজ সংস্কৃতি ও বাঙালি সমাজ

ভারতীয় উপমহাদেশের বৈচিত্র্যময় সমৃদ্ধ ইতিহাসের বৃহত্তর প্রেক্ষাপটে বাঙালি সমাজের অবস্থান একটি উজ্জ্বল ও গৌরবময় অধ্যায়। বাংলা ভাষা, সাহিত্য, শিল্পকলা, ধর্ম, আচার-অনুষ্ঠানে, খাদ্যাভ্যাস সর্বভারতীয় সামাজিক কাঠামোর প্রতিটি স্তরে বাঙালি সমাজের অনন্য অবদানে ভারতীয় সংস্কৃতিকে সমৃদ্ধ করে তুলেছে। বহু শতাব্দী ধরে বিভিন্ন জাতি, ধর্ম এবং সংস্কৃতির সংমিশ্রণে বাঙালি মানস ও সমাজ-সংস্কৃতি তার স্বকীয়তা বজায় রেখে ক্রমাগত সময়ের সঙ্গে বিবর্তিত হয়েছে।

১.৫.১ বাঙালি জাতির পরিচয়

'বাঙালি' শব্দটির আভিধানিক অর্থ হচ্ছে বঙ্গদেশের বাংলাভাষী জনসমষ্টি, অর্থাৎ যে জনজাতির মাতৃভাষা বাংলা। বাংলা নামের প্রাচীনত্ব নিয়ে নানা মুনির নানা মত রয়েছে। এই বাংলা ভাষী সম্প্রদায়ের নিজস্ব দেশের নাম ছিল বঙ্গদেশ। 'ঐতরেয় আরণ্যক' আখ্যানে প্রথম বঙ্গের নামের উল্লেখ পাওয়া যায়। বাৎস্যায়নের 'কামসূত্র' (৩য় — ৪র্থ শতকে রচিত) গ্রন্থেও গৌড় ও বঙ্গের উল্লেখ আছে। বোধায়নের 'ধর্মসূত্র'-এ বঙ্গজনপদকে কলিঙ্গদেশের প্রতিবেশী বলা হয়েছে। মহাভারতে ভীমের দিগ্বিজিয়ে বঙ্গেরই কলিঙ্গের রাজাদের পরাভূত করার কথা আছে। রামায়ণেও বঙ্গজনের কথা পাওয়া যায়। কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্রে বঙ্গজনের কথা পাওয়া যায়। বরাহমিহির, গৌড়, পৌণ্ড্র, বঙ্গ, সমতট ও তাম্রলিপ্ত নামের জনপদের উল্লেখ আছে। পালরাজারা বঙ্গপতি হয়ে 'গৌড়াধিপতি গৌড়শ্বের' নামে পরিচিত হতেন। শশাঙ্কের পর থেকে বাংলাদেশে তিনটি জনপদ অর্থাৎ পুণ্ড্র, গৌড় ও বঙ্গ যেন সমগ্র বঙ্গদেশের সমার্থক হয়ে উঠেছিল। মোগল আমলে এই দেশ সুবা 'বাঙলা' নামে পরিচিত হয়। নৃতাত্ত্বিক ব্যাখায় বাঙালি জাতির প্রাক্-ইতিহাসের অনুসন্ধানে যে কয়টি মূল জাতের উপাদান পাওয়া যায়, তাদের মধ্যে একটি লম্বা উঁচু মাথাওয়ালা জাতি অর্থাৎ "North Indian Aryan Long

Heads"। এরা মূল আর্যভাষী জাতি। এদের বঙ্গদেশে খুব অল্পই পাওয়া যায়, দ্বিতীয়টি লম্বা এবং ' নিচু মাথাওয়ালা জাতি' অর্থাৎ 'South Indian, বা 'Dravida' 'Munda', 'Long Heads'। আধুনিক দক্ষিণ ভারতের দ্রাবিড়ভাষী (তামিল) ও কোল জাতীয় লোকেরা এই শ্রেণিভুক্ত। তৃতীয়টি গোল মাথাওয়ালা জাতি বা 'Alpine Shortheads' — এদের নাক সরল, দাড়ি গোঁফের প্রাচুর্য, বাংলায় এদের সংখ্যা বেশি। চতুর্থ গোল মাথাওয়ালা আরেক জাতি বা Mongolian Short heads' অর্থাৎ মঙ্গোল জাতীয় লোক — যাদের নাক চ্যাপ্টা, গালের হাড় উঁচু, গোঁফ, দাড়ি কম। নৃতত্ত্ববিদরা আবিষ্কার করেছেন উল্লিখিত চার মৌলিক জাতির সংযোগে বা মিশ্রণে আধুনিক বাংলাভাষী জনসমষ্টির উদ্ভব হয়েছে। তাহলে বলা যায়, বাঙালির নৃতত্ত্বগত প্রধান পরিচয় হল এরা অস্ট্রিক গোষ্ঠীয়। অস্ট্রেলিয়ান আদিম অধিবাসীদের দৈহিক গঠনের সঙ্গে এদের মিল পাওয়া যায়। বাংলা অধিবাসীদের মধ্যে সাঁওতাল, লোধা, ভূমিজ, মহালি, মুন্ডা, খেড়িয়া প্রভৃতি উপজাতিরা এই বৈশিষ্ট্য সম্পন্ন।

পৃথিবীর অন্যান্য প্রাচীন সভ্যতার ন্যায় ভারতীয় সভ্যতাও নদীকেন্দ্রিক, তেমনি নদী তীরেই বাঙালির সভ্যতা সূচিত হয়েছিল। বঙ্গদেশ বা আধুনিক বাংলাদেশের গঙ্গানদী হচ্ছে ধাত্রীস্বরূপা। বহুযুগ পূর্বে বিভিন্ন ভৌগোলিক ও ভূতাত্ত্বিক বিবর্তনের ফলে 'প্লাওসিন' যুগে অর্থাৎ সমুদ্রের জলরাশির অপসারণের কালে হিমালয় পর্বতমালার কিছু অংশ দক্ষিণে বিস্তৃত হয়ে যাওয়ায় নাগা ও গারো পর্বতমালার সৃষ্টি করে। এই পর্বতমালা এবং উত্তরে হিমালয়কে বেষ্টন করে বঙ্গদেশ তার ভিত্তিভূমি রচনা করেছিল। গঙ্গানদীর দক্ষিণধারা ভাগীরথী নামে বঙ্গোপসাগরে মিশে দক্ষিণপূর্ব ধারা পদ্মা নামে বাংলাদেশে প্রবেশ করেছে। নিম্নধারা আরও দক্ষিণে প্রবাহিত হয়ে গঙ্গাসাগরে মিশেছে। এই গতিপথের পাশে একদিন গড়ে উঠেছিল বাংলার অসংখ্য গ্রাম ও জনবসতি। নদীই বাংলাদেশের ইতিহাসের স্রষ্টা — যা বাঙালি জাতিকে গড়েছে, তার বৈচিত্র্যময় ইতিহাসকে রচনা করেছে। কিন্তু এইটুকুতেই বাঙালি জাতির পরিচয় ধরা পড়ে না, বাঙালির সমগ্রতার পরিচয় তার প্রাচীন থেকে বর্তমান যুগ পর্যন্ত ঘটে যাওয়া বিবর্তনের মধ্যে ধরা পড়ে। যার আলোচনা নির্দিষ্ট কিছু ভাগে ভাগ করা হয়েছে।

১.৫.২ বাঙালি সমাজ ও তার জাতিবিন্যাস

ভাষাচার্য সুনীতিকুমার বাংলার সমাজ ও সংস্কৃতি সম্পর্কে বলেছিলেন "বাঙ্গালার সংস্কৃতি মুখ্যতঃ গ্রাম-জীবনকেই অবলম্বন করিয়া পুষ্টিলাভ করিয়াছিল। এদিকে বাঙ্গালাদেশ বোধহয় আদিম অস্ট্রিক জাতি হইতে প্রাপ্ত রিকথকে রক্ষা করিয়া আসিয়াছিল। প্রাচীন ভারতে গ্রাম ও নগর উভয়কেই আশ্রয় করিয়া সভ্যতার প্রকাশ ঘটিয়াছিল। গ্রামের বড় দান ছিল দার্শনিক চিন্তা ও আধ্যাত্মিক অনুভূতি, নগরের দান ছিল বাস্তব সভ্যতা, কর্মপ্রাণ সভ্যতা।" বিগত একহাজার বছর থেকে অবিভক্ত

বাংলাদেশের যে সংস্কৃতির বৈচিত্র্য আমরা দেখে আসছি, তা সত্যই বিস্ময়কর। একথা সর্বজনবিদিত যে বাংলাদেশের সমাজ একদা গ্রাম জীবনকে কেন্দ্র করে বেড়ে উঠেছিল। এবং বাঙালি সংস্কৃতি অস্ট্রিক, দ্রাবিড় এবং উত্তর ভারতের আর্য সংস্কৃতির মিশ্ররূপ । বাঙালি জাতির সমগ্রতার পরিচয় বহন করে তার সমাজ ও সংস্কৃতি। আলোচনার বিশ্লেষণের সুবিধার্থে তাকে কয়েকটি শ্রেণিতে ভাগ করা হয়েছে যাতে বাঙালির সামাজিক ও সাংস্কৃতিক দিক স্পষ্ট হয়ে উঠবে। বর্তমানে বাঙালি সমাজের একটা বিবর্তন প্রতিফলত হবে।

বাঙালি সমাজ সংগঠন আর্যসমাজ থেকে সম্পূর্ণরূপে আলাদা ছিল। আর্যসমাজ প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল বর্ণাশ্রম প্রথা অর্থাৎ ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র — এই চার বর্ণের ঔপর ভিত্তি করে। আর্য সমাজের পূর্বে এই দেশে যে সমাজ প্রতিষ্ঠিত ছিল তা কৌমসমাজ অর্থাৎ বিভিন্ন বৃত্তিধারী জাতিগোষ্ঠীর সমাজ। বাঙালির সামাজিক সংগঠন মূলত ছিল কৌমভিত্তিক সমাজ। বাংলার জনপদগুলিও এই সকল কৌমজাতির নামে অভিহিত হত। তার মধ্যে অন্যতম কৌমজাতি ছিল পুণ্ড্র, বঙ্গ, কার্বট। পুণ্ড্ররা পোদ জাতি এবং কৈবর্ত জাতি কার্বট কৌমের বংশধর ছিল। প্রাচীন বাংলায় আরেক জাতি ছিল বাগদি — যারা হাড়ি, ডোম, বাউড়ি প্রভৃতি জাতির পূর্বপুরুষ। চর্যাপদেও ডোম জাতির উল্লেখ রয়েছে। গুপ্তযুগের সময়ে উত্তর ভারত থেকে ব্রাহ্মণরা দলে দলে বাংলাদেশে এসে বসবাস শুরু করে এবং সামাজিক প্রতিষ্ঠা লাভ করেছিল। এইসকল ব্রাহ্মণরা বেদের বিভিন্ন শাখার অন্তর্ভুক্ত ছিল এবং বৈদিক যজ্ঞ ও ক্রিয়াকলাপাদি সম্পন্ন করা সম্বন্ধে তাদের বিশেষ পারদর্শিতা ছিল। ব্রাহ্মণদের মধ্যে 'গাঁই' প্রথার প্রচলন ছিল। 'গাঁই' গুলোর মধ্যে অন্যতম ছিল (ভট্ট, চট্ট, বন্দযো প্রভৃতি) পরবর্তীকালে এইগুলো উপাধি হিসাবে ব্যবহৃত হয়েছিল। গুপ্তযুগ থেকে পালযুগ পার হয়ে সেনযুগে ব্রাহ্মণ্যধর্মে পুনঃ প্রতিষ্ঠা ঘটে তখন বল্লাল সেন কর্তৃক কৌলীন্য প্রথা এবং তার বিভিন্ন শ্রেণিবিন্যাস পরিলক্ষিত হয়। সমসাময়িক তাম্রপট্ট লিপি কিংবা অন্যান্য লিপিসমূহের বাংলদেশে ব্রাহ্মণ ব্যতীত চারবর্ণের অন্তর্ভুক্ত ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য বর্ণের কোনো অস্তিত্ব ছিল না। তাম্রপট্ট লিপি থেকে যে ব্রাহ্মণেতর জাতিসমুহের উপাধি পাওয়া যায় তা হচ্ছে — পাল, দত্ত, মিত্র, বর্মণ, দাস, ভূতি, বিষ্ণু, যশ, শিব, রুদ্র ইত্যাদি। সমসাময়িক যুগে কায়স্থ জাতির উদ্ভব না হলেও পরবর্তীকালে থেকে বর্তমান পর্যন্ত ব্যবহার করে আসছে। যারা এক শ্রেণির রাজকীয় কর্মচারীরূপে বিভিন্ন পেশায় নিযুক্ত ছিল।

সেন রাজা বল্লালসেন দ্বারা যে নতুন করে সামাজিক সংগঠনের চেষ্টা করা হয়েছিল, সে প্রসঙ্গে হরপ্রসাদ শাস্ত্রী বলেছেন যে, সেন যুগে ব্রাহ্মণ্য ধর্মের পুনঃপ্রতিষ্ঠার সঙ্গে সঙ্গে বৌদ্ধধর্মাবলম্বী বহু মানুষ হিন্দু ধর্মে রূপান্তরিত হয়। পরবর্তীকালে রাঢ়দেশে যে 'বৃহদ্ধর্মপুরাণ' রচিত হয়েছিল, সেখানে নানান জাতি ও উপজাতিসমূহের তালিকা

রয়েছে। এই জাতি-উপজাতিরা সেন রাজত্বকালেও বর্তমান ছিল। নিম্নে যে তালিকটি দেওয়া হবে তা মূলত তৎকালীন জাতিসমুহের উৎপত্তিকে ভিত্তি করে করা হয়েছিল তা হচ্ছে বৃত্তিগত, কর্মগত ও নৃতাত্ত্বিক গোষ্ঠীগতভাবে। তালিকাটি হলো :

(১) উত্তম সঙ্কর : (গোত্রীয় ব্রাহ্মণরা যাদের পুরোহিতের কাজ করে)-(ক) করণ, (খ) অম্বষ্ঠ (গ) উগ্র, (ঘ) মগধ, (ঙ) গন্ধবণিক, (চ) কাংস্যবণিক, (ছ) শঙ্খবণিক, (জ) কুম্ভকার, (ঝ) তন্তুবায়, (ঞ) কর্মকার, (ট) সদগোপ (ঠ) দাস, (ড) রাজপুত, (ঢ) নাপিত, (ণ) মোদক, (ত) বারুজীবী, (থ) সুত (দ) মালাকার, (ধ) তাম্বুলি ও (ন) তৈলক।

(২) মধ্যম সঙ্কর : (ক) তক্ষ, (খ) রজক, (গ) স্বর্ণকার, (ঘ) সুবর্ণবণিক, (ঙ) আভীরঃ (চ) তৈলক, (ছ) ধীবর, (জ) শৌণ্ডিক, (ঝ) নট, (ঞ) শবক, ও (ট) জালিক।

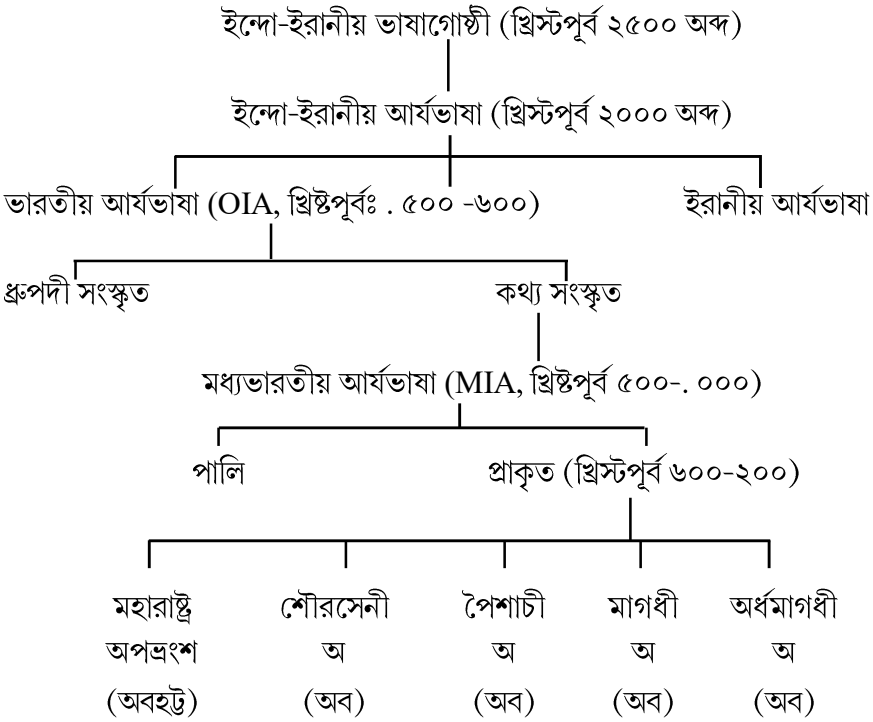
(৩) অন্ত্যজ্য : (ক) গৃহি, (খ) কুঞ্জব, (গ) চণ্ডাল, (ঘ) বাদুর, (ঙ) চর্মকার, (চ) ঘট্টজীবী, (ছ) দোলবাহী ও (জ) মল্ল।

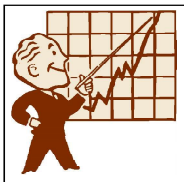
১.৬ বাঙালির ভাষা

বাংলা ভাষার উৎস অনুসন্ধান করতে গিয়ে দেখা যায়, ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষাগোষ্ঠীর অন্যতম শাখা ইন্দো-ইরানীয়ের একটি গোষ্ঠী এদেশে এসে প্রাচীন ভারতীয় আর্য (Old Indian Aryan) বা বৈদিক ভাষার জন্ম নেয়। সময়ের সঙ্গে, এদেশের ভাষার মিশ্রণে লৌকিক বা কথ্য সংস্কৃতের প্রসার ঘটে। প্রাচীন ভারতীয় আর্য ভাষার দুটি রূপ ছিল — সাহিত্যিক এবং মৌখিক। মূলত মৌখিক ভাষার বিকৃতিতে বিভিন্ন অঞ্চল ভেদে বিভিন্ন ভঙ্গিতে নতুন ভাষাস্তরে প্রাচ্য, প্রতীচ্য প্রাকৃত নামে অভিহিত হয়। প্রাচীনতম প্রাকৃত থেকে একসময় সাহিত্যিক ভাষা পালির জন্ম হয়। বৌদ্ধধর্ম ও দর্শন প্রচারের বাহন হিসেবে পালি ভাষার ব্যবহার প্রচলিত ছিল। প্রাকৃত ভাষাকে আঞ্চলিক ভাষা বলা হত। আঞ্চলিকতার ভিত্তিতে চারটি স্বতন্ত্র উপভাষার সন্ধান পাওয়া যায় — (১) দক্ষিণ-পশ্চিমা, (২) উত্তর-পশ্চিমা (৩) প্রাচ্য-মধ্য (৪) প্রাচ্যা। সাহিত্যিক স্তরে এইগুলোর নাম দেওয়া হয়েছে — (১) শৌরসেনী প্রাকৃত, (২) মহারাষ্ট্রি প্রাকৃত, (৩) পৈশাচী প্রাকৃত (৪) মাগধী প্রাকৃত (৫) অর্ধমাগধী প্রাকৃত। আরও কিছুকাল পরে এই পাঁচটি প্রাকৃত ভাষা অপভ্রংশ — অবহট্ট ভাষার জন্ম দেয়। এদের মধ্যে মাগধী অপভ্রংশ শাখার দুটি ভাষান্তর পূর্ব ও পশ্চিমার মধ্যে পূর্বী শাখার দুটি উপস্তর দেখা যায় — বঙ্গ-অসমীয়া ও ওড়িয়া। কালক্রমে বঙ্গ ও অসমীয়া আলাদা হয়ে বাংলা ভাষা স্বতন্ত্র ভাষার জন্ম নেয়।

এইভাবে প্রাচীন ভারতীয় আর্যভাষা (OIA), পরে মধ্য ভারতীয় আর্যভাষার দুটি স্তর এবং নব্য ভারতীয় আর্যভাষার স্তরগুলো ধ্বনিতত্ত্ব, রূপতত্ত্বগতভাবে নিজস্ব বৈশিষ্ট্য ও লক্ষণে স্বতন্ত্র। দীর্ঘকালীন ধারার বিবর্তনে বাংলা ভাষার জন্ম হয়েছে। আর এই বাংলা ভাষার লিখিত, কথ্য, সাহিত্যিক, দৈনন্দিন জীবনে ব্যবহৃত, মান্য বা আদর্শ কথ্য, অন্যান্য আঞ্চলিক বা গোষ্ঠীগত কথ্যভাষা রূপে স্বাতন্ত্র্য নিয়েই এগিয়ে চলেছে। বাংলা ভাষার অর্থাৎ একটি মূল ইন্দো-ইউরোপীয়

ভাষাগোষ্ঠী থেকে বর্তমান বাংলার উৎপত্তি ও বিবর্তনকে বোঝানোর জন্য একটি রেখাচিত্রের ব্যবহার নিম্নে সংযুক্ত করা হয়েছে —





অগ্রগতি নির্ধারক প্রশ্ন

৩. সংক্ষেপে বাঙালি জাতির পরিচয় সম্পর্কে লিখুন। (১৫০ শব্দের মধ্যে)

১.৭ বাঙালির ধর্মসাধনা

বৈদিক আর্য ও ব্রাহ্মণ্যধর্মের আগে বঙ্গদেশে স্বদেশীয় আদিম অধিবাসীদের অনার্য ধর্মের প্রচলন ছিল। মৃত্যুর পর আত্মার অস্তিত্বে বিশ্বাস করা, মৃত ব্যক্তির প্রতি শ্রদ্ধা, বিবিধ ঐন্দ্রজালিক প্রক্রিয়া ও মন্ত্রাদি, মানুষ ও প্রকৃতির সৃজন শক্তিকে মাতৃরূপে পূজা, টোটেম বা বিশেষ প্রতীক — এর প্রতি প্রবল ভক্তি এবং গ্রাম, নদী, বৃক্ষ, অরণ্য পর্বত ও ভূমির মধ্যে নিহিত থাকা শক্তিপূজা, মানুষের ব্যাধি ও দুর্ঘটনাসমূহ দুষ্ট শক্তি বা ভূতপ্রেত দ্বারা সংঘটিত হয় বলে বিশ্বাস ও বিবিধ নিষেধাজ্ঞা জ্ঞাপন অনুশাসন ইত্যাদি নিয়েই প্রাক্-আর্যযুগের ধর্ম গঠিত হয়েছিল। কালক্রমে এই সকল বিশ্বাস ও আরাধনা পদ্ধতি আর্যদের দ্বারা গৃহীত হয়েছিল এবং হিন্দুধর্মের সংস্কারগুলোর মধ্যে জন্ম, মৃত্যু, বিবাহ, শ্রাদ্ধ প্রভৃতি আনুষ্ঠানিক ধর্মকর্মে পরিণত হয়। ব্রাহ্মণ্যধর্মের বিভিন্ন পূজা পার্বণের অনুষ্ঠান যেমন দুর্গাপূজার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট নবপত্রিকার পূজা ও শারদোৎসব, নবান্ন, পৌষপার্বণ, হোলি, চড়ক, গাজন প্রভৃতি এবং বিভিন্ন আনুষ্ঠানিক কর্মে চাল, কলা,

কলাগাছ, নারিকেল, সুপারি,পান, সিঁদুর, ঘট প্রতিস্থাপন, আলপনা, শঙ্খধ্বনি, উলুধ্বনি, গোময় ও পঞ্চগব্যের ব্যবহার ইত্যাদি দেশীয় অধিবাসী সমাজ থেকে গৃহীত হয়েছিল। তাছাড়া আটকৌড়ে, সুবচনীপূজা, শিশুর জন্মের পর ষষ্ঠীপূজার প্রচলন , বিবাহে গাত্রহরিদ্রা, পানখিলি, গুটিখেলা,স্ত্রীআচার, লাজ বা খই ছড়ানো, দধিমঙ্গল, লক্ষ্মীপূজার সময় লক্ষ্মীর ঝাঁপি স্থাপন ইত্যাদি আচার যা বর্তমানকালেও হিন্দুধর্মের বাঙালিরা পালন করে থাকে, তা সকলই এই সমাজ থেকে প্রাপ্ত। এছাড়া বিভিন্নরূপ গ্রাম্য দেবদেবীর পূজা, ধ্বজাপূজা, বৃক্ষের পূজা, যাত্রাজাতীয় পর্বাদি, যেমন — দোলযাত্রা, রথযাত্রা, ঝুলনযাত্রা প্রভৃতি, ধর্মঠাকুর, মনসা, শীতলা, জাঙ্গুলি, পর্ণশবরী প্রভৃতির পূজা ও অম্বুবাচী অরন্ধন, প্রভৃতিই প্রাক্-আর্য সংস্কৃতির দান। এই প্রাক্-আর্য সংস্কৃতির উপরই ভিত্তি করে এদেশে জৈন, আজীবিক ও বৌদ্ধধর্মের প্রচলন শুরু হয়েছিল। তখনও এদেশে বৈদিক আর্যধর্মের অনুপ্রবেশ ঘটেনি। গুপ্তযুগের সময় থেকে ব্রাহ্মণ্যধর্মের রূপ পরিবর্তন হয়। তখন বৈদিক ধর্ম পৌরাণিক ধর্মে রূপান্তরিত হয়েছিল। তার আগে বাংলায় জৈন, আজিবীকা ও বৌদ্ধধর্ম প্রতিষ্ঠা লাভ করে। বাংলায় বহিরাগত ধর্মের মধ্যে সর্বপ্রাচীন ছিল জৈনধর্ম। এর আবির্ভাব ঘটেছিল মানভূম, সিংহভূম, বীরভূম ও বর্ধমান জেলায়। প্রাচীন বাংলায় আজীবিক ধর্মেরও প্রাবাল্য ছিল। এখানে আজীবিক ধর্মের প্রবর্তক ছিলেন মহাবীরের বিশেষ বন্ধু। সম্রাট অশোকের সময়কালে এই ধর্মের সম্প্রদায় সংখ্যাগরিষ্ঠ ছিল এবং জৈনদের সঙ্গে তাদের বিশেষ প্রভেদ ছিল না। পাল বংশের দ্বিতীয় সম্রাট ধর্মপালের দ্বারা বৌদ্ধধর্ম বাংলাদেশে আন্তর্জাতিক মর্যাদা লাভ করে। তার কিছুকাল পড়ে ব্রজযান নামে তান্ত্রিক বৌদ্ধধর্মে বাংলাদেশে জনপ্রিয়তা লাভ করেছিল। বজ্রযান তন্ত্রসাধনা অনুশীলনের চারটি কেন্দ্র পাল রাজাগণের পৃষ্ঠপোষকতায় গড়ে উঠেছিল — উজ্জয়ন, কামাক্ষ্যা, শ্রীহট্ট ও পূর্ণগিরি। এই চার পীঠস্থানে একটি করে ব্রজযোগিনীর মন্দির ছিল। ব্রজযানকে সহজিয়া বা সহজযান ধর্ম বলা হয়। অর্থাৎ সহজ পথে মানুষকে আত্মোপলব্ধির পথে নিয়ে যাওয়া। এই বৌদ্ধ চিন্তাধারা বা দর্শনই চর্যাপদের বিভিন্ন পদ সমূহে পাওয়া যায়। বাংলাদেশে জনপ্রিয় ধর্ম হিসাবে একসময় নাথধর্মের অভ্যুত্থান ঘটেছিল। নাথধর্ম শৈবধর্মের শাখাবিশেষ, তবে এর উপর বৌদ্ধ ও তন্ত্রের প্রভাবও ছিল। নাথধর্মাবলম্বীদের আদি পুরুষ মীননাথ। শিব নাথদের আরাধ্য দেবতা এবং 'কায়া' সাধনাই তাদের চরম লক্ষ্য ছিল। এই ধর্ম প্রধানত বাংলার নিম্নকোটি লোকেদের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল। মধ্যযুগে চৈতন্যদেবের প্রভাবে বাংলা গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্মের প্রবর্তন করেন। সপ্তদশ শতকের পূর্বে শক্তি সাধনার জনপ্রিয়তা বাংলায় লক্ষ্য করা যায়।

১.৮ বাংলার অর্থনীতি

প্রাচীন বাংলার অর্থনৈতিক ব্যবস্থা ছিল সমৃদ্ধ ও বহুমুখী। বাংলার প্রাচীন কৌমসমাজে শিকারের দ্বারা খাদ্যসংগ্রহ করত। সভ্যতার প্রথম পর্ব থেকেই লোকেরা কৃষিনির্ভর হতে শুরু করে। সে যুগের সামাজিক ও অর্থনৈতিক জীবনের বৈশিষ্ট্য ছিল কৃষির উপযোগী ভূমির চাহিদা। ডাক ও খনার বচন থেকে স্পষ্ট বোঝা যায় যে কৃষিকর্মের উদ্দেশ্য সাধনের জন্য সে যুগের

লোকেরা আবহাওয়া তত্ত্বকে জনপ্রিয় করে তুলেছিল। নদীমাতৃক ও বাংলার পলিমাটির দেশ তখন বাংলার অর্থনীতিতে কৃষির প্রাধান্যকে সহজেই উপলব্ধি করা যায়। কৃষিজাত ফসলের মধ্যে ধানই শীর্ষস্থান অধিকার করেছিল। ধানের চাষ অস্ট্রিকগোষ্ঠী ভুক্ত জাতির অবদান। বিবিধ ধানের সঙ্গে গম ও যব চাষের প্রচলন ছিল। ধানের পর আখ চাষ ও তার থেকে উৎপন্ন গুঁড় ও তুলোর চাষ বাংলা বৈদেশিক বাণিজ্যের বিশেষ পণ্য হিসেবে ব্যবহৃত হত। প্রাচীন বাংলায় সরিষা, এলাচ, আদা, লবঙ্গ, দারুচিনি, তেজপাতা, পিপুল, গুয়া সুপারী, নারকেল অনুরূপ ভাবে চাষ করা হত। কৃষিপ্রধান বাংলার অর্থনীতিতে কৃষির উপযোগী নানারূপ যন্ত্রের প্রচলন ছিল। তাম্রযুগে যন্ত্রপাতি তামা দিয়ে তৈরি হত। পড়ে যন্ত্রাদি লৌহ দ্বারা নির্মিত হয়। রাঢ়দেশে বহু অঞ্চলে লৌহের খনি ছিল। বর্তমান ভারতের লোহা ও তামার খনি এই অঞ্চলেই অবস্থিত, যা রাঢ় অঞ্চলের অন্তর্ভুক্ত ছিল। কৌটিল্যের 'অর্থশাস্ত্রে' 'গৌড়কি' নামে রুপার এবং স্বর্ণ, হীরক ও মুক্তার উল্লেখ আছে। গুপ্তযুগ পর্যন্ত স্বর্ণ, রৌপ্য ও তাম্রমুদ্রার বহুল প্রচলন ছিল। পাল ও সেন যুগে রুপা ও তামার মুদ্রা প্রচলন ছিল। কিন্তু সাধারণ প্রজার কেনাবেচার মাধ্যম ছিল কড়ি।

প্রাচীন বাংলার শিল্পজাত দ্রব্যের মধ্যে অতি সূক্ষ্ম কার্পাসবস্ত্র ব্যাপক প্রসিদ্ধি লাভ করেছিল। ইংরেজ আমলে এর নাম হয়েছিল 'মসলিন'। বাংলার মসলিন রোম সাম্রাজ্যে বিশেষ কদর লাভ করেছিল। বর্তমানকালে বাংলার অর্থনৈতিক ব্যবস্থাও কৃষিনির্ভর এবং পাশাপাশি বাণিজ্য ও কারিগরি শিল্পের আমদানি ক্রিয়াকলাপ প্রাচীনকাল থেকে ভারতবর্ষকে সমৃদ্ধ করে এসেছে।



অগ্রগতি নির্ধারক প্রশ্ন

৪. প্রাচীন বাঙালির অর্থনীতি সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করুন। (১৫০ শব্দের মধ্যে)

১.৯ অধ্যায় সংক্ষেপ

মানব সংস্কৃতির বিস্তৃত রূপ গড়ে উঠেছিল নদীমাতৃক সভ্যতাগুলোর মধ্য দিয়ে। এই সভ্যতাগুলো সাহিত্য, শিল্প, ভাষা, ধর্ম, বিজ্ঞান এবং শাসনব্যবস্থার ভিত্তি রচনা করেছিল। তার মধ্যে অন্যতম ছিল মেসোপটেমিয়া সভ্যতা বা ইরাক অঞ্চলের সভ্যতা (খ্রিস্টপূর্ব ৩৫০০-৫০০) মিশরীয় সভ্যতা (খ্রিস্টপূর্ব ৩১০০-৩০০), সিন্ধু সভ্যতা (খ্রিস্টপূর্ব ২৬০০-১৯০০) চীনা ও মায়ান সভ্যতা ইত্যাদি। যা ছিল মানব সংস্কৃতির প্রাচীন যুগ। মানব সংস্কৃতির মধ্যযুগীয়ও স্তরে বিভিন্ন ধর্মীয় সংস্কৃতির বৈচিত্র্য লক্ষ্য করা গিয়েছিল। বৌদ্ধধর্ম ও হিন্দু-সনাতন ধর্মের বিস্তার, ইসলামি সভ্যতা তথা ইউরোপে খ্রিস্টধর্মের প্রভাব স্পষ্ট রূপে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। এই পর্বে গ্রীক নাট্য ও মোগল চিত্রকলা উভয় শিল্পের ক্ষেত্রে যেমন আলোড়ন সৃষ্টি করে, তেমনি সংগীত ও সাহিত্য ক্ষেত্রে সুফিবাদ ও ভক্তি আন্দোলন সংস্কৃতির নতুন দিগন্তের সূচনা করেছিল।

চতুর্দশ শতকে রেনেসাঁ ও ইউরোপীয় নবজাগরণের ফলে আধুনিক যুগের উন্মেষ ঘটে, যেখানে বিজ্ঞান, শিল্প ও দর্শনের বিকাশের সংস্কৃতি বিবর্তন সাধিত হয়। আধুনিক বিশ্বায়নের ফলে সংস্কৃতির যে মিশ্রণ ঘটেছে তার ফলস্বরূপ টেলিভিশন, ইন্টারনেট, চলচ্চিত্র ও প্রযুক্তির বিভিন্ন ক্ষেত্র তৈরি হয়েছে। বিভিন্ন সাংস্কৃতিক প্রবাহ মানব সংস্কৃতিকে আন্তর্জাতিক স্তরে পৌঁছে দিয়েছে।

ভারতীয় সমাজ ও সংস্কৃতি মানব সভ্যতার ইতিহাসে এক অনন্য অবদান রেখে এসেছে, যা যুগে যুগে বিস্তার লাভ করেছে। সিন্ধু সভ্যতা থেকে ভারতীয় সমাজ সংস্কৃতি আজ পর্যন্ত তার মর্যাদা অক্ষুণ্ণ রেখেছে। তার অগণিত শাস্ত্র, দর্শন, শিল্প, সাহিত্য, সংগীত এবং আচার অনুষ্ঠান মানবজাতির চেতনাকে গভীরভাবে প্রভাবিত করেছে। ভারতীয় সংস্কৃতির একটি অন্যতম স্তম্ভ হচ্ছে তার বৈচিত্র্যময় এবং বহুস্তরীয় সমাজব্যবস্থা যা বিভিন্ন ধর্ম, সংস্কৃতি, ভাষা এবং বিভিন্ন সামাজিক গোষ্ঠী বা সম্প্রদায়ের সমন্বয়ে গঠিত হয়েছে। ভারতীয় সমাজব্যবস্থা বিশ্বের অন্যতম প্রাচীন সমাজব্যবস্থা যার মূল শিকড় প্রোথিত রয়েছে তার বৈচিত্র্যে, ঐতিহ্যে; যেখানে ধর্ম, আধ্যাত্মিকতা ও মানবিক মূল্যবোধ এক মহিমান্বিত রূপ লাভ করেছে। হিন্দু, বৌদ্ধ, জৈন ও শিখ দর্শনের গভীর চিন্তাধারা শুধু ভারতবর্ষেই নয় সমগ্র এশিয়ার সাংস্কৃতিক ভিত্তি রচনায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করেছে।

ভারতীয় সাহিত্য বিশ্বসাহিত্যের এক অমূল্য সম্পদ। মহাভারত ও রামায়ণের মতো মহাকাব্য শুধু ধর্মীয় আখ্যানমাত্র নয়, এই গ্রন্থগুলো মানবজীবনের নৈতিকতা, মূল্যবোধ ও জীবনবোধের প্রতিফলন ঘটিয়েছে। কালিদাস, বানভট্ট, রবীন্দ্রনাথ, মুন্সী প্রেমচাঁদ প্রমুখ সাহিত্যিকের সৃষ্টি ভারতীয় সমাজের আত্মপরিচয় বহন করে চলেছে। ভারতীয় ধ্রুপদী সংগীত বিশ্বসংগীতে এক স্বতন্ত্র স্থান অধিকার করে আছে। ভরতাচার্যের 'নাট্যশাস্ত্র' থেকে শুরু করে রবীন্দ্রনাথের নৃত্যনাট্য পর্যন্ত ভারতীয় নাট্যকলা ও নৃত্যকলার এক দীর্ঘ ও সমৃদ্ধ যাত্রা রয়েছে। বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির যুগেও ভারতীয় যোগচর্চা, আয়ুর্বেদ ও আধ্যাত্মিক দর্শন মানুষের মননশীলতাকে প্রসারিত করেছে। ভারতীয় সমাজ ও সংস্কৃতি শুধু তার নিজস্ব গণ্ডিতেই সীমাবদ্ধ থাকেনি, বরং প্রাচীনকাল থেকে বর্তমান পর্যন্ত জ্ঞান-বিজ্ঞান, শিল্প-সংস্কৃতি ও আধ্যাত্মিকতার মাধ্যমে বিশ্ব-সভ্যতাকে সমৃদ্ধ করে চলেছে।



১. ১০ অধ্যায়টি পাঠ করে আমরা কী শিখলাম

- শিক্ষার্থীরা ভারতীয় ভাষা, ধর্ম, জাতিগোষ্ঠীর বিভিন্ন রীতিনীতির বৈচিত্র্য সম্পর্কে সম্যক ধারণা লাভ করতে পারলাম।
- বিভিন্ন জাতি ও সম্প্রদায়ের আগমন ও সংমিশ্রণে ভারতীয় সংস্কৃতির প্রেক্ষাপট কীরূপে গড়ে উঠেছে, তা অনুধাবন করতে পারলাম।



১.১১ অতিরিক্ত পঠন

আচার্য্য, ড. দেবেশ কুমার (২০১৮); বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস, কলকাতা : ইউনাইটেড বুক এজেন্সি

চট্টোপাধ্যায়, কুন্তল (১৪১৮ বঙ্গাব্দ); সাহিত্যের রূপ-রীতি ও অন্যান্যপ্রসঙ্গ; কলকাতা : রত্নাবলী

চট্টোপাধ্যায়, তপনকুমার (আগস্ট, ২০১৭); কলকাতা : প্রজ্ঞাবিকাশ

চট্টোপাধ্যায়, পার্থ (২০০৮); বাংলা সাহিত্য পরিচয় ও সাহিত্য টীকা, কলকাতা : তুলসী প্রকাশন

বন্দোপাধ্যায়, অসিতকুমার (২০১৬-২০১৭); বাংলা সাহিত্যের সম্পূর্ণ ইতিবৃত্ত; কলকাতা : মডার্ণ বুক এজেন্সী প্রাইভেট লিমিটেড

রায়, নীহাররঞ্জন; (১৩৫৯ বঙ্গাব্দ); বাঙালির ইতিহাস: আদিপর্ব কলকাতা : লেখক-সমবায়-সমিতি

সুর, ড. অতুল (২০১৭); বাংলা ও বাঙালির বিবর্তন; কলকাতা: সাহিত্যলোক

১.১২ অগ্রগতি নির্ধারক উত্তর সংকেত

(১) নং প্রশ্নের উত্তর সংকেত : ভারতীয় মিশ্র সংস্কৃতির সংজ্ঞা বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে ব্যাখ্যা করা যেতে পারে। ... ড. কোলাস মিশ্র সংস্কৃতির ধারণাকে ব্যাখ্যা করতে গিয়ে বলেছেন ...পণ্ডিত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মিশ্র সংস্কৃতির ধারণাকে ... ভারতীয় মিশ্র সংস্কৃতি সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের মন্তব্য বিশেষভাবে উল্লেখ্য... -এভাবে উত্তর সাজিয়ে লিখুন। (দ্রষ্টব্য ১.৩ অংশ)

(২) নং প্রশ্নের উত্তর সংকেত : সংস্কৃতির উপাদান বলতে বোঝায় সেই মৌলিক উপকরণ... এই উপাদানগুলোকে কয়েকটি ভাগে ভাগ করা যায়, যেমন---- (ক) জাতি জনগোষ্ঠীর সংমিশ্রণ... (খ) ভাষা বৈচিত্র্য ....(গ) ধর্মীয় সহাবস্থান... -এভাবে উত্তর সাজিয়ে লিখুন। (দ্রষ্টব্য ১.৪ অংশ)

(৩) নং প্রশ্নের উত্তর সংকেত : 'বাঙালি' শব্দটির আভিধানিক অর্থ হচ্ছে বঙ্গদেশের বাংলাভাষী জনসমষ্টি, ... নৃতাত্ত্বিক ব্যাখায় বাঙালি জাতির প্রাক-ইতিহাসের অনুসন্ধানে যে কয়টি মূল জাতের উপাদান পাওয়া যায়... অস্ট্রেলিয়ান আদিম অধিবাসীদের দৈহিক গঠনের সঙ্গে এদের মিল পাওয়া যায়।...-এভাবে উত্তর সাজিয়ে লিখুন। (দ্রষ্টব্য ১.৫.১ অংশ)

(৪) নং প্রশ্নের উত্তর সংকেত :প্রাচীন বাংলার অর্থনৈতিক ব্যবস্থা ছিল সমৃদ্ধ ও বহুমুখী। ... কৃষিজাত ফসলের মধ্যে ধানই শীর্ষস্থান অধিকার করেছিল। ধানের চাষ অস্ট্রিকগোষ্ঠী

ভুক্ত জাতির অবদান।... কিন্তু সাধারণ প্রজার কেনাবেচার মাধ্যম ছিল কড়ি।...-এভাবে উত্তর সাজিয়ে লিখুন। (দ্রষ্টব্য ১.৮ অংশ)



১.১৩ আর্দশ প্রশ্নাবলি

(১) ভারতীয় মিশ্র সংস্কৃতি হিসেবে বাঙালি জাতির অবদান সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করুন।

(২) বাঙালি জাতির ভাষার উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করুন।

(৩) বাঙালির ধর্মসাধনা পদ্ধতি ও সমসাময়িক কালে প্রচলিত প্রধান ধর্মগুলির উৎপত্তি সম্পর্কে আলোচনা করুন।

(৪) বাঙালি সমাজ ও তার জাতিবিন্যাস বিষয়ে একটি প্রতিবেদন প্রস্তুত করুন।

আধ্যায় ২ : বাঙালি জাতি ও সংস্কৃতির ইতিহাস এবং বাঙালির সমাজ বিন্যাস

বিন্যাস বিন্যাস

২.১ জ্ঞাতব্য বিষয়
২.২ পরিচিতি
২.৩ প্রাচীন বাংলার ভৌগোলিক অবস্থান
২.৪ বাঙালি জাতির পরিচয়
২.৪.১ উদ্ভব ও ক্রমবিকাশ
২.৫ বঙ্গের বাইরে বাঙালি জাতির পরিচয়
২.৬ শব্দার্থ ও টীকা
২.৭ অধ্যায়টি পাঠ করে আমরা কী শিখলাম
২.৮ অগ্রগতি নির্ধারক উত্তর-সংকেত
২.৯ অতিরিক্ত পঠন
২.১০ আদর্শ প্রশ্নাবলি

২.১ জ্ঞাতব্য বিষয়

এই আধ্যায়টি পড়ে আপনি

- প্রাচীন বাংলা ভৌগোলিক পরিসীমা সম্পর্কে অবগত হবেন । বাঙালি জাতির পরিচয় জানতে পারবেন ।
- ভারতবর্ষে বাঙালি জাতি কত পুরোনো সে সম্পর্কে জানতে পারবেন । তার উদ্ভব ও ক্রমবিকাশ সম্বন্ধে সাধারণ জ্ঞান অর্জন করতে পারবেন ।
- প্রাচীন বাঙালির সাংস্কৃতিক ইতিহাস ও বঙ্গের বাইরে বাঙালির পরিচয় জানতে পারবেন ।
- বাঙালির সমাজ বিন্যাস অর্থাৎ বাঙালির সামাজিক ইতিহাস ও ঐতিহ্য সম্পর্কে নির্বাচিত অনেক প্রশ্নের উত্তর লিখতে পারবেন ।

২.২ পরিচিতি

বাঙালি জাতি কত পুরোনো ? কবে থেকে এর উৎপত্তি ? এর ভাষা কীভাবে সৃষ্টি হল ? -এ সম্পর্কে আমাদের একটি স্বাভাবিক কৌতূহল সৃষ্টি হয় । যে বাঙালি জাতি নিয়ে আমরা গর্ব করি , তার সাংস্কৃতিক ইতিহাস আমাদের জানা দরকার । সর্বোপরি জানা দরকার প্রাচীন বাংলার

ভৌগোলিক পরিসীমা । ধরুন সময়টা প্রায় দুই-তিন হাজার বছর আগের ঘটনা । এখন থেকে যদি আমরা পিছিয়ে যেতে যেতে প্রায় সেই সময়টাতে পৌঁছাই , তাহলে দেখব আমাদের প্রাচীন জনপদ, ভৌগোলিক পরিসীমা এবং বাঙালি জাতির উৎপত্তি কত রোমাঞ্চকর।

আপনাদের বর্তমান অধ্যায়ে যে বিষয়গুলি পড়তে হবে সেগুলো বিভিন্ন সময়ের অবদান। তা কোনভাবেই একদিনে গড়ে উঠেনি । প্রাচীন বাঙালির ভিন্ন ভিন্ন প্রসঙ্গের মুখোমুখি হবেন আপনারা।

এখানে বলে রাখি, আপনাদের পুরোনো বা প্রাচীন বাঙালির ইতিহাস এখানে জানতে হবে। প্রাচীন বাংলার ভৌগোলিক পরিসীমা , বাংলার সংস্কৃতির ইতিহাস এবং বাঙালির সমাজ বিন্যাস কত প্রাচীন বা পুরোনো সেই বিষয় জানবেন ও বিশ্লেষণ করবেন । এছাড়া বঙ্গের বাইরে বাঙালি জাতির পরিচয় সম্পর্কে জানবেন ।

২.৩ প্রাচীন বাংলার ভৌগোলিক অবস্থান

বর্তমান আমরা যে বঙ্গভূমিকে দেখি তা খণ্ডিত বঙ্গ বা বাংলা। যুগে যুগে বাংলার ভৌগোলিক পরিসীমা নানান কারণে বদলে গেছে। ১৯৪৭ সনের পর বাংলা চিরতরে দু'ভাগ হয়ে পড়ে। পশ্চিম ও পূর্ব বঙ্গ। বর্তমান পূর্ববঙ্গ একটি স্বতন্ত্র রাষ্ট্র 'বাংলাদেশ' নামে আমরা জানি। কিন্তু বঙ্গভূমির এই অবস্থান প্রাচীন যুগে ছিল না। এক সময় আমাদের বঙ্গভূমি বিশাল আকারে ছিল। ঋক্‌বেদের 'ঐতরেয় আরণ্য'কে প্রথম 'বঙ্গ' নামটি পাওয়া যায়। বাঙালির আবাসভূমি 'বঙ্গদেশ' বহু জাতির আবাসস্থল হওয়ায় তা যেমন বহু জনপদে বিভক্ত ছিল তেমনই সেইসব জনপদের নামও বিভিন্ন ছিল। মহাভারতের যুগে উল্লেখ আছে যে , বঙ্গ ,পুণ্ড্র , সুহ্ম ,তাম্রলিপ্ত এক একটি আলাদা রাজা ছিল। কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্রে 'গৌড়'-এর উল্লেখ আছে। কালিদাসের রঘুবংশম্ কাব্যে 'বঙ্গ' ও 'সুহ্ম' দুটির নামের উল্লেখ আছে।

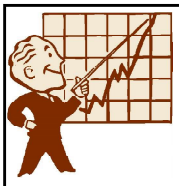
নদীকে কেন্দ্র করেই প্রাচীন বাংলার ভৌগোলিক সীমা তৈরি হয়েছিল - ভাগীরথী , পদ্মা ও মেঘনা। এর এক একটি অঞ্চল বর্ধিষ্ণু ছিল । প্রাচীন বাংলার প্রধান প্রধান অঞ্চলগুলি হল — পুণ্ড্রবর্ধন, বরেন্দ্র, বঙ্গ, গৌড়, সমতট, হরিকেল, রাঢ় ও বঙ্গাল। পুণ্ড্রবর্ধন ছিল প্রাচীন বাংলার বড় অঞ্চল। এই অঞ্চলটি বর্তমানের বাংলাদেশের বগুড়া, রাজশাহী ,অবিভক্ত দিনাজপুর ও পাবনা। গুপ্ত যুগে এই এলাকাটি তাদের শাসনাধীন ছিল। বরেন্দ্র অঞ্চলটি ভাগীরথী ও করোতয়া নদীর অংশে ছিল। বাঙ্গাল এলাকাটি সুদূর বঙ্গোপসাগরের উপকূল পর্যন্ত প্রসারিত ছিল।

খ্রিস্টীয় সপ্তম শতকে মহারাজা শশাঙ্কের রাজত্বে গৌড়ের সীমানা বেড়ে যায় । মুর্শিদাবাদ ছিল গৌড়ের প্রধান এলাকা। শশাঙ্কের আমলে পুণ্ড্রবর্ধন থেকে ওড়িশার উপকূল পর্যন্ত গৌড়ের সীমানা ছিল।

অজয় নদ'কে কেন্দ্র করে রাঢ় অঞ্চলের দুটি ভাগ গড়ে উঠেছিল । উত্তর রাঢ় ও দক্ষিণ রাঢ়। উত্তর রাঢ় অঞ্চলের অংশ ছিল মুর্শিদাবাদের পশ্চিম ভাগ, বীরভূম, সাঁওতাল পরগণা, বর্ধমানের কাটোয়া পর্যন্ত আর দক্ষিণ রাঢ় অঞ্চল ছিল হাওড়া, হুগলি এবং বর্ধমানের বাকি অংশ। প্রাচীন

সমতট অঞ্চল মেঘনা নদীর পূর্ব দিক পর্যন্ত প্রসারিত ছিল। বাংলাদেশের নোয়াখালি, কুমিল্লা এই অঞ্চলের অন্তর্গত। আবার সমতটের দক্ষিণ-পূর্ব দিকে চট্টগ্রাম, উপকূল অঞ্চল প্রাচীন বাংলায় হরিকেল নামে সুপ্রসিদ্ধ ছিল।

বাংলার ভৌগোলিক অবস্থান সম্পর্কে 'বাঙ্গালির ইতিহাস' (আদিপর্ব) গ্রন্থের রচয়িতা নীহাররঞ্জন রায় যথার্থই বলেছেন—"উত্তরে হিমালয় এবং হিমালয় হইতে নেপাল , সিকিম ও ভূটান রাজ্য ; উত্তর-পূর্বদিকে ব্রহ্মপুত্র নদ -উপত্যকা ; উত্তর পশ্চিম দিকে দ্বারবঙ্গ পর্যন্ত ভাগীরথীর উত্তর সমান্তরালবর্তী সমভূমি ; পূর্বদিকে গারো- খাসিয়া- জয়ন্তিয়া -ত্রিপুরা - চট্টগ্রাম শৈলশ্রেণ বাহিয়া দক্ষিণ সমুদ্র পর্যন্ত ; পশ্চিমে রাজমহল — সাঁওতাল পরগণা -ছোটনাগপুর- মানভূম - ধলভূম -কেওর ময়ূরভঞ্জের শৈলময় অরণ্যময় মালভূমি ; দক্ষিণে বঙ্গোপসাগর । এই প্রকৃতির সীমাবিধৃত ভূমিখণ্ডের মধ্যেই প্রাচীন বাঙলার গৌড় -পুণ্ড্র -বরেন্দ্রী -রাঢ় -সুহ্ম -তাম্রলিপ্ত - সমতটবঙ্গ- বঙ্গাল -হরিকেল প্রভৃতি জনপদ, ভাগীরথী-করতয়া -ব্রহ্মপুত্র -পদ্মা -মেঘনা এবং আরও অসংখ্য নদনদী বিধৌত বাঙলার গ্রাম, নগর, প্রান্তর, পাহাড়, কান্তার। এই ভূখণ্ডই ঐতিহাসিক কালের বাঙালির কর্ম প্রকৃতির উৎস এবং ধর্ম- কর্ম- নর্ম- ভূমি ।"



অগ্রগতি নির্ধারক প্রশ্ন

১. প্রাচীন বাংলার ভৌগোলিক অবস্থান বিষয়ে লিখুন। (১৫০ শব্দের মধ্যে)

২.৪ বাঙালি জাতির পরিচয়

বাঙালি জাতি একটি মিশ্র জাতি। কালস্রোতে যুগে যুগে বিভিন্ন জাতিসত্তার আগমন ও সংমিশ্রণের দ্বারাই বাঙালি জাতির উদ্ভব ঘটেছে। 'নিষাদ' বা অস্ট্রিক জাতি , দ্রাবিড় -জনগোষ্ঠী, 'কিরাত' জনগোষ্ঠী বা মঙ্গোলজাতীয় ভোটবর্মী গোষ্ঠী , আর্যভাষা গোষ্ঠী ও ভারতের পূর্বাঞ্চলীয় অধিবাসী। অসুর, ম্লেচ্ছ, প্রভৃতি জাতি ও জনজাতীয় গোষ্ঠীর সংমিশ্রণে বাঙালি জাতির উদ্ভব। বাঙালি জাতি প্রধানত আল্পীয় আর্যদের বংশধর , তবে তার মধ্যে কিছু পরিমাণ অন্য রক্তের মিশ্রণ থাকা স্বাভাবিক। আচার্য সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় বলেন— "আর্যভাষা প্রতিষ্ঠার পূর্বে এদেশে কোল অষ্ট্রিক ও দ্রাবিড় শ্রেণীর ভাষাই লোকে বলিত; এবং উত্তর ও পূর্ব বাঙ্গালায় নবাগত ভোট-চীন বা ভোট-ব্রহ্ম গোষ্ঠীর ভাষাও কতকটা নিজস্থান করিয়া লইয়াছিল। অস্ট্রিক, দ্রাবিড় ও ভোট-চীন, এই বিভিন্ন জাতির মানুষকে একই ভাষা সূত্রে এবং একই ধর্ম ও সংস্কৃতির সূত্রে বাঁধিয়া দিয়া বিহারের পথ ধরিয়া আগত উত্তর ভারতের আর্যভাষা।.... চীনা পরিব্রাজক ফা-হিয়েন খ্রীষ্ট্রীয় ৪০০- অব্দের দিকে ভারতে তীর্থ দর্শন উপলক্ষ্যে আসেন, তাহার ভ্রমণকথা হইতে বুঝা যায় যে ঐ সময়ের মধ্যে বাঙ্গালাদেশে সুপ্রতিষ্ঠিত হইয়া গিয়াছিল। খ্রীষ্ট্রীয় অষ্টম

শতকের দ্বিতীয়ার্ধে বাঙ্গালার সুবিখ্যাত পাল রাজবংশের অভ্যুদয় ঘটে , মনে হয়, সেই সময়ে অষ্ট্রিক, দ্রাবিড় ও ভোট-চীন জাতীয় লোকেরা উত্তর ভারতের ও বিহারের আর্যভাষী ঔপনিবেশিকদের সঙ্গে সমভাষী হইয়া যাইবার ফলে এক ভাষার সূত্রে গ্রথিত একটি বিশিষ্ট netion বা জনগণ — পরিণত হইয়াছিল।" —এই বিশিষ্ট 'জনগণ'-ই বাঙালি জাতি ।

বাঙালি জাতি প্রধানত কৃষিজীবী ছিল। নদী মাতৃক প্রাচীন বাংলায় কৃষিকর্মে সমৃদ্ধ হয়েছিল। গ্রামগুলি পত্তনও হয়েছিল নদী, নালা, খাল-বিলের তীরে তীরে। জনপথ সহজলভ্য থাকায় খুব দ্রুতগতিতে নগর গড়ে উঠেছিল। কৃষি, শিল্প ও বাণিজ্যকে কেন্দ্র করে নানা শ্রেণির জনপদ সৃষ্টি হয়েছিল ।

২.৪ উদ্ভব ও ক্রমবিকাশ

আমরা এর আগেই বলেছি , বাঙালি মিশ্র জাতি। কালস্রোতে নানান সময়ে নানান জাতিসত্তার আগমনে ও সংমিশ্রণের ফলস্বরূপই আজকের দিনের বাঙালি জাতি। তবে এই জাতি গঠন প্রক্রিয়া এক দিনে গড়ে উঠেনি। তিলে তিলে নানান ঘটনাপ্রবাহের মধ্য দিয়ে ব্যাপক সংঘর্ষের মধ্য দিয়ে এই বাঙালি জাতির বিকাশ হয়েছে। বর্তমান বাঙালি বলতে তাদেরই বুঝি যাদের মাতৃভাষা বাংলা এবং যারা বাংলা ভাষা সাহিত্য সংস্কৃতির বাহক।

বাঙালি জাতির উৎপত্তি সম্পর্কে আচার্য সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় যা বলেছেন তা সূত্রাকারে বলা যেতে পারে :

১. বিভিন্ন জাতির সমন্বয়ে বাঙালি জাতির উৎপত্তি ।
২. ভারতবর্ষে বা বঙ্গদেশে মানুষের উদ্ভব হয়নি, আগমন হয়েছিল।
৩. নিগ্রোবটু জাতীয় মানুষ প্রাগৈতিহাসিক যুগে সুদূর আফ্রিকা থেকে স্থল পথে ভারতে এসেছিল। আসামের নাগাদের মধ্যে এদের কিছু মিল আছে।
৪. নিগ্রোবটুদের পর আসে 'প্রোটো- অস্ট্রলয়েড' বা প্রাথমিক -অস্ত্রালাকারজাতি। এখানকার নিম্নশ্রেণির লোকদের সঙ্গে এরা মিশে গেছে ।
৫. প্রোটো-অস্ট্রলয়েডের পর আসে অস্ট্রিক জাতি। ভারতবর্ষের সাঁওতাল, মুণ্ডারী, হো, কুরকু, শবর, খাসিয়া জনগোষ্ঠীদের পূর্বপুরুষ ।
৬. অস্ট্রিকের পর আসে দ্রাবিড়রা, এরা যদিও দক্ষিণ ভারতে প্রভাবশালী। কিন্তু পূর্বভারতে নদীমাতৃক সমতলভূমিতে অস্ট্রিকদের সঙ্গে মিশে যায়। বঙ্গদেশে এদের যথেষ্ট প্রভাব আছে।
৭. দ্রাবিড়দের পর আর্যরা আসে পশ্চিম থেকে। আর্য ও অনার্যদের সংমিশ্রণের ফলে প্রাচীন হিন্দু সভ্যতা উৎপত্তি হয়েছিল।
৮. আন্তর্জাতিক সংঘাত ও সংমিশ্রণে বাঙালি জাতির উদ্ভব।
৯. মোঙ্গলীয়ান জাতি চীন থেকে তিব্বত হয়ে হিমালয় অতিক্রম করে অসম তথা

পূর্ব ভারতে বসতি স্থাপন করে এই অঞ্চলের স্থানীয় জাতির সংমিশ্রণে অংশ গ্রহণ করে ।

১০. নৃতাত্ত্বিক দিক দিয়ে বিচার করলে বাঙালি একটি মিশ্র জাতি। অস্ট্রিক, দ্রাবিড় ও ভোট চীনীয় গোষ্ঠীর সঙ্গে আর্যজাতির সংমিশ্রণে এই বাঙালি জাতির উদ্ভব। আর্য অধিকারের পর আর্য-অনার্য সংস্কৃতির এসিমিলেশন চলতে থাকে। ইতিহাসের এই বিবর্তনেই বাঙালি জাতির উদ্ভব ও ক্রমবিকাশ। সম্রাট শশাঙ্ক বাঙালি জাতির প্রথম ঐতিহাসিক ব্যক্তিত্ব। সন্ধিক্ষণ থেকে এ পর্যন্ত বাঙালি জাতি বিশ্বের বিভিন্ন ক্ষেত্রে উজ্জ্বল প্রতিভার স্বাক্ষর রেখেছেন যে , বাঙালি জাতি আমাদের গর্ব ও অহংকার ।



অগ্রগতি নির্ধারক প্রশ্ন

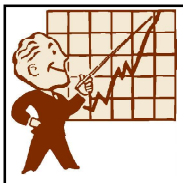
২. বাঙালি জাতির সংক্ষিপ্ত পরিচয় তুলে ধরুন (১৫০ শব্দের মধ্যে)

২.৫ বঙ্গের বাইরে বাঙালি জাতির পরিচয়

আমরা ইতিমধ্যে বাঙালি জাতির উদ্ভব ও ক্রমবিকাশ এবং তার ভৌগোলিক অবস্থান সম্পর্কে জ্ঞাত হয়েছি। বাঙালি একটি জাতি। এর গভীরতা ও ব্যাপকতা বহুদূর পর্যন্ত বিস্তৃত। ১৯৪৭ সালের দেশভাগের পর বাঙালিরা প্রাণের টানে ও বৌদ্ধিক বিকাশের প্রয়োজনে তার চিন্তা চেতনা পরিধি অনেকাংশে বৃদ্ধি করেছে। বাঙালি আজ বিশ্বময় ছড়িয়ে পড়েছে।

বাঙালিরা তথাকথিত বাংলাদেশ বা পশ্চিমবঙ্গে সীমাবদ্ধ হয়ে থাকেনি। ভারতবর্ষের নানান প্রান্তে ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে। বাংলাদেশ ও পশ্চিমবঙ্গের পর বাংলা ভাষা সাহিত্যচর্চা ও বাঙালি জাতির পীঠস্থান হয়েছে ত্রিপুরা। উত্তরপূর্ব ভারতের নানান রাজ্যে বাঙালিরা আজ সুপ্রতিষ্ঠিত। অসমের বরাক উপত্যকা বাঙালি অধ্যুষিতে অঞ্চল। একসময় শৈল শহর শিলং বাঙালিদের প্রাণ কেন্দ্র ছিল। মণিপুর, নাগাল্যান্ড, মেঘালয়, ঝাড়খণ্ড, বিহার, ছত্রিসগড়, কর্ণাটক ইত্যাদি। বহুরাজ্যে বাংলা ভাষা সাহিত্যচর্চা হয় সুদীর্ঘকাল থেকে। বাংলা সাহিত্যের বহু প্রতিষ্ঠিত সাহিত্যিক আছেন যাঁরা বাংলা মূল ভূ-খণ্ডের বাইরে তাদের জন্ম ও কর্ম।

ভারতবর্ষ ও বাংলাদেশের বাইরেও অনেক দেশে বাঙালি জাতির পরিচয় পাওয়া যায়, আমেরিকা, ইংল্যান্ড, ফ্রান্স, জার্মান, চেকোস্লাভিয়া, অস্ট্রেলিয়া, আফ্রিকার সিয়েরা লিওন দেশে বাংলা ভাষাকে 'সম্মানিত সরকারি ভাষা' হিসেবে স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছে। এমনকি ইংল্যান্ডের দ্বিতীয় ভাষা হিসেবে বাংলা ভাষা প্রচলিত।



অগ্রগতি নির্ধারক প্রশ্ন

৩. বঙ্গের বাইরে বাঙালি জাতির পরিচয় তুলে ধরুন (১০০ শব্দের মধ্যে)

২.৬ শব্দার্থ ও টীকা

ঋক্‌বেদ — পৃথিবীর প্রাচীনতম গ্রন্থ। হিন্দুদের পবিত্র গ্রন্থ হিন্দু সামাজিক অনুষ্ঠানের-কতগুলো ঋক বা সূক্ত নির্দেশ আছে। জাগতিক সৃষ্টি রহস্যের মূল কথা এখানে ব্যক্ত করা আছে।

ঐতরেয় আরণ্যক - ঋক্‌বেদের একটি অংশ। বৈদিক ধর্মাচরণের অর্থ এবং মহাব্রতের আচার অনুষ্ঠানের কথা আছে। মহর্ষি ঐতরেয় নাম অনুসারে এই আরণ্যকের নামকরণ হয়েছে।

কালিদাস — ভারতবর্ষের একজন শ্রেষ্ঠ কবি। রঘু বংশ কাব্যের রচয়িতা। যে কাব্যে প্রাচীন বাঙালির অস্তিত্ব পাওয়া যায়।

গুপ্তযুগ — প্রাচীন ভারতবর্ষের সর্বশ্রেষ্ঠ সাম্রাজ্য ছিল গুপ্ত সাম্রাজ্য। ৩২০-৫৫০ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত তাদের আধিপত্য ছিল। এই সময়কে বলা হয় ভারতবর্ষের স্বর্ণযুগ সেজন্য এই সময়কালকে গুপ্তযুগ বলা হয়।

নীহাররঞ্জন রায় — নীহাররঞ্জন রায় (১৯০৩-১৯৮১) আন্তর্জাতিক খ্যাতি সম্পন্ন বাঙালি ইতিহাসবিদ, সাহিত্য সমালোচক ও শিল্পকলা গবেষক পণ্ডিত।

সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় — সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় (১৮৯০- ১৯৭৭) ছিলেন একজন বাঙালি ভাষাতাত্ত্বিক পণ্ডিত, সাহিত্যিক ও শিক্ষাবিদ। তার জগৎ বিখ্যাত গ্রন্থ 'The Origine and Development of Bengali Language'।

শশাঙ্ক — প্রাচীন বাংলার গৌড় সাম্রাজ্যের প্রথম স্বাধীন ও সার্বভৌম রাজা। 'কর্ণসুবর্ণ' ছিল তার রাজধানী। ৫৯০-৬২৫ খিস্টাব্দ পর্যন্ত তিনি রাজত্ব করেন। বাঙালি জাতির ইতিহাসে তার নাম স্বর্ণাক্ষরে লেখা থাকবে।

কৌটিল্য — কৌটিল্য বা চাণক্য প্রাচীন ভারতবর্ষের একজন বিখ্যাত অর্থনীতিবিদ, দার্শনিক ও চন্দ্রগুপ্ত মৌর্যের শিক্ষাগুরু। 'অর্থশাস্ত্র' নামে রাষ্ট্রবিজ্ঞানের একটি বিখ্যাত গ্রন্থের রচয়িতা। কৌটিল্যের 'অর্থশাস্ত্র' গ্রন্থে প্রাচীন বাঙালি জাতির পরিচয় পাওয়া যায়।



২.৭ অধ্যায়টি পাঠ করে আমরা কী শিখলাম

- প্রাচীন বাংলা ভৌগোলিক পরিসীমা সম্পর্কে অবগত হলেন, বাঙালি জাতির পরিচয় জানতে পারলাম।

- ভারতবর্ষে বাঙালি জাতি কত পুরোনো সে সম্পর্কে জানতে পারবেন। তার উদ্ভব ও ক্রমবিকাশ সম্বন্ধে সাধারণ জ্ঞান অর্জন করতে পারলাম।
- প্রাচীন বাঙালির সাংস্কৃতিক ইতিহাস ও বঙ্গের বাইরে বাঙালির পরিচয় জানতে পারলাম।
- বাঙালির সমাজ বিন্যাস অর্থাৎ বাঙালির সামাজিক ইতিহাস ও ঐতিহ্য সম্পর্কে নির্বাচিত অনেক প্রশ্নের উত্তর লিখতে পারলাম।



২.৮ অগ্রগতি নির্ধারক উত্তর-সংকেত

১. নং প্রশ্নের উত্তর: নদীকে কেন্দ্র করেই প্রাচীন বাংলার ভৌগোলিক সীমা তৈরি হয়েছিল... শশাঙ্কের আমলে পুণ্ড্রবর্ধন থেকে ওড়িশার উপকূল পর্যন্ত গৌড়ে সীমানা ছিল ।... উপকূল অঞ্চল প্রাচীন বাংলায় হরিকেল নামে সুপ্রসিদ্ধ ছিল।-এভাবে সাজিয়ে লিখুন। (দ্রষ্টব্য ২.৩ অংশ)

২. নং প্রশ্নের উত্তর: বাঙালি জাতি একটি মিশ্র জাতি ... তবে তার মধ্যে কিছু পরিমাণ রক্তের মিশ্রণ থাকা স্বাভাবিক। -এভাবে সাজিয়ে লিখুন। (দ্রষ্টব্য ২.৪ অংশ)

৩. নং প্রশ্নের উত্তর: বাঙালিরা তথাকথিত বাংলাদেশ বা পশ্চিমবঙ্গে সীমাবদ্ধ হয়ে থাকেনি।... এমনকি ইংল্যান্ডের দ্বিতীয় ভাষা হিসেবে বাংলা ভাষা প্রচলিত।-এভাবে সাজিয়ে লিখুন। (দ্রষ্টব্য ২.৫ অংশ)



২.৯ অতিরিক্ত পঠন

আচার্য্য, ড. দেবেশ কুমার (২০১৮); বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস, কলকাতা : ইউনাইটেড বুক এজেন্সি

চট্টোপাধ্যায়, কুন্তল (১৪১৮ বঙ্গাব্দ); সাহিত্যের রূপ-রীতি ও অন্যান্যপ্রসঙ্গ; কলকাতা : রত্নাবলী

চট্টোপাধ্যায়, তপনকুমার (আগস্ট, ২০১৭); কলকাতা : প্রজ্ঞাবিকাশ

চট্টোপাধ্যায়, পার্থ (২০০৮); বাংলা সাহিত্য পরিচয় ও সাহিত্য টীকা, কলকাতা : তুলসীপ্রকাশন

বন্দ্রোপাধ্যায়, অসিতকুমার (২০১৬-২০১৭); বাংলা সাহিত্যের সম্পূর্ণ ইতিবৃত্ত; কলকাতা : মডার্ণবুক এজেন্সী প্রাইভেট লিমিটেড

রায়, নীহাররঞ্জন (১৩৫৯ বঙ্গাব্দ); বাঙালির ইতিহাস: আদিপর্ব; কলকাতা : লেখক-সমবায়-সমিতি

সুর, ড. অতুল (২০১৭); বাংলা ও বাঙালির বিবর্তন; কলকাতা: সাহিত্যলোক



২.১০ আদর্শ প্রশ্নাবলি

২. বাঙালি জাতির পরিচয় বিষয়ে একটি প্রতিবেদন লিখুন।

৩. বাঙালি জাতির উদ্ভব ও ক্রমবিকাশ সম্পর্কে যা জানেন তা সংক্ষেপে আলোচনা করুন।

৫. বাঙালি জাতির সংস্কৃতির ইতিহাস সম্পর্কে যা জানেন তা অতি সংক্ষেপে আলোচনা করুন।

অধ্যায় ৩ : প্রাচীন বাংলার সাংস্কৃতিক ও সামাজিক পরিচয়

বিন্যাস-ক্রম

৩.১ জ্ঞাতব্য বিষয়
৩.২ পরিচয়
৩.৩ দৈনন্দিন জীবনে প্রতিফলিত জীবনচিত্র
৩.৪ নগর ও পল্লীর জীবনাদর্শ
৩.৫ অন্ত্যজ বর্ণের জীবন ও যাপন চিত্র
৩.৬ অধ্যায় সংক্ষেপ
৩.৭ অধ্যায়টি পাঠ করে আমরা কী শিখলাম
৩.৮ অতিরিক্ত পঠন
৩.৯ অগ্রগতি নির্ধারক উত্তর-সংকেত
৩.১০ আদর্শ প্রশ্নাবলি

৩.১ জ্ঞাতব্য বিষয়

এই অধ্যায়টি পাঠ করে আপনি —

- প্রাচীন বাংলার সাংস্কৃতিক ও সামাজিক পরিচয় সম্পর্কে জানবেন।
- প্রাচীন বাংলার জীবনচিত্র ও দৈনন্দিন জীবন সম্পর্কে ধারণা পাবেন।
- প্রাচীন বাংলার নগর ও পল্লী জীবনাদর্শ প্রসঙ্গে অবগত হবেন।
- প্রাচীন বাংলার অন্ত্যজ বর্ণের জীবন ও যাপন চিত্রের পরিচয় পাবেন।

৩.২ পরিচয়

মানুষ সামাজিক জীব বলে সমাজবদ্ধ হয়ে বসবাস করায় প্রতিনিয়তই একে অন্যের সঙ্গে সহযোগিতার দরকার হয়। ফলে মানুষের প্রয়োজন হয় বিভিন্ন সামাজিক অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিকসহ অন্যান্য প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলা। আমরা জানি, জীবন বাঁচাতে হলে প্রধান তিনটি জিনিসের প্রাথমিক প্রয়োজন হয়— খাদ্য, বস্ত্র এবং বাসস্থান। এরপর মানুষ জীবনকে আরও সুন্দরভাবে এগিয়ে নিয়ে যেতে মনোযোগ দেয় শিক্ষা, বিজ্ঞান, শিল্পকলা, আইন প্রভৃতির উন্নয়নের দিকে। সমাজ এবং জীবন বিকাশে মানুষের এই সমস্ত কাজকর্মের একত্রিত রূপই হচ্ছে তার সংস্কৃতি। আর্যদের আগমনের পূর্বে বাংলার প্রাচীন মানুষেরা একটি সামাজিক ও সাংস্কৃতিক জীবন গড়ে তুলেছিল, যা ছিল বাংলার সমাজ-সংস্কৃতির সবচেয়ে প্রাচীন রূপ।

বিভিন্ন পণ্ডিতের মতে, এদের ভাষার নাম ছিল 'অস্ট্রিক'। জাতি হিসেবে এদের 'নিষাদ' বলা হত। পরবর্তীতে বাংলার ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর সঙ্গে মিশে যায় 'আলপাইন' নামে অন্য এক

জাতি। আর্যরা এদেশে আসার পূর্বে বাংলার এক সংস্কৃতি গড়ে ওঠে। বাঙালির জনপ্রকৃতিতে একে একে বিভিন্ন মানবগোষ্ঠীর ধারা এসে মিলিত হতেও দেখা যায়। যা তাঁদের 'সংকর-জন' হিসেবে পরিচিত করে। বহু বছর ধরে এই বিচিত্র আদান-প্রদান ও সংমিশ্রণের ফলে বাঙালির একটি নিজস্ব দৈহিক বৈশিষ্ট্য তৈরি হয়। যা থেকে প্রাচীন বাংলার আর্থ-সামাজিক অবস্থা; শিল্পকলা, স্থাপত্য, ভাস্কর্য ও চিত্রকলার বর্ণনা; ভাষা ও সাহিত্যের উদ্ভব ও বিকাশ; ধর্ম, আচার-অনুষ্ঠান, উৎসব ও রীতি-নীতিতে জনগণের মূল্যবোধ ও বিশ্বাসের চিত্র এবং আর্থ-সামাজিক ও সাংস্কৃতিক চর্চায় তৎকালীন জীবনের উদ্ভব ও বিকাশ সম্পর্কে জানা যায়।

৩.৩ দৈনন্দিন জীবনে প্রতিফলিত জীবনচিত্র

প্রাচীন বাংলার সামাজিক জীবনের চিত্র লক্ষ করলে দেখা যায়, মৌর্য শাসনের পূর্বে বাংলায় অধিবাসীদের মধ্যে তেমন কোনো রাজনৈতিক পরিচয় ছিল না। সেই সময়ে সমাজ বিভিন্ন গোত্রে বিভক্ত ছিল, যাকে বলা হত কৌম সমাজ। আর্যপূর্ব কিছু কিছু ধর্মচিন্তা এবং দর্শন পরবর্তী সময়ে এদেশের হিন্দু ধর্মে ক্রমশ ছড়িয়ে পড়তে দেখা যায়। যার মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিল— 'কর্মফল', 'জন্মান্তরবাদ', 'যোগ সাধনা' ইত্যাদি। এছাড়া সেই যুগের অনেক সামাজিক-প্রথা ও আচার-আচরণের প্রভাব পরবর্তীতে হিন্দু সমাজে লক্ষ করা যায়— 'অতিথিদের পান-সুপারি খেতে দেওয়া', 'শিবের গীত গাওয়া', 'বিয়েতে গায়ে হলুদ দেওয়া', 'ধুতি-শাড়ি পরা' এবং 'মেয়েদের কপালে সিঁদুর দেওয়া' ইত্যাদি ।

আর্য সমাজে জাতিভেদ প্রথা ব্যাপক ছিল বলেই তারা দীর্ঘদিন এদেশে বসবাস করার ফলে বাংলায়ও এই ব্যবস্থা চালু হয়ে যায়। সেসময় হিন্দুদের মধ্যে 'ব্রাহ্মণ', 'ক্ষত্রিয়', 'বৈশ্য' ও 'শূদ্র' এই চারটি বর্ণের ভাগ ছিল। সমাজে প্রত্যেক জাতিরই নির্দিষ্ট পেশা লক্ষ করা যায়—

- 'অধ্যয়ন', 'অধ্যাপনা' ও 'পূজা-পার্বণ' করা ছিল ব্রাহ্মণদের নির্দিষ্ট কর্ম । তাঁরা সমাজে সর্বশ্রেষ্ঠ মর্যাদা লাভ করতেন।
- ক্ষত্রিয়দের পেশা ছিল মূলত যুদ্ধ করা। যুদ্ধ করেই তাঁরা জীবন নির্বাহ করতেন।
- ব্যবসা-বাণিজ্য করাই ছিল বৈশ্যদের কাজ।
- সবচেয়ে নীচু শ্রেণির শূদ্ররা সাধারণত কৃষিকাজ, মাছ শিকার ও অন্যান্য বিভিন্ন ছোটখাটো কাজ করতেন।

ব্রাহ্মণ ছাড়া বাকি অন্যান্য বর্ণের মানুষ একে অন্যের সঙ্গে মেলামেশা করতেন। সাধারণত এক জাতির মধ্যেই বিবাহ হত, তবে কিছু কিছু ক্ষেত্রে উচ্চ শ্রেণির বর ও নিম্ন শ্রেণির কনের মধ্যে বিবাহের নিয়ম চালু ছিল। কিন্তু পরবর্তী সময়ে এসব ব্যাপারে কঠোর নিয়ম চালু হতে দেখা যায়।

সেই সময় বাঙালি মেয়েদের গুণাবলির সুখ্যাতি উচ্চপর্যায়ে ছিল—

- মেয়েরা লেখাপড়া শিখত এবং সে যুগে অবরোধ বা পর্দাপ্রথা ছিল না।

• বিবাহ ছিল সমাজের নিয়ম। একটি বিয়ে হলেও সেই যুগে পুরুষেরা বহু স্ত্রী রাখতে পারত।

• বিধবাকে নিরামিষ আহার করে সব ধরনের বিলাসিতা ত্যাগ করার নিয়ম ছিল।

• সেই সময় স্বামীর মৃত্যু হলে স্ত্রীকেও মৃত স্বামীর সঙ্গে চিতায় সহমরণে যেতে হত। যাকে বলা হত 'সতীদাহ প্রথা'।

• ধন-সম্পত্তিতে নারীদের কোন আইনগত অধিকার ছিল না।

একদিকে বাংলার প্রাচীন ধর্মশাস্ত্রে বাঙালির উন্নত চরিত্রের কথা জানা যায়। কিন্তু অন্যদিকে বাঙালির সামাজিক জীবনে কোনোরূপ দুর্নীতি ও অশ্লীলতা ছিল না, এমন কথাও ঠিক বলা যায় না।

সেই যুগের খাদ্যাভাসে দৃষ্টিপাত করলে দেখা যায়—

• তখনও বাঙালির প্রধান খাদ্য ছিল ভাত, মাছ, মাংস, শাক-সবজি, দুধ, দধি, ঘৃত, ক্ষীর ইত্যাদি।

• চাল থেকে প্রস্তুত নানা প্রকার পিঠা ছিল জনপ্রিয় মুখরোচক খাবার।

• তখন বাঙালি ব্রাহ্মণের আমিষ খাওয়ার চিত্র পাওয়া যায়।

• সেই সময় সকল প্রকার মাছ পাওয়ার কথা পাওয়া যায়। পূর্ববঙ্গে ইলিশ ও শুঁটকি মাছ খুব জনপ্রিয় খাবার ছিল।

• বিভিন্ন ধরনের তরকারি যেমন— বেগুন, লাউ, কুমড়া, ঝিঙ্গা, কাঁকরোল, কচু ইত্যাদি উৎপন্ন হত।

• ফলের মধ্যে আম, কাঁঠাল, কলা, তাল, পেঁপে, নারকেল, ইক্ষু ইত্যাদি পাওয়া যেত।

• তবে উল্লেখযোগ্য কোথাও ডালের কথা বলা নেই।

• দুধ, নারকেলের পানি, ইক্ষুরস, তালের রস ছাড়া নানা প্রকার পানীয় খাবার প্রচলিত ছিল। এমনকি খাওয়া-দাওয়া শেষে মসলাযুক্ত পান খাওয়ার রীতিও প্রচলন ছিল।

পোশাক-পরিচ্ছদের ব্যাপারে রাজা-মহারাজা ও ধনীদের কথা বাদ দিলে সেইসময় বিশেষ কোনো আড়ম্বর লক্ষ করা যায় না।

• বাংলার বিভিন্ন নর-নারীরা ধুতি ও শাড়ি পরিধান করতেন। পুরুষেরা গায়ে চাদর আর মেয়েরা ওড়না পরিধান করতেন। তবে উৎসব-অনুষ্ঠান বিশেষে পোশাকের ভিন্ন ধরণের ব্যবস্থা ছিল।

• পুরুষ-নারী উভয়ের মধ্যেই অলঙ্কার ব্যবহারের রীতিও প্রচলিত ছিল। মেয়েরা কানে কুণ্ডল, গলায় হার, আঙ্গুলে আংটি, হাতে বালা এবং পায়ে মল পরিধান করত। মেয়েরাই কেবল হাতে শঙ্খের বালা পরত এবং অনেকে চুড়ি পরতে ভালোবাসত।

• মণি-মুক্তা ও দামি সোনা-রুপার অলঙ্কারের ব্যবহার ছিল ধনীদের ঘরে।

• মেয়েরা নানাপ্রকার খোঁপা বাঁধত এবং পুরুষদের বাবরি চুল কাঁধের ওপর ঝুলে থাকত।

• প্রসাধনসামগ্রীর মধ্যে কূর্পর, চন্দন প্রভৃতি ছাড়াও বিভিন্ন ধরনের সুগন্ধি ব্যবহারের প্রচলন ছিল।

- মেয়েদের সাজসজ্জায় আলতা, সিঁদুর ও কুমকুমের ব্যবহার প্রচলিত ছিল।
- পুরুষেরা কাঠের খড়ম বা চামড়ার চটিজুতা ব্যবহার করত।
- সেই সময় ছাতার প্রচলনও লক্ষ করা যায়।

এছাড়া তখনকার দিনে নানা রকম খেলাধুলা ও আমোদ-প্রমোদের ব্যবস্থা ছিল। খেলার মধ্যে পাশা ও দাবা খেলার প্রচলন ছিল অন্যতম। তবে পাশাপাশি নাচ-গান এবং অভিনয়ের প্রচলনও ছিল খুব বেশি। বীণা, বাঁশি, মৃদঙ্গ, ঢাক, ঢোল, খোল, করতাল ইত্যাদি তো ছিলই, এমনকি বিভিন্ন মাটির পাত্রকেও বাদ্যযন্ত্ররূপে ব্যবহার করা হত। কুস্তি, শিকার, ব্যায়াম, নৌকাবাইচ ও বাজিকরের খেলা পুরুষদের পছন্দের মধ্যে অন্যতম ছিল। এছাড়া নারীদের মধ্যে উদ্যান রচনা, জলক্রীড়া ইত্যাদি আমোদ-প্রমোদেরও প্রচলন ছিল।

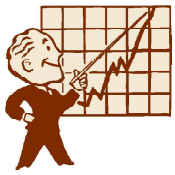
সামাজিক আচার-আচরণ অনুষ্ঠানের মধ্যে অন্নপ্রাশন, বিয়ে, শ্রাদ্ধ ইত্যাদি সে যুগেও প্রচলিত ছিল—

- বারো মাসে তেরো পার্বণ অনুষ্ঠিত হত। প্রাচীনকালে বাংলায় ভ্রাতৃদ্বিতীয়া (ভাইফোঁটা), নবান্ন, রথযাত্রা, অষ্টমী স্নান, হোলি, জন্মাষ্টমী, দশহরা, অক্ষয় তৃতীয়া, গঙ্গাস্নান প্রভৃতি অনুষ্ঠান প্রচলিত ছিল।
- আমোদ-উৎসব ছাড়া তখন হিন্দুধর্মে বিভিন্ন লৌকিক অনুষ্ঠানের চিত্র লক্ষ করা যায়। শিশুর জন্মের পূর্বে মঙ্গলের জন্য গর্ভাধান, সীমন্তোন্নয়ন ইত্যাদি অনুষ্ঠিত হত; জন্মের পর নামকরণ, অন্নপ্রাশন ইত্যাদি উপচার পালন করা হত।
- প্রাচীনকালে বাংলার মানুষের দৈনন্দিন জীবনে ধর্মশাস্ত্রেরও প্রবল প্রভাব ছিল। কোন তিথিতে কী খাদ্য নিষিদ্ধ, কোন তিথিতে উপবাস করতে হবে এবং বিবাহ, শিশু বয়সে পড়াশুনা শুরু করা, বিদেশ যাত্রা, তীর্থযাত্রা প্রভৃতির জন্য কোন কোন সময় শুভ বা অশুভ ইত্যাদি বিষয়ে নিয়ম কঠোরভাবে পালন করা হত।

প্রাচীন বাংলার মানুষের যাতায়াতের প্রধান বাহনের অন্যতম ছিল গরুর গাড়ি ও নৌকা। এছাড়া খাল-বিলে চলাফেরা করার জন্য ভেলা ও ডোঙ্গা ব্যবহার করা হত। মানুষ ছোট ছোট খাল পার হত সাঁকো দিয়ে। ধনী লোকের মধ্যে হাতি, ঘোড়া, ঘোড়ার গাড়ি প্রভৃতি যানবাহনের ব্যবহার প্রচলন ছিল। তাদের স্ত্রী-পরিজনেরা নৌকা ও পালকিতে এক স্থান থেকে অন্য স্থানে আসা-যাওয়া করত। বিয়ের পর নববধূকে গরুর গাড়ি বা পালকিতে করে শ্বশুরবাড়ি আনা হত।

কৃষিপ্রধান দেশ হওয়ায় বাংলার অধিকাংশ মানুষ গ্রামে বাস করত। মানুষের জীবন মোটামুটি সুখের থাকলেও সেই সময়ের প্রাচীন বাংলার গরিব-দুঃখী মানুষের কথাও জানা যায়। সমাজের উঁচু শ্রেণি ব্রাহ্মণের হাতে ছিল মূল ক্ষমতা। সেই সময় শুধু ব্রাহ্মণেরাই শাস্ত্রজ্ঞান চর্চা করতে পারত। ব্রাহ্মণদের প্রবল অত্যাচার সাধারণ মানুষের জীবনকে অতিষ্ঠ করে তুলেছিল; বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বীদের প্রতি এ উৎপাত অধিক পরিমাণে হত। শেষ দিকে সেন রাজাদের অত্যাচারে সাধারণ মানুষ অত্যন্ত অসন্তুষ্ট হয়ে ওঠে। ফলে সেন বংশের শাসনাকালেই বৌদ্ধ সমাজ ও

সংস্কৃতিতে নেমে আসে দুর্দশা। ব্রাহ্মণদের প্রভাবে সেনদের সময়ে সাধারণ হিন্দু সমাজ দুর্বল হয়ে পড়ে। অন্যদিকে প্রাচীন বাংলার শেষ পর্যায়ে বিশৃঙ্খল অবস্থায় মুসলমান সমাজের ভিত গড়ে ওঠার প্রক্রিয়া শুরু হয়। আর মুসলমান সমাজ প্রতিষ্ঠার মধ্য দিয়ে বাংলায় মধ্যযুগের সূচনা হয় এবং বাংলার সমাজ-সংস্কৃতির রূপও পাল্টে যায়।



অগ্রগতি নির্ধারক প্রশ্ন

১. প্রাচীন বাংলার সমাজ ব্যবস্থায় চর্তুবর্ণের নির্দিষ্ট কর্মের উপর আলোকপাত করুন (১৫০ শব্দের মধ্যে)

২. প্রাচীন বাংলার নারী জীবনের উপর সংক্ষিপ্ত আলোচনা করুন। (১৫০ শব্দর মধ্যে)

৩.৪ নগর ও পল্লীর জীবনাদর্শ

আয়তনে বা আকৃতি-প্রকৃতিতে এক গ্রামের সঙ্গে আর এক গ্রামের যত পার্থক্যই থাকুক না কেন, ঐতিহাসিক কালে অর্থাৎ চতুর্থ-পঞ্চম শতক থেকে একেবারে আদি-পর্বের শেষ পর্যন্ত সমগ্রভাবে বাংলার গ্রামের চেহারা ও প্রকৃতি একইরকম ছিল। মোটামুটিভাবে অষ্টাদশ শতকের শেষ পর্যন্ত সে-চেহারা ও প্রকৃতির বিশেষ কোনও পরিবর্তন লক্ষ করা যায় না, যার একাধিক কারণ বর্তমান—

- এই সুদীর্ঘ শতাব্দী পর শতাব্দীর মধ্যে গ্রাম্য উৎপাদন-ব্যবস্থার, অর্থাৎ কৃষি ও ক্ষুদ্রশিল্পের উৎপাদনোপায়ের কোনও পরিবর্তন হয়নি। একদিকে গরু ও লাঙ্গল, আখামাড়াই যন্ত্র, অন্যদিকে তকালী ও তোতই প্রধান উৎপাদন-যন্ত্র যার উদাহরণ।
- এই সুদীর্ঘ কালের মধ্যে ভূমি-ব্যবস্থারও কোন মূলগত পরিবর্তন হয়নি এবং ভূমি-নির্ভর কৃষক-সমাজের মধ্যে যে শ্রেণিবিভাগ তাও মোটামুটি একইরকম ছিল।
- কোনও গ্রাম ব্যাবসা-বাণিজ্যের কেন্দ্র হওয়ার ফলে বা শাসনকার্যের অধিষ্ঠান নির্বাচিত হওয়ার ফলে পৃথক একটা গুরুত্ব ও মর্যাদা লাভ করে।
- গ্রাম্য সমাজের আকৃতি-প্রকৃতিতে স্থানীয় পরিবর্তনও লক্ষ করা যায়। কোনও কোনও গ্রাম আবার স্ফীত ও সমৃদ্ধ হয়ে নগর মর্যাদায় উন্নীতও হয়েছে।
- ছোট ছোট গ্রামগুলি একাই একক; আবার বড় গ্রামগুলিকে দেখা যায় বিভিন্ন পাড়ায় বিভক্ত।
- আয়তন অনুযায়ী প্রত্যেক গ্রামে মহত্তর, কুটম্ব, গৃহস্থ, ভূমিবান ও ভূমিহীন কৃষক, কয়েকঘর শিল্পী, সমাজ-সেবক রাজক, নাপিত ইত্যাদি এবং সমাজ-শ্রমিক চণ্ডাল, হাড়ি, ডোম ইত্যাদির বিভিন্ন আয়তন ও মর্যাদার বাস্তুগৃহাদি। এইসব বাস্তু পরস্পর দূরবিচ্ছিন্ন নয়; তবে চণ্ডাল প্রভৃতি অন্ত্যজ বর্ণের লোকেরা যে-অংশে বাস করে তা প্রধান গ্রাম থেকে একটু বিচ্ছিন্ন।
- ঘর থেকে অদূরেই গ্রামের কৃষিক্ষেত্র থাকে। সেই সুবিস্তৃত কৃষিক্ষেত্রে প্রত্যেকের

ক্ষেত্রভূমিসীমা আলি দ্বারা সুনির্দিষ্ট; গ্রামে সমগ্র কৃষিভূমি সেই জন্য ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র খণ্ডে বিভক্ত থাকে। ভূমির পাশ দিয়ে মাঝে মাঝে বৃহৎ খাল নালা দেখা যায়, যা শুধুমাত্র চাষের জল সরবরাহ করে না, বরং পয়ঃপ্রণালীর কাজও করে থাকে। ক্ষেত্রভূমির মধ্যে অথবা শেষ সীমায় থাকে গোবাট ও তৃণাচ্ছাদিত গোচরীভূমি।

- গ্রামের পাশ দিয়ে নদী, খাল বা অন্য কোনও জলপ্রবাহ থাকে এবং গ্রাম্য লোকজন চলাচলের পথও থাকে।

- কোনও কোনও গ্রামের বাইরে গ্রাম্য হাট, হট্টিয়গুহ ইত্যাদি দেখা যায়। যে-সব গ্রাম সমুদ্র বা সমুদ্র জোয়ারবাহী নদীর তীরে অবস্থিত, সেখানে প্রায় সব গ্রাম বর্ষায় জল-প্লাবিত হয় অথবা নদী ও সমুদ্রের জলোচ্ছ্বাসদ্বারা আক্রান্ত হয়। নদী বা বৃহৎ খাল পারাপারের জন্য গ্রামে খেয়াঘাট রয়েছে।

- প্রত্যেক গ্রামেই ছোট বড় দু-একটি মন্দির দেখা যায়। আবার কোন কোন গ্রামে ছোট বড় বৌদ্ধবিহার দেখা যায়।

- যে-সব গ্রাম ব্যাবসা-বাণিজ্যের যাতায়াত পথের কেন্দ্র বা সীমায় অবস্থিত, সেখানে গড়, বৃহৎ হাট হয়ে থাকে। এছাড়া জলবাণিজ্যের কেন্দ্র হলে নদীর ঘাট বা সমুদ্রের খাড়ীতে অসংখ্য নৌকার সমাবেশ লক্ষ করা যায়। সেই সব গ্রাম অপেক্ষাকৃত সমৃদ্ধ, তাতে কোন সন্দেহ থাকে না।

মোটামুটি বাংলার গ্রামের এই চিত্রই সমসাময়িক বাংলার লিপিগুলিতে ধরা পড়ে। মোটামুটি এই চিত্র অষ্টাদশ শতকের শেষ, এমনকি ঊনবিংশ শতকের মাঝামাঝি পর্যন্ত বাংলার গ্রামগুলিতে দেখা গিয়েছে। সমসাময়িক সাহিত্যে, যেমন 'রামচরিত' এবং 'সদুক্তিকর্ণামৃত'-র দু-একটি বিচ্ছিন্ন শ্লোকে প্রাচীন বাংলার গ্রামগুলির মনোরম কাব্যময় ছবি আঁকা রয়েছে। 'রামচরিত' -এ বরেন্দ্রীর গ্রামের বর্ণনা প্রসঙ্গে বলা হয়েছে—

'বরেন্দ্রীতে জগদ্দল মহাবিহার, এই দেশেই বোধিসত্ত্ব লোকেশ ও তারার মন্দির। ইহার স্কন্দনগর এবং বহুমন্দির শোভিত শোণিতপুর নগরে অসংখ্য ব্রাহ্মণের বাস। এই ভূমির দুই প্রান্তে গঙ্গা ও করতয়া, আর পুনর্ভবার তীরে প্রসিদ্ধ তীর্থঘাট। বরেন্দ্রীতে প্রচুর বৃহৎ বৃহৎ জলাশয় (বিল?); সেই জলাশয় হইতে বলভী ও ক্ষীণতোয়া কালিনদীর উদ্ভব। স্থানে স্থানে কোকিল কূজিত, কন্দ-লকুচ-শ্রীফল-লবলী-করুণা-প্রিয়ালা শোভিত উদ্যান; মাঠে মাঠে নানা প্রকারের ধানের ক্ষেত, এলার ক্ষেত, প্রিয়ঙ্গুলতা এবং ইক্ষু ও বাঁশের ঝাড়, অগণিত মহুয়া, সুপারী ও নারিকেল গাছ। জলাশয়ে জলাশয়ে নীল ও লাল পদ্ম, গৃহপ্রাঙ্গণে কনক ও কেতক ফুলের গাছ; আকাশে বিস্তৃত ও দ্রুতসঞ্চারমান প্রচুর বারিবর্ষ মেঘ।'

লক্ষ্মণ সেনের 'আনুলিয়া-লিপিতে' শালি ধান, শস্যক্ষেত্র এবং রমণীয় উদ্যানের উল্লেখ আছে। অন্যান্য দু-একটি লিপিতেও শস্যসমৃদ্ধ গ্রাম্য শোভার ইঙ্গিত রয়েছে। দুই একটি গ্রামে হরম্যাবলীর কথাও শোনা যায়। বর্ষায় ও হেমন্তে বাংলার গ্রাম-বর্ণনা, গ্রাম্য কৃষকের চিত্র প্রভৃতি 'সদুক্তিকর্ণামৃত'-গ্রন্থে বর্ণিত হয়েছে।

গ্রামগুলি মোটামুটি অপরিবর্তিত থাকলেও প্রাচীন বাংলার নগরগুলি সম্বন্ধে তা বলা চলে না। খ্রিস্টপূর্ব শতক থেকে আরম্ভ করে ষষ্ঠ-সপ্তম শতক পর্যন্ত যতগুলি নগরের খবর পাওয়া গেছে, তার অধিকাংশই প্রধানত ব্যাবসা-বাণিজ্য নির্ভর। তাম্রলিপিতে তো বটেই, এমন কি পুণ্ড্রনগর, বর্ধমান, গঙ্গাবিন্দর-নগর, নব্যাবকাশিকা-নগর, বারকমণ্ডল-বিষয়ের-নগর প্রভৃতি সমস্ত নগরেই সুপ্রশস্ত ব্যাবসা-বাণিজ্যের উল্লেখ রয়েছে। তাম্রলিপ্ত, গঙ্গাবিন্দর ও পুণ্ড্রনগর সম্বন্ধে যে-সমস্ত বিবরণ প্রাচীন সাহিত্যগ্রন্থ, চীন পরিব্রাজকদের বিবরণ, পাশ্চাত্য বণিক ও ভৌগোলিকদের বিবরণ ইত্যাদির মধ্যে রয়েছে, তাতে এ বিষয়ে কোন সংশয় থাকে না।

নব্যাবকাশিকা-বারকমণ্ডল-পুণ্ড্রভুনগর-বর্ধমানের গুরুত্ব ও মর্যাদা বাণিজ্য-সমৃদ্ধির উপর নির্ভর করত। পুণ্ড্রনগরের ক্ষেত্রে তীর্থমহিমা অবশ্যই কার্যকরী ছিল। এই উভয় কারণের জন্যই হয়তো মৌর্য ও গুপ্তরাজারা এইখানে শাসনকেন্দ্র প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। গঙ্গা-বন্দর ও তাম্রলিপ্তির গুরুত্বও ছিল নিরঙ্কুশ ব্যাবসা-বাণিজ্যের উপর। কোটীবর্ষ, পঞ্চনগরী, পুষ্করণ, প্রভৃতি নগর প্রধানত রাষ্ট্রীয় ও সামরিক প্রয়োজনে হয়তো গড়ে উঠেছিল, কিন্তু কোটীবর্ষের অবস্থান এবং প্রাচীন সাহিত্যের উল্লেখ-ইঙ্গিতে মনে হয় এই নগরের কিছু কিছু বাণিজ্য এবং তীর্থমহিমাও ছিল অন্যতম। বস্তুত, অন্তত ষষ্ঠ-সপ্তম শতক পর্যন্ত প্রাচীন বাংলার সবকয়টি নগরের অবস্থিতি ও বিবরণ যতটুকু জানা যায়, তাতে মনে হয়, ব্যাবসা-বাণিজ্য বিবেচনার উপরই এঁদের অস্তিত্ব ও মর্যাদা নির্ভর করিত। বাৎস্যায়নের 'কামসূত্রে' বাংলার নগর-সভ্যতার যে সমসাময়িক চিত্রে সদাগরী ধনতন্ত্রের লক্ষণ সুস্পষ্ট। কিন্তু সপ্তম শতক ও তাহার পর থেকে ব্যাবসা-বাণিজ্য, বিশেষত সামুদ্রিক বহির্বাণিজ্যের অবনতির সঙ্গে সঙ্গে প্রাচীন বাংলার নগরগুলির আকৃতি ও প্রকৃতি ধীরে ধীরে বদলাতে আরম্ভ করে।

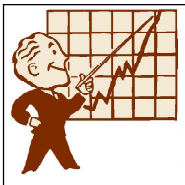
সপ্তম শতকে বাংলার যে-কয়টি নগরের বিবরণ পাওয়া যায়, তার মধ্যে এক তাম্রলিপ্তি ছাড়া আর একটিরও বাণিজ্য-প্রাধান্যের ইঙ্গিত নাই, বরং রাষ্ট্রীয় প্রয়োজন-প্রেরণার ইঙ্গিত লক্ষ করা যায়। অষ্টম-নবম শতক থেকে আরম্ভ করে হিন্দু আমলের শেষ পর্যন্ত যে-কয়টি নগরের বর্ণনা করা হয়েছে, তাতে তাঁদের ভৌগোলিক অবস্থিতি, নগর-বিন্যাস এবং সমসাময়িক উল্লেখ দেখে মনে হওয়া স্বাভাবিক যে, অধিকাংশ নগরের পশ্চাতে রাষ্ট্রীয়, বিশেষভাবে সামরিক প্রয়োজন-বিবেচনা সক্রিয় ছিল। মুদগগিরি, বিলাসপুর, হরধাম, রামাবতী, লক্ষ্মণাবতী, বিজয়পুর, সপ্তগ্রাম, বিক্রমপুর, সুবর্ণ গ্রাম, পট্টিকেরা প্রভৃতি সমস্ত নগর সম্বন্ধেই এই উক্তি প্রযোজ্য। দুই একটি নগর, যেমন ত্রিবেণী, নবদ্বীপ, সোমপুর এবং অন্যান্য বৌদ্ধ বিহার-নগর প্রভৃতির পশ্চাতে হয়তো ধর্ম, শিক্ষা ও সংস্কৃতির প্রয়োজন-প্রেরণাই প্রধান বিবেচনার বিষয় ছিল।

রামাবতী ও বিজয়পুরের যে বর্ণনা যথাক্রমে রামচরিত ও পবনদূতে পাওয়া যায়। মহাস্থান-বাণগড়-রামপাল-পট্টিকেরা প্রভৃতি নগরের ধ্বংসাবশেষের মধ্যে নগর-বিন্যাসের যে-চিত্র উদ্‌ঘাটিত, তা সমস্তই অষ্টম শতক পরবর্তী। বলা বাহুল্য, যে ভাবে নগরগুলি অবস্থিত ও বিন্যস্ত তাতে সামরিক ও রাষ্ট্রীয় প্রয়োজন, রাজকীয় প্রয়োজন এবং ধন ও বংশাভিমান-সমৃদ্ধ অভিজাত শ্রেণিসমূহের প্রয়োজনকেই বেশি গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। মহাস্থান-বাণগড়-রামপালের ধ্বংসাবশেষ

বিশ্লেষণে দেখা যায়, প্রত্যেকটি নগরই প্রাকার-বেষ্টিত এবং প্রাকারের পরেই পরিখা। নগর থেকে, নগরোপকণ্ঠে বা নদীর ঘাটে যাবার জন্য প্রাকারের প্রত্যেক দিকেই এক বা একাধিক নগরদ্বার এবং পরিখার উপর দিয়া সেতু ছিল। পরিখার অপর পারে নগরোপকণ্ঠে সমাজ-সেবক, সমাজ-শ্রমিক এবং নগর-নির্ভর কুটুম্ব-গৃহস্থদের বাস; কোথাও কোথাও মন্দির, সংঘ, বিহার প্রভৃতিও লক্ষ করা যায়। নগরাভ্যন্তরে উচ্চতর ভূমির উপর প্রাচীর-বেষ্টিত রাজপ্রাসাদ। রাজপ্রাসাদের সংলগ্ন রাজকীয় এবং শাসনকার্যসংক্রান্ত অট্টালিকাদি। সোজা সরল রেখায় পূর্ব-পশ্চিম ও উত্তর-দক্ষিণে লম্ববান রাজপথদ্বারা সমস্ত নগরভূমি পৃথক পৃথক চতুর্ভুজে বিভক্ত; রাজপথের দুইধারে সমান্তরালে প্রাসাদোপম আবাস-সৌধশ্রেণি, আপণি-বিপণি প্রভৃতি: তাছাড়া, হাট-বাজার, মন্দির, প্রমোদোদ্যান, দীঘি, পুষ্করিণী, বিহার প্রভৃতির বর্ণনাও দেখা যায়।

সকল নগরই যে সমৃদ্ধ ও ঐশ্বর্যবান ছিল, তা বলা যায় না। সেইসময় অনেক ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র নগরও ছিল, যাদের সামরিক বা রাষ্ট্রীয় বা অন্য কোনও গুরুত্ব যথেষ্ট ছিল না। বিষয়াধিষ্ঠান, মণ্ডল্যাধিষ্ঠান, বীথী-অধিষ্ঠান প্রভৃতি জাতীয় নগর সর্বত্র উপরোক্ত নগরগুলির মতো সমৃদ্ধ ছিল না। ছোট ছোট তীর্থ বা শিক্ষাকেন্দ্রগুলিও অনেকটা বৃহৎ সমৃদ্ধ গ্রামের মতনই ছিল। বিষয়, মণ্ডল বা বীথীর অধিষ্ঠানগুলি অধিকাংশ ক্ষেত্রেই রাজস্ব সংগ্রহের, স্থানীয় বিচার-ব্যবস্থর, ভূমি-ব্যবস্থার, শান্তিরক্ষা-ব্যবস্থার নিয়ন্ত্রণ-কেন্দ্র ছিল। কিছু কিছু স্থানীয় বাণিজ্যকর্মও এই সব কেন্দ্রে হত। এইসব উপলক্ষে কিছু কিছু রাজকর্মচারী, বিভিন্ন শিল্পী, বণিকের অধিষ্ঠানগুলিতে বাস করতেন; কিন্তু তৎসত্ত্বেও গ্রামের সঙ্গে এই জাতীয় নগরের বিশেষ কিছু পার্থক্য ছিল না।

অধিকাংশ লিপিতেই দেখা যায়, এই জাতীয় ছোট ছোট নগরের সঙ্গে গ্রামগুলি একেবারে সংলগ্ন; নগরের পথ গ্রামে মিশেছে, অথবা গ্রামের পথ নগর পর্যন্ত বিস্তৃত হয়েছে। নিকটস্থ গ্রামের উৎপাদিত কৃষি ও শিল্পবস্তু নিয়েই এই সব ছোট ছোট নগরের স্থানীয় ব্যাবসা-বাণিজ্য চলত।



অগ্রগতি নির্ধারক প্রশ্ন

৩. প্রাচীন সাহিত্য বাংলার নগরের যে ছবি পাওয়া যায় তা নিজর ভাষায় লিখুন। (২০০ শব্দের মধ্যে)

৩.৫ অন্ত্যজ বর্ণের জীবন ও যাপন চিত্র

করণ-কায়স্থ এবং বৈদ্য-অম্বষ্ঠদের পরেই গোপ, নাপিত, মালাকার, কুম্ভকার, কর্মকার, শংখকার, কংসকার, তন্তুবায়, মোদক এবং তাম্বলীদের স্থান। গন্ধবণিক, তৈলিক, তৌলক (সুপারী-ব্যবসায়ী), দাস (চাষী), এবং বারজীবি (বারুই), এঁদেরও সমপর্যায়ে গণ্য করা হত। এর মধ্যে কৃষিজীবি দাস ও বারজীবি, এবং শিল্পজীবি কুম্ভকার, কর্মকার, শংখকার, কংসকার ও তন্তুবায় ছাড়া আর কাউকে ধনোৎপাদক শ্রেণির মধ্যে গণ্য করা যায় না। গোপ, নাপিত,

মালাকারেরা সমাজ-সেবক মাত্র। মোদক, (তাম্বুলী) তৈলিক-তৌলিক এবং গন্ধবণিকেরা ব্যবসায়ী শ্রেণি এবং সেই জন্য অর্থোৎপাদক শ্রেণির মধ্যে গণ্য করা যায়; তবে এঁদের মধ্যে মোদক বা ময়রার ব্যবসায় বিস্তৃত বা যথাযথভাবে ধনোৎপাদক ছিল, এমন বলা যায় না। গুবাক, পান এবং গন্ধদ্রব্যের ব্যবসায় সুবিস্তৃত ছিল। কেরানিরা সোজাসুজি কেরানি, পুস্তপাল, হিসাবরক্ষক, দপ্তর-কর্মচারী; অম্বষ্ঠ-বৈদ্যরা চিকিৎসক, সকলেই মধ্যবিত্ত শ্রেণি। ব্রহ্মবৈবর্ত পুরাণের সাক্ষ্য থেকে স্পষ্টই মনে হয়, স্বর্ণকার ও অন্যান্য বণিকেরা হয়তো তাদের অন্তর্গত ছিলেন। আগে যাঁরা উত্তম সংকর বা সৎশূদ্র পর্যায়েই গণ্য হতেন, কিন্তু বৃহদ্ধর্ম ও ব্রহ্মবৈবর্ত পুরাণ রচনাকালে তাঁরা 'পতিত' বলে গণ্য হয়েছেন। দ্বাদশ শতকে ভবদেব ভট্টও সুবর্ণকারদের নিম্নজাত পর্যায়ে দেখিয়েছেন। বল্লালচরিতে যে বলা হয়েছে, বল্লাল সেন কোনও কোনও বণিক, বিশেষ ভাবে সুবর্ণবণিকদের সমাজে 'পতিত' করিয়া দিয়েছিলেন, তার সঙ্গে ব্রহ্মবৈবর্ত পুরাণের এই ইঙ্গিতের যোগ থাকা অসম্ভব নয়। অন্তত এইটুকু স্পষ্ট যে, কোনও না কোনও কারণে অর্থোৎপাদক শিল্পী ও বণিক সম্প্রদায়ের কোনও কোনও অংশ সমাজে 'পতিত' হয়েছিল, তা রাষ্ট্রের নির্দেশে বা অন্ত যে কোনও কারণে।

আশ্চর্য এই যে, সমাজের ধনোৎপাদক অনেক শিল্পী, ব্যবসায়ী ও শ্রমিক সম্প্রদায়ের লোকেরাই সৎশূদ্র বা উত্তম সংকর বলিয়া গণিত হননি। এঁদের মধ্যে স্বর্ণকার, সুবর্ণবণিক, তৈলকার, চিত্রকার, স্বত্রধার, শোণ্ডিক বা শুড়ি, তক্ষণ, ধীবর-জালিক-কৈবর্ত অট্টালিকাকার, কোটক প্রভৃতি নাম করতে হয়; এঁরা সকলেই মধ্যম সংকর বা অসৎশূদ্র পর্যায়ের। যুঙ্গি-যুগীরা এবং চর্মকারেরাও অর্থোৎপাদক শিল্পী শ্রেণির অন্যতম; এঁরাও অসৎশূদ্র বা মধ্যম সংকর। নট সেবক মাত্র, ভবদেব ভট্টের মতে নট হল নর্তক। চর্মকার, শুড়ি, রজক, এঁরা সকলেই নিম্নজাতের লোক। এঁরা প্রয়োজনীয় সামাজিক স্তর সন্দেহ নেই, কিন্তু শোণ্ডিক ও চর্মকার ছাড়া অন্য দুইটিকে ঠিক অর্থনৈতিক স্তরের লোক বলা চলে কিনা সন্দেহ। বৃহদ্ধর্মপুরাণের মতে চর্মকারেরা একেবারে অন্ত্যজ পর্যায়ে পরিগণিত -তাঁদের বৃত্তির জন্য। অসৎশূদ্র পর্যায়ভুক্ত মল্ল (= মালো, মাঝি?) এবং রজক প্রয়োজনীয় সমাজ-শ্রমিক। বৃহদ্ধর্মপুরাণের মতে মল্ল অন্ত্যজ পর্যায়ভুক্ত।

সমাজ-শ্রমিকেরা প্রায় অধিকাংশই অন্ত্যজ বা ম্লেচ্ছ পর্যায়ের, বর্ণাশ্রমের বাইরে তাঁদের স্থান। চণ্ডাল, বরুড় (বাউড়ী), ঘট্টজীবি (পাটনী?), ডোলাবাহী (দুলিয়া, দুলে), মল্ল (মালো?), হড্ডি (হাড়ি), ডোম, জোলা, বাগতীত (বাগদী?)-এঁরা সকলেই সমাজের একান্ত প্রয়োজনীয় শ্রমিক-সেবক, অথচ এঁদের স্থান নির্দিষ্ট হইয়াছিল সমাজের একেবারে নিম্নতম স্তরে। অন্ত্যজ পর্যায়ের আর একটি বর্ণের খবর দিয়েছেন বন্দ্রজঘটীয় আর্তিহর পুত্র সর্বানন্দ (১১৬০)। এঁরা বেদে বা বাদিয়া; বাদিয়ারা সাপখেলা দেখিয়ে বেড়াত (ভিক্ষার্থং সর্পধারিণি বাদিয়া ইতি খ্যাতে)। চর্যাগীতিগুলি থেকে ডোম, চণ্ডাল, শবর প্রভৃতি নিম্ন অন্ত্যজ বর্ণ ও কৌমের নরনারীর বৃত্তির একটা মোটামুটি ধারণা করা যায়-বাঁশের তাঁত ও চাঙারি বোনা, কাঠ কাটা, নৌকার মাঝিগিরি করা, নৌকা ও সাঁকো তৈরি করা, কাঠ কাটা, মদ তৈরি করা, জুয়া খেলা, তুলা ধোনা, হাতি পোষা, পশু শিকার, নৃত্যগীত ইত্যাদি ছিল এঁদের বৃত্তি। এই সব বস্তু আশ্রয় করেই বৌদ্ধ সহজ-

সাধকদের গভীর আধ্যাত্মিক উপলব্ধি প্রকাশ পেয়েছে।

শ্রীহট্ট জেলার ভাটেরা গ্রামে প্রাপ্ত একটি লিপিতে সৎ ও অসৎ শূদ্র উভয় পর্যায়েরই কয়েকজন ব্যক্তির সাক্ষাৎ পাওয়া যায়। কয়েকটি অজ্ঞাতনামা গোপ, একজন কংসকার গোবিন্দ, নাপিত গোবিন্দ, এবং দন্তকার রাজবিগা- এঁরা সৎশূদ্র পর্যায়ের সন্দেহ নাই, কিন্তু রজক সিরুপা অসৎশূদ্র পর্যায়ের; নাবিক দ্যোজে কোন পর্যায়ের বলা যায় না।

মনে রাখা দরকার, বর্ণ ও শ্রেণির পরস্পর সম্বন্ধের যেটুকু পরিচয় পাওয়া গেল তা একান্তই আদিপর্বের শেষ অধ্যায়ের। পূর্ববর্তী বিভিন্ন পর্যায়ে এই-পরিচয় খুব সুস্পষ্ট নয়। তবু, প্রাচীনতর স্মৃতি ও অর্থশাস্ত্রগুলিতে বর্ণের সঙ্গে শ্রেণির সম্বন্ধের একটা চিত্র মোটামুটি ধরতে পারা যায়, এবং অনুমান করা সহজ যে, অন্তত গুপ্ত আমল থেকে আরম্ভ করে বাংলা দেশেও অনুরূপ সম্বন্ধ প্রবর্তিত হয়েছিল। সেখানেও দেখা যায় অনেকগুলি অর্থোৎপাদক শ্রেণি-তাঁদের মধ্যে স্বর্ণকার, সুবর্ণবণিক, তৈলকার, গন্ধবণিক ইত্যাদিরাও আছেন — বর্ণ হিসাবে সমাজে এরা উচ্চস্থান অধিকারী নন, বরং কিছুটা অবজ্ঞাতই। আর, সমাজ-শ্রমিক যাঁরা, তাঁরা তো বরাবরই নিম্নবর্ণস্তরে, কেউ কেউ একেবারে অন্ত্যজ-অস্পৃশ্য পর্যায়ে। তবে, সমাজ যতদিন পর্যন্ত ব্যবসা-বাণিজ্য প্রধান ছিল, অন্তর্বাণিজ্য ও বহির্বাণিজ্যই ছিল সামাজিক ধনোৎপাদনের প্রধান উপায় ততদিন পর্যন্ত বর্ণস্তর হিসাবে না হোক, অন্ততঃ রাষ্ট্রে এবং সেইজন্য সামাজিক সম্মানে বণিক-ব্যবসায়ীদের বেশ প্রতিষ্ঠাও ছিল। কিন্তু সপ্তম-অষ্টম শতক থেকে বাঙালি সমাজ প্রধানত কৃষি ও ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গৃহশিল্পনির্ভর হয়ে পড়তে আরম্ভ করে, এবং তখন থেকেই অর্থোৎপাদক ও শ্রমিক শ্রেণিগুলি ক্রমশ সামাজিক মর্যাদাও হারাতে আরম্ভ করে। হাতের কাজই ছিল যাঁদের জীবিকার উপায় তাঁরা স্পষ্টতই সমাজের নিম্নতর ও নিম্নতম বর্ণস্তরে; অথচ বুদ্ধিজীবী ও মসীজীবী যারা তারাই উপরের বর্ণস্তর অধিকার করে আছেন এমন কি, কৃষিজীবি দাস-সম্প্রদায়ও অনেক ক্ষেত্রে বণিক-ব্যবসায়ী এবং অতি প্রয়োজনীয় সমাজ-শ্রমিক সম্প্রদায়গুলির উপরের বর্ণস্তরে অধিষ্ঠিত। মধ্য ও উত্তর ভারতে বর্ণস্তরের দৃঢ় ও অনমনীয় সংবদ্ধতা এবং সমাজের অর্থোৎপাদক ও শ্রমিক শ্রেণিস্তরগুলি সম্বন্ধে একটা অবজ্ঞা খ্রিস্টীয় তৃতীয় চতুর্থ শতক থেকেই দেখা গিয়েছিল। সঙ্গে সঙ্গে বর্ণের সঙ্গে শ্রেণির পারস্পরিক সম্বন্ধের বিরোধও ক্রমশঃ তীব্রতর হচ্ছিল। বাংলা দেশে, মনে হয়, মোটামুটিভাবে পাল আমল পর্যন্ত এই বিরোধ খুব তীব্র হয়ে দেখা দেয়নি; পাল আমলের শেষের দিকে, বিশেষভাবে সেন-বর্মণ-আমলে উত্তর ও মধ্যভারতের বর্ণ ও শ্রেণিগত সামাজিক আদর্শ, অর্থাৎ এই দুয়ের সুস্পষ্ট বিরোধ রূপ ফুটে লক্ষ করা যায়।



অগ্রগতি নির্ধারক প্রশ্ন

৪. টীকা লিখুন— প্রাচীন বাংলার অন্ত্যজবর্ণ। (১৫০ শব্দের মধ্যে)

৩.৬ অধ্যায় সংক্ষেপ

বাংলার সমাজ জীবনের ইতিহাসকেই বলা যায় বাঙালির ইতিহাস। এই জাতির গঠন ও বিকাশে বিভিন্ন জনগোষ্ঠীর অবদান স্বীকার্য। এই জাতির আবাস, বর্ণ বিন্যাস, ধন-সম্বল, উৎপাদন ব্যবস্থা, ভূমি-বিন্যাস এবং দৈনন্দিন জীবনযাপনে সমগ্র বাঙালি জাতির পরিচয় ফুটে ওঠে। যেখানে প্রাচীন বাংলার সাংস্কৃতিক এবং সামজিক দিক অন্যতম ভূমিকা পালন করে। অধ্যায়টিতে সামগ্রিকভাবে প্রাচীন বাংলার দৈনন্দিন জীবনে প্রতিফলিত জীবনযাপনের চিত্র, নগর ও পল্লীর জীবনাদর্শ, অন্ত্যজ বর্ণের জীবন ও যাপন চিত্র বর্ণিত হয়েছে।



৩.৭ অধ্যায়টি পাঠ করে আমরা কী শিখলাম

এই অধ্যায়টি পাঠ করে আমরা —

- প্রাচীন বাংলার সাংস্কৃতিক ও সামাজিক পরিচয় সম্পর্কে জানলাম।
- প্রাচীন বাংলার জীবনচিত্র ও দৈনন্দিন জীবন সম্পর্কে ধারণা পেলাম।
- প্রাচীন বাংলার নগর ও পল্লী জীবনাদর্শ প্রসঙ্গে অবগত হলাম।
- প্রাচীন বাংলার অন্ত্যজ বর্ণের জীবন ও যাপন চিত্রের পরিচয় পেলাম।



৩.৮ অতিরিক্ত পঠন

আচার্য্য, ড. দেবেশ কুমার (২০১৮); বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস, কলকাতা : ইউনাইটেড বুক এজেন্সি

চট্টোপাধ্যায়, কুন্তল (১৪১৮ বঙ্গাব্দ); সাহিত্যের রূপ-রীতি ও অন্যান্যপ্রসঙ্গ; কলকাতা : রত্নাবলী

চট্টোপাধ্যায়, তপনকুমার (আগস্ট, ২০১৭); কলকাতা : প্রজ্ঞাবিকাশ

চট্টোপাধ্যায়, পার্থ (২০০৮); বাংলা সাহিত্য পরিচয় ও সাহিত্য টীকা, কলকাতা : তুলসীপ্রকাশন

বন্দ্রোপাধ্যায়, অসিতকুমার (২০১৬-২০১৭); বাংলা সাহিত্যের সম্পূর্ণ ইতিবৃত্ত; কলকাতা : মডার্ণবুক এজেন্সী প্রাইভেট লিমিটেড

রায়, নীহাররঞ্জন (১৩৫৯ বঙ্গাব্দ); বাঙালির ইতিহাস: আদিপর্ব; কলকাতা : লেখক-সমবায়-সমিতি

সুর, ড. অতুল (২০১৭); বাংলা ও বাঙালির বিবর্তন; কলকাতা: সাহিত্যলোক



৩.৯ অগ্রগতি নির্ধারক উত্তর-সংকেত

১। নং প্রশ্নের উত্তর: সেসময় হিন্দুদের মধ্যে 'ব্রাহ্মণ', 'ক্ষত্রিয়', 'বৈশ্য' ও 'শূদ্র' এই চারটি বর্ণের ভাগ ছিল। সমাজে প্রত্যেক জাতিরই নির্দিষ্ট পেশা লক্ষ করা যায়-... -এভাবে সাজিয়ে লিখুন। (দ্রষ্টব্য ৩.৩)

২। নং প্রশ্নের উত্তর: সেই সময় বাঙালি মেয়েদের গুণাবলির সুখ্যাতি উচ্চপর্যায়ে ছিল-... ধন-সম্পত্তিতে নারীদের কোন আইনগত অধিকার ছিল ন। -....এভাবে সাজিয়ে লিখুন। (দ্রষ্টব্য ৩.৩)

৩। নং প্রশ্নের উত্তর: রামাবতী ও বিজয়পুরের যে বর্ণনা যথাক্রমে রামচরিত ও পবনদূতে পাওয়া যায়।... তাছাড়া, হাট-বাজার, মন্দির, প্রমোদোদ্যান, দীঘি, পুষ্করিণী, বিহার প্রভৃতির বর্ণনাও দেখা যায়।-এভাবে সাজিয়ে লিখুন। (দ্রষ্টব্য ৩.৪)

৪। নং প্রশ্নের উত্তর: করণ-কায়স্থ এবং বৈদ্য-অম্বষ্ঠদের পরেই গোপ, নাপিত, মালাকার, কুম্ভকার, কর্মকাব,... তা রাষ্ট্রের নির্দেশে বা অন্ত যে কোনও কারণে। -এভাবে সাজিয়ে লিখুন। (দ্রষ্টব্য ৩.৫)



৩.১০ আদর্শ প্রশ্নাবলি

১। প্রাচীন বাংলার সাংস্কৃতিক ও সামাজিক পরিচয় দিন।

২। প্রাচীন বাংলার জীবনচিত্র ও দৈনন্দিন জীবন সম্পর্কে যা জানুন লেখুন।

৩। প্রাচীন বাংলার নগর ও পল্লীর যাপনচিত্রের উপর প্রতিবেদন প্রস্তুত করুন।

৪। টীকা লেখুন — 'প্রাচীন বাংলার অন্ত্যজ বর্ণের জীবন ও যাপন চিত্র'।

অধ্যায় ৪ : বাঙালির সংস্কৃতি —দৈনন্দিন যাপন

বিন্যাস ক্রম

৪.১ জ্ঞাতব্য বিষয়
৪.২ পরিচিতি
৪.৩ বাঙালির খাদ্যাভ্যাস
৪.৪ বাঙালির সামাজিক আচার-ব্যবহার
৪.৪.১ জন্ম সংক্রান্ত আচার-অনুষ্ঠান
৪.৪.২ মৃত্যু সংক্রান্ত আচার-অনুষ্ঠান
৪.৪.৩ বিবাহ সংক্রান্ত আচার-অনুষ্ঠান
৪.৪.৪ অন্যান্য আচার-অনুষ্ঠান
৪.৫ বাঙালির পোশাক-পরিচ্ছদ
৪.৬ বাঙালির ব্যবহৃত আসবাব-পত্র
৪.৭ বাঙালির আমোদ-প্রমোদ
৪.৮ বাঙালির ব্যবহৃত যানবাহন
৪.৯ অধ্যায়টি পাঠ করে আমরা কী শিখলাম
৪.১০ অগ্রগতি নির্ধারক উত্তর-সংকেত
৪.১১ অতিরিক্ত পঠন
৪.১২ আদর্শ প্রশ্নাবলি

৪.১ জ্ঞাতব্য বিষয়

বাংলার সামাজিক ইতিহাস, সাংস্কৃতিক উত্তরাধিকার ও জাতিগত স্বাতন্ত্র্যকে অনুধাবন করতে হলে বাঙালির দৈনন্দিন জীবন যাত্রার বিভিন্ন দিককে বিশ্লেষণ করা অপরিহার্য। খাদ্যাভ্যাস, সামাজিক আচার-অনুষ্ঠানাদি, পোশাক-পরিচ্ছেদ, অলঙ্কার, তৈজস পত্রের ব্যবহার, আমোদ-প্রমোদ ও যানবাহন এই উপাদানগুলো শুধুমাত্র ব্যাক্তিগত জীবনাচারের অংশ নয়, বরং একটি জাতির জীবনবোধ, শ্রেণিচেতনা, রুচিবোধ ও সাংস্কৃতিক বিকাশের বহিঃপ্রকাশ। এই অধ্যায়টি দ্বারা শিক্ষার্থীরা সমাজ-সংস্কৃতির মৌলিক উপাদানগুলোর উৎস, বিবরণ ও বর্তমান প্রেক্ষাপটে এর গুরুত্ব উপলব্ধি করতে পারবেন। পাশাপাশি লোকজ সংস্কৃতি, ধর্ম ও সামাজিক পরিবেশের প্রভাবে গঠিত সাংস্কৃতিক বহুত্ববাদের স্বরূপ সম্পর্কে অবগত হতে পারবেন, বলেই এই অধ্যায়টিকে পাঠ্যক্রমের অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।

৪.২ পরিচিতি

পৃথিবীর প্রত্যেক সমৃদ্ধশালী জাতি নিজস্ব সংস্কৃতিকে আবহমানকাল ধরে বহন করে আসছে। তেমনি বাঙালির সংস্কৃতি তার সমৃদ্ধ ইতিহাস, বৈচিত্র্যময় ঐতিহ্য এবং দৈনন্দিন জীবনের অনন্য রীতি-নীতির মাধ্যমে বিশ্বে স্বতন্ত্র পরিচিতি লাভ করেছে। বর্তমানে বাংলাদেশে, ভারতের পশ্চিমবঙ্গ, ত্রিপুরা ও আসামের বাঙালি জনগোষ্ঠী এই সংস্কৃতির ধারক ও বাহক। বাঙালি সংস্কৃতির মূল ভিত্তি হচ্ছে তার ভাষা ও সাহিত্য। প্রাচীন কাল থেকে মধ্যযুগ এবং আধুনিক কাল পর্যন্ত বাংলা ভাষা-সাহিত্য তার বৈচিত্র্য ও গভীরতার জন্য বিশ্বব্যাপী স্বীকৃতি লাভ করেছে। চর্যাপদ থেকে শুরু করে রবীন্দ্রনাথ, নজরুল, জীবনানন্দ দাশ প্রমুখ কবি ও সাহিত্যিকদের সৃষ্টিতে বাংলা সাহিত্য সমৃদ্ধ। তাছাড়া লোকসাহিত্য ও শিল্প বাঙালির জীবনে এবং বিশেষ স্থান আধিকার করে আছে। বাঙালির জীবন উৎসবমুখর। বাংলা নববর্ষ, দুর্গা পূজা, দোল উৎসব, লক্ষ্মী পূজা, সরস্বতী পূজা, দীপাবলি এবং ইসলাম ও খ্রিস্টধর্মীয় বিভিন্ন উৎসব ও পার্বণ বাঙালির জীবনে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ অংশ। এসব উৎসবে পরিবার ও সমাজের মানুষ একত্রিত হয়ে আনন্দ উদ্‌যাপন করে, যা বাঙালির সামাজিক বন্ধনকে দৃঢ় করেছে। বাঙালির খাদ্য সংস্কৃতি তার বৈচিত্র্য স্বাদে অনন্যতা লাভ করেছে। মাছ ভাত বাঙালির প্রধান খাদ্য হলেও রকমারি ব্যঞ্জন, পিঠা, মিষ্ট দ্রব্য বাঙালির রসনাবিলাসে বিশেষ স্থান আধিকার করে নিয়েছে। বাঙালি নর-নারী ঐতিহ্যবাহী পোশাক ও অলঙ্কার বাঙ্গালিয়ানার বিশেষ প্রতীক। বাংলার লৌকিক আচার-অনুষ্ঠান তার জাতীয় জীবনের অঙ্গস্বরূপ। প্রাচীন কাল থেকে বাংলার গ্রামাঞ্চলের কৃষি কাজ মৎস শিকার পশুপালন এবং হস্ত শিল্প ইত্যাদি পেশার বাংলার অর্থনীতিতে বিশেষ প্রভাব ফেলে আসছে। সময়ের সঙ্গে বাঙালি সংস্কৃতিতে পশ্চিমা প্রভাব, প্রযুক্তির উন্নয়ন, নগরায়ন ইত্যাদি কারণে বাঙালির জীবন যাত্রায় আধুনিক ছোঁয়া লাগিয়ে বাঙালি ঐতিহ্যের সঙ্গে বর্তমান যুগের পরিবর্তনে নিজস্ব সংস্কৃতির স্বকীয়তা অক্ষুণ্ণ রেখেছে।

৪.৩ বাঙালির খাদ্যাভ্যাস

বাংলার সংস্কৃতিতে বাঙালি খাদ্যাভ্যাসের ইতিহাস বৈচিত্র্যময় উপাদানে সমৃদ্ধ। বাংলার সংস্কৃতির ভূগোল এবং ঐতিহাসিক পরিবর্তনের প্রভাব বাঙালির খাদ্য সংস্কৃতিকে বৈচিত্র্যময় ও সমৃদ্ধ করে তুলেছে। বাঙালির প্রাচীন খাদ্যাভ্যাসের যে বর্ণনা প্রাকৃত পৈঙ্গলে পাওয়া যায়, সেখানে দেখা যায় বনিতা তার স্বামীকে পরিবেশন করে খাওয়াচ্ছেন— "অগগর ভত্তা/রম্ভঅ পত্তা/গাইক ঘিত্তা/দুগ্ধ সজুত্তা/ মৌইলি মাচ্ছা/নালিচ গাচ্ছা/দিজ্জই কান্তা/ খাঅ পুনবন্তা।।" অর্থাৎ কলাপাতে গরম ভাত, সঙ্গে গাওয়া ঘি, দুধ, মাছ, নালিতা বা পাটশাক; পাতে পরিবেশন করার চিত্র। মধ্যযুগীয় সাহিত্যে যেমন— মঙ্গলকাব্য ধারায় প্রাচীন বাঙালির খাদ্য তালিকার বিস্তৃত বিবরণ পাওয়া যায়। মুকুন্দ চক্রবর্তীর 'চণ্ডীমঙ্গল' কাব্যে কালকেতুর ভোজনে যেন— ব্যঞ্জন সন্নিবিষ্ট হয়েছে যেমন পান্তা ভাত, আলু, ওল পোড়া, তাতে প্রমাণিত হয় যে—, গ্রামীণ

সাধারণ গৃহস্থের খাওয়া দাওয়ার ধরন সরল ও সাদাসিধে ধরনের ছিল। বাংলার ধনী সমাজে খাদ্য তালিকায় চৌষট্টি রকমের ব্যঞ্জনের কথা প্রবাদ বাক্যে পরিণত হয়েছে। মৎস্য ও মাংস আহার বৌদ্ধধর্মের প্রাদুর্ভাবের সময় বাঙালির ধর্মান্তরণ কালে প্রিয় খাদ্য মৎসাহারকে বর্জন করতে পারেনি। মহাজানের প্রবর্তক লুইপাদের মাছের তেল চচ্চড়ি প্রিয় ব্যঞ্জন ছিল, বলে বৌদ্ধ গ্রন্থে উল্লেখ রয়েছে। বঙ্গ দেশ নদ-নদী, খাল-বিলে বহুল প্রভাবিত দেশ। তাই দেখা যায় প্রাচীন থেকে বর্তমান পর্যন্ত বাঙালির অন্যতম প্রিয় খাদ্যবস্তু মৎস্য। আর্য বা বাঙালির, মৎস্য ভোজনকে কোনোদিন ভালো চোখে দেখেননি আর্য ব্রাহ্মণরা নিরামিষ ভোজনের পক্ষপাতী ছিল। বৃহদ্ধর্মপুরাণ অনুযায়ী রোহিত বা রুই, শফর বা পুঁটি, সোল এবং শ্বেতবর্ণ ও আঁশযুক্ত অন্যান্য মাছ যেমন ইলিশ ব্রাহ্মণদের পক্ষে খাওয়া নিষিদ্ধ ছিল। তার মধ্যে পচা বা শুকনা মাছও নিষিদ্ধ ছিল। বাঙালি সমাজে মাংসের মধ্যে হরিণের মাংস খুবই প্রচলিত ছিল বিশেষত শবর, পুলিন্দ প্রভৃতি শিকারজীবী লোকদের মধ্যে এবং অভিজাত শ্রেণির মধ্যে ছাগ মাংস বহুল প্রচলিত ছিল। আদিবাসী কৌম সমাজে শুকনো মাংস খাওয়ার রীতি ছিল। শামুক, কাঁকড়া, মোরগ, শারস, বক, হাঁস, উট, শূকর ও গোমাংস ব্রাহ্মণ-শাসিত সমাজে অভক্ষ্য ছিল। নিম্নতর সমাজস্তরে এবং আদিবাসী কৌম সমাজে এসকল খাদ্যবস্তুর খুব বেশি করে প্রচলিত ছিল। পঞ্চনখ প্রাণীদের মধ্যে গোধা, শশক, সজারু ও কচ্ছপের মাংস খাওয়ার বাধা নিষেধ কারো মধ্যে ছিল না। মৎস্য প্রীতি ও হরিণের মাংসের ব্যবহারের কথা বিভিন্ন প্রাচীন গ্রন্থসমূহে উল্লেখ রয়েছে। আধুনিকতার ছোঁয়ায় বর্তমানকালে মাংসের বিভিন্ন ব্যঞ্জন বাঙালির খাদ্য তালিকায় যুক্ত হয়েছে।

তরকারী ও ফলাহার:

সুপ্রাচীন কালে বাঙালির নানা প্রকার শাক খাওয়ার অভ্যাস ছিল। যে সকল উদ্ভিদজাত তরকারী-আজও বাঙালির পাকশালে ব্যবহৃত হচ্ছে তার অধিকাংশই আদি অস্ট্রিক ভাষা-ভাষীর গোষ্ঠীর দান, যেমন—বেগুন, লাউ, কুমড়া, ঝিঙ্গে, কাঁকরুল, কচু প্রভৃতি। ফলের মধ্যে—কলা, তাল, আম, কাঁঠাল, নারিকেল ও আখের ব্যবহারের উল্লেখ প্রাচীন বাংলার খাদ্য তালিকায় বার বার পাওয়া যায়। প্রাচীন বাংলার ভাস্কর্য ও চিত্রে কলাগাছের বাস্তব চিত্র রয়েছে তা থেকে বোঝা যায়, আম ও কাঁঠালের সঙ্গে কলার ব্যবহার ও খুব বেশি পরিমাণে করা হত। এছাড়া — প্রাচীন গ্রন্থ যেমন— 'সদুক্তিকর্ণামৃত-এ' তেঁতুলের উল্লেখ রয়েছে। আশ্বিন মাসের কোজাগরী পূর্ণিমা নারকেলের প্রস্তুত নানা রকমের সন্দেশের সঙ্গে চিড়া খাওয়ার উল্লেখ 'কালবিবেক' গ্রন্থে রয়েছে। তাছাড়া চিড়া-মুড়ি-খৈ-এর ব্যবহার বিশেষভাবে পূজা ও বিবাহোৎসবে করা হত।

পানীয়:

দুধ, নারকেলের জল, আখের রস, তাল রস ছাড়া মদ্যজাতীয়পানীয় প্রাচীন বাংলায় প্রচলিত ছিল। ইক্ষুর রস বর্তমানের মতোই প্রাচীনকালে পানীয় হিসাবে বাঙালি সমাজে সমাদৃত হত। গুড় থেকে প্রস্তুত গৌড়িয় মদের খ্যাতি সর্বভারতব্যাপী ছিল। তাছাড়া ভাত, গম, গুড়, মধু, আখ প্রভৃতি সাজিয়ে নানা-বিধ মদ প্রস্তুত করা হত। দ্বিজ ব্রাহ্মণদের মদ্যপান নিষিদ্ধ ছিল।

চর্যাগীতিতে শুঁড়ি খানার উল্লেখ রয়েছে। বৌদ্ধ সিদ্ধাচার্যদের মদ্যপানকে গর্হিত কাজ বলে মানাহত না। তাছাড়া এক বিশেষ জাতীয় গাছের সরু বাকল বা শিক শুকিয়ে গুড়া করে মদ প্রস্তুত করা হত। বেলের খোলাকে মদ্য পানের পাত্র হিসাবে ব্যবহার করা হত। বর্তমান কালে বাঙালির পানীয়ের তালিকায় ফলমূল বিভিন্ন রসের সঙ্গে কোল্ড ড্রিংকের ব্যবহার অতি জনপ্রিয়তা লাভ করেছে।

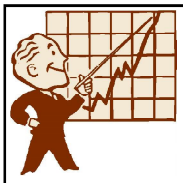
বিবাহ ভোজ:

অভিজাত শ্রেণির বিবাহ ভোজে ব্যঞ্জক ও বিবিধ পদ পরিবেশন করা হত। বিবাহে বরযাত্রীরা কোনো কোনো সময় ব্যঞ্জন পদগুলো হাতে গুণে উঠতে পারতো না। বিবাহে প্রচলিত খাদ্য তালিকার মধ্যে ছিল দই ও সরিষাযুক্ত শ্বেতবর্ণ ঝালযুক্ত কোনো ব্যঞ্জন, হরিণ, ছাগ পক্ষীর মাংসের নানা রকম ব্যঞ্জন, মাছের ব্যঞ্জন, অন্যান্য ধরনের মসলাযুক্ত সুগন্ধিত ব্যঞ্জনাদি, নানাবিধ পিঠা, দই, পানীয়ের মধ্যে থাকত কর্পূর মিশ্রিত জল। ভোজনের পর মশলাযুক্ত পানের খিলি পরিবেশিত হত। পানের ব্যবহার বিধি নানা পূজা পার্বণেও করা হত। আদিবাসী কৌম সমাজে পানের ব্যবহার পরবর্তীতে আর্য ভারতীয় রীতি হিসাবে গৃহীত হয় তা থেকে অভিজাত শ্রেণির মধ্যে এই রীতি প্রচলিত হয়। বর্তমানেও ব্যবহার অক্ষুণ্ণ আছে।

দুগ্ধজাত খাদ্যদ্রব্য যেমন— দই, ক্ষীর, মাখন, পায়েস প্রভৃতি চিরকালই বাঙালির প্রিয় খাদ্য। ডালের ব্যবহার বাঙালির খাদ্য তালিকায় প্রাচীন বাংলায় ছিল না। কিন্তু বাংলাদেশের কোনো কোনো জেলা যেমন বরিশাল ও ফরিদপুরে উদ্ভিদজ ও আমিষ ব্যঞ্জনাদি খাওয়ার পর সবার শেষে ডাল খাওয়ার রীতি প্রচলিত। বর্তমানে পুষ্টিকর খাদ্যের তালিকায় ডালের ব্যবহার বাঙালি গৃহে অপরিহার্য হয়ে বসেছে।

বাংলার বিশেষ খাদ্যদ্রব্যের মধ্যে রয়েছে—

বাংলার প্রসিদ্ধ শাক শুক্তানির ঘন্ট, নিরামিষ, ব্যঞ্জন ও তরকারি, পূর্ব বঙ্গের মৎস্য ও মাংসের দ্বারা তৈরি বিশেষ রীতির সুস্বাদু ব্যঞ্জন, বাংলার কাসুন্দি, ছড়াতেঁতুল, আচার, খেজুরে গুড়, পাটালী, মুড়ি, মুড়কী, চালের গুঁড়া নারকেল ও ক্ষীরের তৈরি নানা রকমের পিঠা ও মিষ্টদ্রব্য; বীরখণ্ডী, কদমা, খাজা, গজা, সীতা-ভোগ, মিহিদানা ইত্যাদি, ছানার তৈরি মিষ্টান্ন। জলভরা সন্দেশ, পানিতোয়া, রসগোল্লা, বাংলার নিজস্ব মিষ্টান্ন প্রভৃতি। বহিরাগত সংস্কৃতির প্রভাবে বাঙালির খাদ্য তালিকায় মোগল আমল থেকে কোফতা, বিরিয়ানি, কর্মা প্রভৃতি খাবার উপনিবেশিক সংস্কৃতির পরিবর্তে বাঙালি খাদ্যের মধ্যে কেক, পাউরুটি প্রচলন শুরু হয়েছিল।



অগ্রগতি নির্ধারক প্রশ্ন

১. বাঙালির খাদ্য অভ্যাস সম্পর্কে আলোচনা করুন। (১৫০ শব্দের মধ্যে)

৪.৪ বাঙালির সামাজিক আচার-ব্যবহার

প্রত্যেকটি জাতির নিজের সামাজিক ও সাংস্কৃতিক আচার-ব্যবহার রয়েছে। বাঙালির আচার ও অনুষ্ঠানগুলো বাংলার সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের প্রাণবন্ত অভিব্যক্তি। বাঙালি জীবনের প্রতিটি স্তরে এই আচার অনুষ্ঠানগুলো গভীরভাবে প্রোথিত রয়েছে। জন্ম-মৃত্যু-বিবাহ তথা অন্যান্য ধর্মীয় বিষয়কে কেন্দ্র করে বাঙালি সমাজে যে সকল আচার-অনুষ্ঠান পালিত হয়, তা আসলে বাংলার সংস্কৃতির বিশিষ্ট পরিচয়কে স্পষ্ট করে তুলেছে। এক কথায় বলা যায় এই বিষয়গুলো বাঙালি সংস্কৃতির অপরিহার্য অঙ্গস্বরূপ, প্রাচীনকাল থেকে বর্তমানকাল পর্যন্ত বাঙালির সমাজ দ্বারা নিষ্ঠার সঙ্গে পালিত হয়ে আসছে।

৪.৪.১ 'জন্ম' সংক্রান্ত আচার অনুষ্ঠান

সৃষ্টির ঊষালগ্ন থেকে মানব শিশুর জন্মকে কেন্দ্র করে মানব সংস্কৃতির ধারাবাহিকতা ও উত্তরাধিকার রক্ষিত হয়ে আসছে। অর্থাৎ বলা যায় মানব সভ্যতার উত্তরাধিকার রক্ষার অন্যতম প্রক্রিয়া হল জন্ম। একটি মানব শিশুর জন্ম কোন ব্যক্তিগত ঘটনা নয়, তার একটি সামাজিক ও সাংস্কৃতিক তাৎপর্য রয়েছে। জন্মের পর গড়ে ওঠা বিভিন্ন আচার-অনুষ্ঠান সমাজের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য, ধর্মীয় বিশ্বাস ও সামাজিক সংগঠনের প্রতিফলন। সামাজিক ঐক্য ও প্রজন্মগত ধারাবাহিকতা সংরক্ষণের ভূমিকা অপরিহার্য। ইতিহাসবিদ ড. রমেশচন্দ্র মজুমদার এ প্রসঙ্গে বলেছেন, "ভারতীয় সমাজে জন্ম সংক্রান্ত আচার-অনুষ্ঠানগুলি কেবল ধর্মীয় রীতি নয়, বরং সামাজিক পরিচয়ের ভিত্তি।" বাঙালি সমাজেও জন্ম সংক্রান্ত আচার-অনুষ্ঠান বিশেষ গুরুত্ব লাভ করেছে। প্রাচীনকালের কৌম সমাজের নবজাতকের জন্মের পর যে ক্রিয়াকর্ম ও অনুষ্ঠান প্রচলিত ছিল তা বিভিন্ন গ্রন্থে উল্লেখ রয়েছে। বৈদিক যুগে জাতিকর্ম ও 'নামকরণ' অনুষ্ঠান ছিল নবজাতকের সামাজিক গ্রহণযোগ্যতার প্রতীক। মহাভারত ও মনুর শাস্ত্রে অন্নপ্রাশন ও কর্ণচ্ছেদের উল্লেখ রয়েছে। বর্তমান কালে বাঙালি সমাজের নবজাতকের জন্মকে কেন্দ্র করে যে সকল আচারাদি পালিত হয়, তা আসলে আর্য সংস্কৃতির অবদান। বাঙালি সমাজে জন্মসংক্রান্ত আচার-অনুষ্ঠানের মধ্যে অন্যতম — ষষ্ঠীপূজা, নামকরণ, অশৌচপালন, কর্ণচ্ছেদন, অন্নপ্রাসন,মুণ্ডন, হাতেখড়ি প্রভৃতি।

ষষ্ঠীপূজা:

ষষ্ঠীপূজা বাঙালি সমাজের এক প্রাচীন ও গুরুত্বপূর্ণ লৌকিক আচার, যা মূলত মঙ্গল ও পরিবারের সমৃদ্ধ কামনায় পালিত হয়। দেবীকে সন্তানের রক্ষাকর্ত্রী ও প্রজননের দেবীরূপে পূজা করা হয়। লৌকিক মতে দেবীর পূজার ফলে নিঃসন্তান দম্পতিরা সন্তান লাভ করে এবং সন্তানের সুরক্ষা ও সুস্থতা বজায় থাকে। সন্তান প্রসবের ছয় দিনের মাথায় ষষ্ঠী পূজা করার রীতি বাঙালি সমাজে আজও প্রচলিত আছে। গ্রামাঞ্চলে

হিন্দুমাত্রই এই অনুষ্ঠান পালন করে থাকে। প্রাচীনকালে কোন কোন আদিবাসী সমাজে শিশুর জন্মের ছয় দিন গো-ভাসার থেকে গো-মুণ্ডনিয়ে এসে আতুর ঘরের প্রথার রীতি প্রচলিত ছিল । মধ্যযুগীয় বাংলা সাহিত্যে 'চণ্ডীমঙ্গল' কাব্যে কালকেতুর জন্মের পর ষষ্ঠী পূজার বিভিন্ন রীতি পালনের প্রসঙ্গে ষষ্ঠীপূজা আতকলাই, নর্তা, একসির্তা, প্রভৃতি উৎসবের উল্লেখ রয়েছ।

নামকরণ রীতি:

শিশুর সামাজিক পরিচয়ের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ অনুষ্ঠান। বাঙালি সমাজে কোথাও শিশুর জন্মের ছয়দিনের মাথায় বা ষষ্ঠী পূজার দিন পালিত হয়। আবার কোথাও একুশ দিনের দিন আতুর ঘরের অশৌচ স্নানের পর করা হয়। ঘি-য়ের প্রদীপ জ্বালিয়ে শিশুর নামকরণের রীতি আজও বাঙালির ঘরে প্রচলিত।

অন্নপ্রাশন:

শিশুর প্রথমবারের অন্নগ্রহণের আচার অনুষ্ঠানকে কেন্দ্র করে বাঙালি গৃহে পালিত উৎসব অন্নপ্রাশন। শিশুর পাঁচ-ছয় মাসের মাথায় কোনো শুভদিন দেখে এই অনুষ্ঠান পালন করা হয়। শিশুর নতুন দাঁত গজানোর আগেই এই অনুষ্ঠান পালন করার রীতি বাঙালি সমাজে বর্তমানেও প্রচলিত রয়েছে।

হাতেখড়ি :

শিশুর শিক্ষা সূচনা উপলক্ষ্যে সাংস্কৃতিক ও ধর্মীয় অনুষ্ঠান। হিন্দু বাঙালি সমাজে সাধারণত সরস্বতী পূজা বা অন্য কোনো শুভ ও বিশেষ দিনে দেবতার আশীর্বাদ নিয়ে বর্ণমালার প্রথম অক্ষর লেখানো হয়। এতে গুরুজন বা শিক্ষক শিশুর হাত ধরে প্রথম অক্ষর লেখান। মুসলিম সমাজে ইসলামিক শিক্ষা গ্রহণের সূচনায় মক্তব বা মাদ্রাসায় প্রথমবার কোরান শেখার সময় শিশুর হাতের খড়ি হয়।

তাছাড়া মুণ্ডন বা কর্ণ ছেদন অনুষ্ঠানের রীতি রয়েছে, যা শিশুর এক থেকে তিন বছরের মধ্যে কোনো শুভ দিনে প্রথমবার সম্পূর্ণ মাথায় চুল কামানোর রীতি সম্পন্ন করার অনুষ্ঠান বাঙালি সমাজে প্রচলিত। অনেক সময় ব্রাহ্মণ সমাজে পৌরোহিত্য গ্রহণের পূর্ব প্রস্তুতির উদ্দেশ্য যে সাংস্কৃতিক ও ধর্মীয় অনুষ্ঠান পালিত হয়-তাকে উপনয়ন বলে।

৪.৪.২ বাঙালি সমাজে মৃত্যু সংক্রান্ত আচার

প্রতিটি সমাজ ও সংস্কৃতিতে মৃত্যুর পর পালিত আচার ও ধর্মীয় বিধান এবং সামাজিক রীতিতে ভিন্নতা লক্ষ করা যায়। বাঙালি সমাজেও প্রাচীন কাল থেকে বর্তমান পর্যন্ত মৃত্যুকে কেন্দ্র করে নানা আচার ও প্রথা গড়ে উঠেছে। বাঙালির এই

রীতি ও ধর্মীয় বিধানগুলো ছিল অস্ট্রিক জাতি আদিবাসী কৌম সমাজের দান। পরবর্তী কালে আর্যদের আগমনের পর এসব বিধান আচার ও রীতিসমূহ আর্যদের দ্বারা গৃহীত হয়েছে। বৈদিক যুগে শব দাহ প্রথার প্রচলন ছিল। ঋগ্বেদ ও অথর্ব বেদে শব দাহ করার উল্লেখ পাওয়া যায়। বৈদিক যুগে শ্রাদ্ধ অর্থাৎ মৃত ব্যক্তির আত্মার শান্তির জন্য পিণ্ডদান ও ব্রাহ্মণ ভোজনের রীতি ছিল। বর্তমান কালে বাংলার সমাজে আজও এই রীতি বজায় আছে। প্রাক্-মধ্যযুগ হিন্দুধর্মের বিভিন্ন শাস্ত্রীয় বিধানের প্রভাব বৃদ্ধি পায়। মনুসংহিতা ও অন্যান্য ধর্মশাস্ত্রগুলোতে মৃতজনের দেহ সংস্কারের পর তার পরিবারকে নির্দিষ্ট সময় ধরে অশৌচ (অশুদ্ধতা) পালন করার বিধান রয়েছে। এই সময়ে বৌদ্ধধর্মেও মৃত্যুকে কেন্দ্র করে নানা আচার-পালন করার রীতি প্রচলিত ছিল। বৌদ্ধরাও দাহক্রিয়া অনুসরণ করত, অন্যান্য কোনো সম্প্রদায়ের মধ্যে কবর বা দাফন প্রথার প্রচলন রয়েছে। বাঙালি সমাজে মৃতজনের শ্রাদ্ধানুষ্ঠান, পিতৃ পুরুষের তর্পণ প্রভৃতি ধর্মানুষ্ঠানের সঙ্গে জড়িত বিভিন্ন আচার-ব্যবহারের পেছনে ছিল প্রাক্ আর্য কৌম সমাজের বিশ্বাস। শ্রাদ্ধের সঙ্গে জড়িত বৃষকাঠ ও তার বিসর্জন দেওয়ার সংস্কার, রান্নার পর কাক ডেকে হবিষ্যান্ন খাওয়ানো, পিণ্ডদান সমস্ত কিছুই বিভিন্ন আদিবাসী গোষ্ঠী থেকে বাঙালি সমাজে মৃত্যুকে কেন্দ্র করে পালিত আচার সময়ের সঙ্গে বিবর্তিত হয়েছে। প্রাচীন যুগে ধর্মীয় শাস্ত্র অনুসারে কঠোর বিধিপালন করা হত, মধ্যযুগে বিভিন্ন আঞ্চলিক প্রভাবের সংমিশ্রণে বৈচিত্র্য দেখা দেয়। আধুনিক যুগে নগরায়ন ও বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গির ফলে আচারাদি সংকুচিত হয়েছে। তবে আত্মার শান্তি কামনা, সামাজিক বন্ধনের প্রকাশ এবং ধর্মীয় বিশ্বাসের প্রতিফলন এখনকার সমাজেও মৃত্যুকে কেন্দ্র করে বিভিন্ন আচার-অনুষ্ঠানের মধ্যে পালিত হচ্ছে।

৪.৪.৩ বিবাহ সংক্রান্ত আচার-অনুষ্ঠান

বাঙালি জীবনে বিবাহ একটি প্রাচীন ও পবিত্র অনুষ্ঠান। বলা যায় প্রাচীন আদিবাসী কৌম সমাজে বিবাহনুষ্ঠান ছিল অন্যতম বড় উৎসব। সভ্যতার বিবর্তনের সঙ্গে এর রীতিনীতি অনেক পরিবর্তন সাধিত হয়। প্রাচীন আর্য ও অনার্য সংস্কৃতির মেলবন্ধনে বাঙালি বিবাহের ভিত্তি স্থাপিত হয়েছে। প্রাক্-আর্য সমাজের বিবাহের রীতি-নীতির সরাসরি তথ্য সীমিত হলেও আর্যদের আগমনের পূর্বে বাংলার সমাজে মাতৃতান্ত্রিক ও লৌকিক প্রথার প্রচলন ছিল বলে ধারণা করা হয়। এই সমাজে নারীর মর্যাদা ও স্বাধীনতা ছিল এবং বিবাহের ক্ষেত্রে নারী পুরুষের সমান আধিকার বিদ্যমান ছিল। আর্য আগমনের পর পিতৃতান্ত্রিক বর্ণাশ্রম ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত হয়, যা বিবাহ প্রথায় গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন নিয়ে আসে। হিন্দুশাস্ত্র বিশেষ করে 'মনুস্মৃতি' ও 'অর্থশাস্ত্র'-এ আট প্রকারের বিবাহের উল্লেখ পাওয়া যায়— ব্রাহ্ম, দৈব, আর্য, প্রজাপত্য, আসুর, গান্ধর্ব, রাক্ষস ও পৈশাচ। এই বিবাহ প্রথার মধ্যে প্রথম চারটি প্রথা সামাজিকভাবে গ্রহণযোগ্য ও প্রশংসনীয় বলে বিবেচিত হত, যেখানে কন্যাদান, বিভিন্ন শাস্ত্রীয় এবং ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠান

যেমন কুশাণ্ডিকা, লাজ হোম, সপ্তপদীগমন, পাণিগ্রহণ, ধৃতহোম ও চতুর্থী হোম বিবাহের অঙ্গ হিসাবে প্রধান ভুমিকা পালন করত। অন্যদিকে আসুর, গান্ধর্ব, রাক্ষস, পৈশাচ বিবাহ প্রথাগুলি নিন্দনীয় ও সমাজে গ্রহণযোগ্য ছিল না কারণ এগুলো পাণি প্রার্থনা, অপহরণ বা প্রতারণার মাধ্যমে সম্পন্ন হত।

৪.৫ পোশাক পরিচ্ছদ

আমাদের ব্যবহারিক ও সাংস্কৃতিক জীবনের এক অপরিহার্য অঙ্গ হচ্ছে বস্ত্র ও পোশাক-পরিচ্ছদ। মানুষের মৌলিক চাহিদার একটি অন্যতম উপাদান। বস্ত্র বা পোশাক শুধু লজ্জা নিবারণের জন্যই নয়, বস্ত্র মানুষের পরিচিতি সংস্কৃতি ও সামাজিক অবস্থান নির্ধারণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। মানব সভ্যতার সূচনালগ্ন থেকেই মানুষ পোশাক ব্যবহার করে আসছে, যা জলবায়ু, অর্থনীতি, সমাজ ব্যবস্থা ও সংস্কৃতির সঙ্গে গভীরভাবে সম্পর্কিত। পোশাক পরিচ্ছেদের প্রাথমিক প্রয়োজন হচ্ছে শরীরকে আবৃত রাখা, যা প্রতিকূল আবহাওয়া ও পরিবেশগত বিপদ থেকে রক্ষা করে। কিন্তু এর সঙ্গে সামাজিক ও সাংস্কৃতিক মাত্রাযুক্ত হওয়ার ফলে পোশাক মানুষের রুচি, আভিজাত্য ও ধর্মীয় পরিচয়, শ্রেণি বৈষম্য ও রাজনৈতিক মতাদর্শ প্রকাশের মাধ্যম হয়ে উঠেছে। বাঙালি পোশাক পরিচ্ছেদ ইতিহাস সমৃদ্ধ ও বৈচিত্র্যময়, যা সময়ের সঙ্গে সঙ্গে পরিবর্তিত হয়েছে। আদিম কালে পূর্ব, পশ্চিম ও দক্ষিণ ভারতে সেলাই করা বস্ত্র পরিধানের রীতি ছিলনা। সেলাই বিহীন এক বস্ত্র পরা ছিল প্রধান রীতি। সেলাই করা জামা মধ্য ও উত্তর ভারতের বিভিন্ন অঞ্চল থেকে পরবর্তী কালে আমদানি করা হয়ে ছিল। ধুতি ও শাড়ি ছিল বাঙালি পুরুষ-নারীর সাধারণ পরিধেয়। সম্পন্ন লোকেদের ভিতর উত্তরবাস রূপে তার এক খণ্ড সেলাই বিহীন ব্যবহার ছিল; পুরুষদের ক্ষেত্রে উত্তরীয় এবং নারীদের ক্ষেত্রে ওড়নার ব্যবহার ছিল। দরিদ্র ও সাধারণ গৃহস্থ নারীরা একবস্ত্র পরিধান করত, সেই বস্ত্রের আঁচলকে অবগুণ্ঠন বা ঘোমটা হিসেবে ব্যবহার করার রীতি নারী সমাজে প্রচলিত ছিল। পুরুষদের ধুতি পরিধান করার ক্ষেত্রে পুরুষেরা হাঁটুর উপর পর্যন্ত কাপড়ে প্রস্থ রেখে ধুতি পরিধান করতেন, তখনকার ধুতির দৈর্ঘ্য এবং প্রস্থ অনেকাংশে ছোট ছিল। ধুতির মাঝখানের অংশটি কোমরে জড়িয়ে দুইপ্রান্ত টেনে পিছনের দিকে কাছা করত আবার কেউ কেউ ধুতির একটি প্রান্ত ভাঁজ করে সম্মুখে কোঁচার মত ঝুলিয়ে দিত। গাছের বাকল থেকে বস্ত্র এবং কার্পাস তুলা থেকে উৎপন্ন সূক্ষ্ম বস্ত্রের প্রচলন ছিল। বস্ত্রের সঙ্গে ভারতবর্ষের পরিচিতি ঘটেছিল খ্রিস্টীয় সপ্তম-অষ্টম শতক থেকে। সিন্ধু, গুজরাট বস্ত্র ব্যবসায়ের প্রধান কেন্দ্র পরবর্তীতে সর্বত্র তা ছড়িয়ে পড়ে। সমসাময়িক পাণ্ডুলিপি চিত্র থেকে বোঝা যায় যে, পুরুষ ও নারীরা যে শাড়ি এবং ধুতি ব্যবহার করত, সেগুলোতে নানা রকমের লতাপাতা, ফল, জ্যামিতিক নকশা আঁকা থাকত। চাণক্যের 'অর্থশস্ত্র' থেকে জানা যায় খ্রিস্টপূর্ব তৃতীয় চতুর্থ বঙ্গাব্দের দিকে বঙ্গ ও মগধে রেশমের চাষ হত যা থেকে রেশমি কাপর তৈরি হত। সভা সমিতি এবং বিশেষ দিন উপলক্ষে বিশেষ বিশেষ পোশাক পরিচ্ছেদের প্রচলন ছিল। নর্তকী নারীরা পায়ের পাতা পর্যন্ত বিলম্বিত আঁটসাঁট পাজামা পরিধান করত। সৈনিক ও মল্লবীরেরা উরু পর্যন্ত খাটো পাজামা পরিধান করত, সাধারণ মজুরদের এই ধরনের পোশাক ব্যবহারের

কথা উল্লেখ আছে। সন্ন্যাসীরা তথা তপস্বীরা এবং একান্ত দরিদ্র সমাজের শ্রমিক একখণ্ড কাপড় পরতেন, যাকে নাংতি বা ল্যাঙট বলা হত। শিশুদের পরিধেয় ছিল হাঁটু পর্যন্ত ধুতি বা আঁটসাঁট পাজামা, কণ্ঠে একটি পাটা বা পদক সম্বলিত সূত্রহাড় ঝুলানো থাকত। পাদুকার ব্যবহারের রীতি প্রাচীন বাঙালি সমাজে শুধু যৌদ্ধা এবং সম্পন্ন ব্যক্তিদের মধ্যে প্রচলিত ছিল। প্রহরী ও দারোয়ানেরা চর্ম দ্বারা নির্মিত পাদুকা ও সম্পন্ন ব্যক্তিরা কাষ্ঠ পাদুকা ব্যবহার করতেন। বাঁশের লাঠি ও ছাতার ব্যবহারও তৎকালীন সমাজে প্রচলিত ছিল। সমসাময়িক সাহিত্যে এর উল্লেখ পাওয়া যায়।

সধবা নারীরা প্রসাধন হিসেবে কপালে কাজলের টিপ ও সীমান্ত সিঁদুর পরতেন। তাছাড়া পায়ে আলতা ও ঠোঁটে সিঁদুর ও খোঁপায় ফুলের মালা ব্যবহার ছিল তৎকালীন বাঙালি নারীর বিলাস ও প্রসাধনের অন্যতম অঙ্গ।

অলঙ্কার ব্যবহারের ক্ষেত্রে প্রাচীন বাঙালি সমাজে পার্থক্য পরিলক্ষিত হয়। রাজ পরিবার কিংবা সম্পন্ন গৃহের নারীরা বহুমূল্য রত্ন সোনা বা রূপার কণ্ঠহার, কর্নান্দুনিয়, সুবর্নবলয়,মালা, পায়ের মল, নাকের নথ পরিধানের কথা সমসাময়িক সাহিত্যে উল্লেখ রয়েছে। বাঙালি সধবা মেয়েরা মাথায় সিঁদুর, হাতে নোয়া ও শাঁখা পরত। অতি প্রাচীন লোকায়ত সমাজ থেকে এগুলি যুগ পরম্পরায় চলে আসছে। অলঙ্কার বিলাস ছিল সাধারণ মধ্যবিত্ত ও দরিদ্র গৃহস্থের নাগালের বাইরে। বাঙালি পুরুষেরাও কণ্ঠহার, মালা, আংটি কিংবা চুড়ি পরিধান করার উল্লেখ পাওয়া যায়।

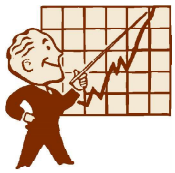
বঙ্গদেশের মুসলিম শাসনের সঙ্গে সঙ্গে সেলাই করা পোশাকের প্রচলন শুরু হয় যা এর আগে অপবিত্র বলে গণ্য করা হত। মুকুন্দ চক্রবর্তীর 'চণ্ডীমঙ্গল' কাব্যে পাগরির উল্লেখ পাওয়া যায়। ব্রিটিশ শাসনের সময় পোশাকে পশ্চিমী প্রভাব বাঙালি জীবনে পড়ে, যার ফলে বিশেষ করে অভিজাত শ্রেণির মধ্যে কোট, প্যান্টালুন বা প্যান্ট, শার্ট এর প্রচলন শুরু হয়। বাঙালির পোশাক পরিচ্ছেদের বিবর্তনে জোড়াসাঁকোর ঠাকুর পরিবারের অবদান অনস্বীকার্য। নানা রকম শাড়ির নামের উল্লেখ প্রাচীন সাহিত্যে পাওয়া যায়, যেমন — মেঘ-উদুম্বর, গঙ্গাসাগর, লক্ষ্মীবিলাস, দার-বাগিনী, সিলহট্ট, গাঙ্গেরি থেকে কুচি দিয়ে বাঁদিকে আঁচল দিয়ে শাড়ি পরার সঙ্গে পেটিকোট ও ব্লাউস পরার রীতি প্রচলিত হয়েছিল, যা সেকালে 'জ্যাকেট' নামে প্রচলিত ছিল। এই নতুন স্টাইল দ্রুতই ঠাকুর বাড়ির সঙ্গে শিক্ষিত বাঙালি সমাজে জনপ্রিয় হয়ে উঠে। ঠাকুর বাড়ির নারীরা অলঙ্কার ও সাজসজ্জা থেকে বিশেষ রুচির পরিচয় পাওয়া যায়। সোনা, মুক্তা, কিংবা হীরার গহনা পরিধান করার সঙ্গে উৎসব উপলক্ষ্যে ফুলের গহনা, চন্দন ও সুগন্ধ দ্রব্যের প্রসাধন ব্যবহার করতেন। চুলে বিভিন্ন ধরনের খোঁপায় বাঁধা ও ফুলের মালা ব্যবহার করতেন। যা আজও বাঙালি নারীদের মধ্যে প্রচলিত।

৪.৬ বাঙালির ব্যবহৃত আসবাব পত্র

বাঙালির গৃহের নানান আসবাবপত্রের মধ্যে বিভিন্ন জিনিসের উল্লেখ রামচরিত, পবনদূত

প্রভৃতি কাব্যগ্রন্থে মৃতফলকের ও বিভিন্ন প্রস্তর প্রকৃতিতে পাওয়া যায়। সম্পন্ন বিত্তবান বা রাজপরিবারের লোকেরা সোনা ও রূপার তৈরি থালা-বাসন ব্যবহার করতেন। 'তবকাতড়-ই-নাসীরী' গ্রন্থে লক্ষ্মণ সেনের রাজপ্রসাদে সোনা ও রূপার ভোজন পাত্রের ব্যবহৃত হওয়া প্রসঙ্গ রয়েছে। স্বর্ণ নির্মিত বিভিন্ন আসবাবপত্রের কথা রামচরিতে পাওয়া যায়। কিন্তু গ্রামবাসী সাধারণ গৃহস্থরা কাঁসার এবং দরিদ্র লোকেরা সাধারণত মাটির ভোজন পাত্র বা পানপাত্র ব্যবহারে অভ্যস্ত ছিলেন। প্রাচীন বাংলার বিভিন্ন স্থানের ধ্বংসাবশেষ থেকে অসংখ্য মৃৎপাত্রের ভাঙা টুকরা পাওয়া গিয়েছিল। পাহাড়পুর ও ময়নামতীর মৃৎপাত্রকে এবং প্রস্তরফল থেকে প্রাপ্ত প্রকৃতিতে সাধারণ গৃহে ব্যবহৃত আসবাব পত্রের প্রমাণ পাওয়া যায়। সেখানে মাটির খেলনা, ফুলদানী, খাট, নানা আকৃতির কলস, বাটি, পান ও ভোজপাত্র, মাটির জালা, লোটা, দোয়াত, দীপাধার, ঘড়া, জলচৌকি, পুস্তকাধার প্রভৃতি ছবি বর্তমান।

বাঙালির বসবাসের ধরণ, জীবনধারা ও সংস্কৃতির সঙ্গে তার আসবাবপত্র ব্যবহারের ইতিহাস গভীরভাবে জড়িত হয়ে আছে। একসময় প্রকৃতির সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে নির্মিত হত, যা আজ আধুনিক স্থাপত্য ও শিল্প ও বৈশ্বিক নকশার সংমিশ্রণে বিবর্তনে নতুন রূপ লাভ করেছে। প্রাক্ ঔপনিবেশিক বাংলায় স্থানীয় উপকরণ যেমন—বাঁশ, কাঠ, মাটি ও বেতের প্রভৃতি বাঙালি জীবনের বিশেষ সম্বল ছিল। জমিদার ও সম্ভ্রান্ত শ্রেণির মধ্যে উন্নতমানের কাঠের দ্বারা আসবাব তৈরি হত। ইউরোপীয় প্রভাবে বাঙালি জীবনে আসবাবেও পরিবর্তন দেখা যায়। এর অনেক পূর্বেই বাঙালির শাল, সেগুন কাঠ দ্বারা নির্মিত রকমারি কারুকার্য বিশেষ আসবাবে করে গৃহ সজ্জিত করার প্রচলন করেছিল। বাংলার পরিধেয়ের মধ্যে জনপ্রিয় মিহি মখমল, ঢাকার জামদানি ও ফলতোলা কাপড়, টাসাইন, শান্তিপুর, চন্দ্রকণা, চন্দনগারের ফরাসডাঙ্গা প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য স্থানের ধুতি ও শাড়ি বিশেষ ভাবে জনপ্রিয়। তাছাড়া কুমিল্লার ময়নামতী শাড়ি, মুর্শিদাবাদের রেশম ও অধুনা বিলুপ্ত বালুচরী শাড়ি গরদ, তসর, বীরভূম, বাঁকুড়া ও বিষ্ণুপুরের রেশমের চেলে, নকশাদার, বুটিদার শাড়ি। রাজশাহির মটকা; ও বীরভূমের তাঁতিপাড়ার তসর, ছাপা রেশমের শাড়ি প্রকৃতি বাংলার ও তার বাইরে জনসমাজে বিশেষ প্রসিদ্ধি লাভ করেছে।



অগ্রগতি নির্ধারক প্রশ্ন

১.বাঙালির আসবাব ব্যবহার সম্পর্কে নাতিদীর্ঘ আলোচনা করুন। (২০০ শব্দের মধ্যে)

৪.৭ বাঙালির আমোদ প্রমোদ

বাঙালির আমোদপ্রমোদ তথা বিনোদন চর্চা তার দৈনন্দিন জীবনের অবিচ্ছেদ্য অংশ। ইতিহাসের ধারাবাহিকতায় এই বিনোদন চর্চা বিভিন্ন রূপে বিকশিত হয়েছে, যা বাঙালির সমাজের মানসিক ও সাংস্কৃতিক বিকাশে বিশেষ ভূমিকা পালন করেছে। প্রাচীনকালে রাজা মহারাজাদের

এবং তাদের সামন্ত-মহাসামন্তদের আমোদের বা বিনোদনের মধ্যে প্রধান ছিল শিকার বা মৃগয়া। সমাজের অন্ত্যজ বা অন্যান্য নিম্নকোটিয় বলে পরিগণিত জাতি যেমন— ম্লেচ্ছ, শবর, পুলিন্দ, চণ্ডাল, ব্যাধ প্রভৃতি অরণ্যচারী কৌমদের প্রধান জীবিকা এবং বিহার দুইই ছিল শিকার। এই শিকারের চিত্র পাহাড়পুর ও ময়নামতীর ফলকগুলিতে কিছু কিছু দেখা যায়। নিম্নকোটির এই মানুষদের শরীরক্রিয়া বা আমোদের মধ্যে অন্যতম খেলা ছিল কুস্তি বা মল্লযুদ্ধ। নারীদের মধ্যে জলক্রীড়া এবং উদ্যানরচনা বিশেষ ভাবে প্রচলিত ছিল। প্রাচীন বাংলায় দ্যূত বা পাশা-খেলা এবং দাবা খেলার খুব বেশি প্রচলিত ছিল। পাশা খেলা ছিল বিবাহোৎসবের একটি প্রধান অঙ্গ । দাবা খেলার প্রচলন ঠিক কবে থেকে বাংলায় প্রচলিত হয়েছিল, তার ইতিহাস বিষয়ে কোনো তথ্য পাওয়া যায় না। কিন্তু বাংলা সাহিত্যের আদি নিদর্শন চর্যাগীতিতে দাবা খেলার প্রসঙ্গ উল্লেখিত আছে। অর্থাৎ দশম-একাদশ শতকের আগেই বঙ্গদেশে দাবা প্রচলন হয়েছিল বলা যায়। চর্যাপদে ঠাকুর অর্থাৎ রাজা, মন্ত্রী, গন্ধর্বর বড় চারটি গুটি খেলার দান এবং ছকের চৌষট্টি কোঠার এক ঘরের উল্লেখ রয়েছে। নিম্নকোটির নারীদের গৃহ গৃহক্রীড়ার মধ্যে কড়ির সাহায্যে নানা প্রকার খেলা যেমন— গুন্টি বা ঘুন্টিখেলা, বাঘবন্দী, ষোলঘর, দশপঁচিশ, আড়াইঘর প্রভৃতি খেলা প্রাচীনকাল থেকেই সুপ্রচলিত ছিল। সর্বনন্দের টীকা থেকে প্রমাণিত হয় যে 'অড়ঢ' বা বাজি রেখে তখনকার লোকেরা জুয়া খেলায় অভ্যস্ত ছিল। সে যুগে লোকেরা বাজি রেখে ভেড়া মুরগীর লড়াই খেলাত এবং নিজেরাও খেলত। তাছাড়া রাজ পরিবারে এবং অভিজাত শ্রেণির পুরুষদের মধ্যে হস্তী ও অশ্বক্রীড়া সুপ্রচলিত ছিল। কোনো কোনো নারীরাও অশ্বক্রীড়ায় যোগ দিতেন।

প্রাচীন বাংলায় আমোদ বা বিনোদনের মাধ্যম হিসাবে নৃত্যগীত বা বাদ্যের প্রচলন ও প্রসারের প্রমাণ প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যায়। রামচরিত, পবনদূত কিংবা নানা লিপিতে, সুক্তি কর্ণামৃতের প্রকীর্ণ শ্লোকে, চর্যাগীতি ও দোঁহাকোষের নানা জায়গায় নানা সূত্রে নৃত্যগীত তথা বাদ্যের উল্লেখ পাওয়া যায়। তার থেকে সহজেই অনুমান করা যায় যে উচ্চ এবং নিম্নকোটির উভয় শ্রেণির মানুষের মধ্য ব্যসনের সমাদর ছিল। পাহাড়পুর ও ময়নামতীর ফলকগুলিতে বা কোনো কোনো প্রস্তর চিত্রে নানা প্রকার বাদ্যযন্ত্রের উল্লেখ পাওয়া যায়, যেমন— কাঁশর, করতাল, ঢাক, বীণা, বাঁশি, মৃদঙ্গ প্রভৃতি। রামচরিতে বরেন্দ্রীর বিশেষ ধরনের মুরজ বা মৃদঙ্গ বাদ্যের কথা রয়েছে, বুদ্ধনাটক ও অন্যন্য গ্রন্থে তুম্বী বীণার উল্লেখ পাওয়া যায়। এছাড়া নৃত্য ও গীতের সাহায্যে এক ধরনের নাট্যাভিনয় প্রাচীন বাংলায় প্রচলিত ছিল।

৪.৮ বাঙালির যানবাহন

সুপ্রাচীন কাল থেকেই বাঙালির দৈনন্দিন জীবনে যাতায়াতের ক্ষেত্রে অপরিহার্য উপাদান হিসাবে বিভিন্ন প্রকারের যানবাহন ব্যবহৃত হয়ে এসেছে। এর ইতিহাস ও বিবর্তন আমাদের সামাজিক, অর্থনৈতিক এবং সংস্কৃতির সঙ্গে অঙ্গাঙ্গী ভাবে জড়িত। সুপ্রাচীন কাল থেকে কায়িক শ্রম তথা যোগাযোগের মাধ্যম হিসেবে বিশেষ কিছু সংখ্যক যানবাহনের ব্যবহার প্রচলিত ছিল।

স্থলপথের বাহন হিসেবে গরু ঘোড়া এবং হস্তী পৃষ্ঠে আরোহনের মাধ্যমে যাতায়াত মানুষের জীবনকে সহজ করে তুলেছিল। সাধারণত স্থলপথে গ্রামান্তরে বা নগরের বাইরের যাওয়ার লোকায়ত যান ছিল গো-রথ বা গরুর গাড়ি। কিন্তু মহিষের গাড়ির কথা কোথাও পাওয়া যায়নি। ঐতিহাসিকদের বিবরণ মতে চতুরশ্ববাহিত রথ রাজা-রা ব্যবহার করতেন। কিন্তু অশ্ববাহিত যান উচ্চশ্রেণির মানুষদের মধ্যে প্রচলিত ছিল। তাছাড়া যুদ্ধে গঙ্গারাষ্ট্রে সেনাবলের মধ্যে প্রধান ছিল হস্তীবল। প্রাচীন লিপিতে হস্তী সৈন্যের উল্লেখ পাওয়া যায়। পূর্ব ভারতের অন্যতম প্রধান বাহন ছিল হাতি। এ কথা বলা বাহুল্য যে রাজা, সামন্ত তথা বড় বড় ভূমধ্যাধিকারীরা হাতিতে চড়ে যাতায়াতও করত। চর্যাগীতিতে হাতির রূপকাশ্রয়ে বিভিন্ন পদ রচিত হয়েছে।

বঙ্গদেশের নদীমাতৃক ভূমি:

নদীমাতৃক বঙ্গদেশে প্রাচীন কাল থেকেই নৌ বা নৌকা যোগাযোগের মাধ্যম হিসেবে ব্যবহার করা হয়েছিল। সাধারণ লোকেরা স্থলপথে পদব্রজ এবং জলপথে উঙ্গি বা ভেলা এবং নৌকা যোগেই যাতায়াত করত। ভেলা, ডিঙ্গা-ডিঙ্গী-ডোঙ্গা প্রভৃতি শব্দগুলো হছে অস্ট্রিক ভাষা থেকে আগত। তাই আদিম অস্ট্রিকগোষ্ঠীর সময় থেকেই যে নৌ ব্যবস্থা প্রচলিত ছিল, তাতে কোনো সন্দেহের অবকাশ নেই। নৌকার ব্যবহার প্রচলিত ছিল বিভিন্ন দেশ ব্যবসা বাণিজ্যের বিনিময়ের যোগাযোগের মাধ্যম হিসেবে। তাই বঙ্গদেশে নৌবন্দর, নৌ ঘাট, নৌবাণিজ্য প্রভৃতির কথা বাণিজ্যিক প্রসঙ্গে উল্লেখিত হয়েছে। বাঙালির সঙ্গে নৌকার ঘনিষ্ঠ যোগ ছিল, তাই প্রাচীন সাহিত্যে নৌকার প্রসঙ্গ বিভিন্ন ক্ষেত্রে প্রয়োগ করা হয়েছে। চর্যাগীতিতে রূপক ছলে 'নৌকা', নৌকার হাল, গুন, কেরুয়াল, পুলিন্দা, খোল, চক্র, খুঁটি, কাছি, সেঁউতি, পাল প্রভৃতির কথা এমন সহজভাবে ব্যবহার করা হয়েছে যে তাতে মনে হয় বাঙালির সঙ্গে এই গানগুলোর গভীর যোগ ছিল। নিম্নস্তরের মানুষের জীবিকা হিসাবে পারের কাজ সমাজে প্রচলত ছিল। অনেক সময় নিম্নশ্রেণির নারীরাও এই পেশায় যুক্ত হতেন। মধ্যযুগীয় কাব্য 'অন্নদামঙ্গল' ঈশ্বরী পাটনি নারীর উল্লেখ রয়েছে। পালকি বা চতুর্দোলার ব্যবহার বঙ্গদেশে সুপ্রচলিত ছিল। তবে সম্পন্ন গৃহস্থরাই পালকির ব্যবহার করতেন। অষ্টাদশ শতকের গোড়ার দিকে ও বাঙালি সমাজে পালকির ব্যবহার প্রচলিত ছিল।

প্রাচীন বাঙালির দৈনন্দিন জীবনযাত্রায় তার ঐতিহ্য, সংস্কৃতি, সামাজিক প্রেক্ষাপট, কৃষি, বাণিজ্য ধর্মীয় বিশ্বাসও রাজনৈতিক বিশ্বাস ও রাজনৈতিক অবস্থার ওপর ভিত্তি করে গড়ে উঠেছে। প্রাচীন কালের সমাজ ব্যবস্থা থেকে শুরু করে আধুনিক নগর জীবন পর্যন্ত প্রতিটি স্তরে বাঙালির ব্যবহারিক জীবনধারার পরিবর্তন লক্ষ করা যায়। প্রাচীন বাংলার জীবনযাত্রা কৃষি নির্ভর। কৃষি ছিল প্রধান জীবিকা। এই সময়ে মানুষের বাসস্থান ছিল মাটির তৈরি ঘর এবং টুনের বা পাতার ছাউনি। খাদ্য হিসাবে ভাত, মাছ, শাকসব্জি এবং দুধ জাতীয় পণ্য জনপ্রিয় ছিল।

নিম্নকোটি মানুষের শূকরের মাংস খাদ্য হিসাবে গ্রহণ করত। পোশাক হিসেবে পুরুষেরা সাধারণত ধুতি-চাদর ও নারীরা শাড়ি পরিধান করত। তৎকালীন সমাজ ছিল সামন্ত্রতান্ত্রিক এবং ধর্মীয় রীতিনীতির প্রভাবও প্রবল ছিল। মোগল ও ব্রিটিশ শাসন কালে বাঙালির দৈনন্দিন জীবনে গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন আসে মোগল আমলে বস্ত্রশিল্প ও কৃষির ব্যাপক উন্নতি সাধন হয়। ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক শাসনে নগরায়ণ ও পুঁজিবাদী অর্থনীতি বিকাশ লাভ করে ফলে গ্রামীণ জীবনের পাশাপাশি শহরে জীবনেরও প্রসার ঘটে। পরবর্তীতে ইংরেজি শিক্ষা, আধুনিক প্রশাসনিক ব্যবস্থা, রেলপথ নির্মাণ, নারীর শিক্ষা ও বাঙালির জীবনযাত্রাকে বদলে দেয়। স্বাধীনতার পর বাঙালির দৈনন্দিন জীবনে আধুনিকতার ছোঁয়ায় প্রযুক্তির উন্নয়ন, নগরায়ণ, শিক্ষা ও কর্ম সংস্থানের পরিবর্তন সমাজে বৈপ্লবিক পরিবর্তন ঘটায়। বাসস্থান পরিবর্তে পাকা দালান বাড়ি ও পোশাকে পশ্চিমা সংস্কৃতির প্রভাব পড়ে। দৈনন্দিন জীবনে বিদ্যুৎ ও কম্পিউটার, ইন্টারনেট তথা মোবাইল ফোনের ব্যবহার আধুনিক জীবনের অপরিহার্য অঙ্গ হয়ে উঠেছে।



৪.৯ অধ্যায়টি পাঠ করে আমরা কী শিখলাম

- এই অধ্যায় থেকে আমরা বাঙালির খাদ্যসংস্কৃতির সঙ্গে সাংস্কৃতিক পরিবেশ ও কৃষিভিত্তিক জীবনের সম্পর্কে ধারণা লাভ করেছি।
- বাঙালির সামাজিক বিভিন্ন আচার অনুষ্ঠানের মাধ্যমে ধর্মীয়, আধ্যাত্মিক তথা সামাজিক অনুষঙ্গ কীভাবে ওতোপ্রোতভাবে জড়িত তার পরিচয় লাভ করেছি।
- লোকাচার ও আচারানুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে যে প্রজন্মান্তরে সংস্কৃতির ধারাবাহিকতা গতিশীল হয়ে আছে, এই অধ্যায়ে তার সম্পর্কে ধারণা করতে পেরেছি ।

৪.১০ অগ্রগতি নির্ধারক উত্তর-সংকেত

১. খাদ্যভাসের ইতিহাস .... নারকেল ও ক্ষারের তৈরি সময়ে কেক, পাউরউচি প্রচলন শুরু হয়েছিল। এইভাবে বাংলার সংস্কৃতিতে বাঙালি নানা রকমের পিঠা .... পরবর্তী উত্তরটি সাজিয়ে লিখুন (দ্রষ্টব্য ৪.৩ অংশটি)

২. বাঙালির গৃহের নানান আসবাব পত্রের মধ্যে .... মাটির খেলনা, ফুলদানী, খাট, এই আসবাব বাংলার বাইরেও বিশেষ প্রসিদ্ধি লাভ করেছে। ...এইভাবে উত্তরটি সাজিয়ে তুলুন। (দ্রষ্টব্য ৪.৫.০ অংশ)



৪.১১ অতিরিক্ত পঠন

আহমেদ, ড. ওয়াকিল (১৯৬৫ ইং); বাংলার লোক-সংস্কৃতি; ঢাকা: বাংলা একাডেমী

রায়, নীহাররঞ্জন (১৯৯৩); বাঙ্গালীর ইতিহাস (আদি পর্ব) : কলকাতা: দে'জ পাবলিশিং

সেনগুপ্ত, পল্লব (১৯৫৯ ইং); লোকসংস্কৃতির সীমানা ও স্বরূপ; কলকাতা: পুস্তক বিপণি

সরকার, সঞ্জীব ও অরুণকুমার রায় সম্পাদনা (১৯৮০ ইং); লোকায়ত সংস্কৃতি: উইলিয়াম কেরী; কলকাতা: স্টাডি আর্ড রিসার্চ সেন্টার

সুর, ড. অতুল (২০১৭); বাংলা ও বাঙালির বিবর্তন; কলকাতা: সাহিত্যলোক



৪.১২ আদর্শ প্রশ্নাবলি

(ক) খাদ্যাভাসের মধ্যে অঞ্চলভিত্তিক বৈচিত্র্য বাঙালির সাংস্কৃতিক পরিচয়ের কোন দিকটি উন্মোচিত করে? আলোচনা করুন।

(খ) বাঙালির খাদ্যাভ্যাসের পরিবর্তন ও তার সামাজিক প্রভাব বিশ্লেষণ করুন।

(গ) বাংলার গ্রামীণ সমাজে জন্ম, মৃত্যু ও বিবাহ সংক্রান্ত আচার অনুষ্ঠানের মাধ্যমে সামাজিক কাঠামো কীভাবে প্রতিফলিত হয়?

(ঘ) বাংলার বিভিন্ন যুগে নারী ও পুরুষের পোশাক পরিচ্ছেদের রূপান্তর এবং তার সামাজিক-রাজনৈতিক প্রেক্ষাপট বিশ্লেষণ করুন।

(ঙ) প্রাচীন বাংলার বিনোদনধর্মী কর্মকাণ্ডের পরিচয় দিন।

(চ) "বাংলার ঐতিহ্যবাহী যানবাহন গুলো (পালকি, নৌকা) শুধু পরিবহনের মাধ্যমে নয়, সাংস্কৃতিক প্রতীকও বটে"—তাৎপর্য ব্যাখ্যা করুন।

অধ্যায় ৫ : বাঙালির সংস্কৃতি ও শিল্পকলা

অধ্যায় বিন্যস

৫.১ জ্ঞাতব্য বিষয়
৫.২ পরিচিতি
৫.৩ বাংলার লোকায়ত শিল্প ও সংগীত
৫.৪ নৃত্য
৫.৫ মৃৎশিল্প
৫.৬ পাট শিল্প
৫.৭ বস্ত্র শিল্প
৫.৮ স্থাপত্য ও ভাস্কর্য
৫.৯ চিত্র ও চারুকলা
৫.১০ অধ্যায় সংক্ষেপ
৫.১১ অধ্যায়টি পাঠ করে আমরা কী শিখলাম
৫.১২ অতিরিক্ত পঠন
৫.১৩ অগ্রগতি নির্ধারক উত্তর-সংকেত
৫.১৪ আদর্শ প্রশ্নাবলি

৫.১ জ্ঞাতব্য বিষয়

এই অধ্যায়টি পড়ে শিক্ষার্থী—

- বাঙালির সংস্কৃতি এবং শিল্পকলা সম্পর্কে সম্যক জ্ঞান লাভ করতে পারবেন।
- বাংলার লোকায়ত শিল্প, সংগীত এবং নৃত্য সম্পর্কে জানতে পারবেন।
- বাংলার মৃৎশিল্প, পাট শিল্প এবং বস্ত্র শিল্প সম্পর্কে অবগত হবেন।
- বাংলার স্থাপত্য, ভাস্কর্য, চিত্র ও চারুকলা সম্পর্কে জ্ঞান লাভ করতে পারবেন।
- বাঙালি জাতির ঐতিহ্য, জীবনধারা ও শিল্পকলার মাধ্যমে জাতিসত্তার সচেতনতাবোধ অনুধাবন করতে পারবেন।
- লোকজ শিল্প ও সংস্কৃতির ধারার ঐতিহাসিক বিবর্তনের বিশ্লেষণ এবং বহুধর্মীয় ও বহুসাংস্কৃতিক প্রভাবের সংমিশ্রণে গঠিত বাংলার সাংস্কৃতিক পরিচয় অনুধাবন করতে পারবেন।

৫.২ পরিচিতি

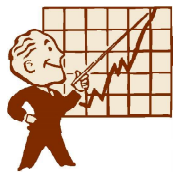
আরিস্টটল শিল্পকে বলেছেন জীবজগৎ ও জড় বস্তুর অনুকরণ। কিন্তু সাহিত্য বা শিল্প অর্থে কোন জীব বা জড়ের অনুকরণকে বোঝায় না। শিল্প বা সাহিত্য হল বাস্তব অভিজ্ঞতায় বাক্‌ময় রূপ ধ্বনি ও ভঙ্গিমার অভিব্যক্তি। তাই শিল্পে বা সাহিত্যে জীব ও জগতের বাস্তব প্রতিচ্ছবি শৈল্পিক রূপ লাভ করে। সাধারণত সাহিত্য, সঙ্গীত, চিত্র, স্থাপত্য ভাস্কর্য প্রভৃতি চারু ও কারু শিল্পকলাকে সংস্কৃতি আখ্যা দেওয়া হয়। এগুলোকে সংস্কৃতির বাহন বলা যায়। মানুষের চিন্তা ধ্যান-ধারণা অনুভূতির অভিব্যক্তি হিসেবে শিল্পকলা সংস্কৃতির অঙ্গ। কিন্তু মানুষ সৃষ্টির সূচনা লগ্ন থেকে তার ব্যবহারিক জীবন যাপনের প্রয়োজনে যা কিছু সৃষ্টি করেছে ও করছে সে সমস্তই মানব সংস্কৃতি স্বরূপ। অন্যদিকে ব্যবহারিক প্রয়োজনের বাইরে গিয়েও মানুষ সৃষ্টি করে চলেছে, মানুষ প্রতিনিয়ত তার মনোজগতে ও চিন্তাধারায় জ্ঞান বুদ্ধি, বিচার বিবেচনার প্রসারের দ্বারা কল্পনা অনুভূতি প্রকাশকে শিল্পকলার মাধ্যমে প্রতিফলিত করেছে। প্রথমটি মানুষের ব্যবহারিক জীবন ব্যবস্থার সহায়ক বস্তু বা উপকরণ এবং অপরটি হচ্ছে মানুষের মানস উপকরণ। তাই বলা যায়, সংস্কৃতির মোট তিনটি রূপ রয়েছে—জীবনসংপৃক্ত, বস্তুসংলগ্ন এবং মানসসম্ভূত। এই তিনটি রূপের উল্লেখ করে ড. সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় সংস্কৃতির তিনটি বিভাগকে ই.বি টাইলরের অনুসরণের ভিত্তিতে সমর্থন করেছেন-

১। মূর্তিমান সংস্কৃতি (Material culture)

২। সাংগঠনিক রূপ (social or institutional culture)

৩। অতীন্দ্রিয় সংস্কৃতি (spiritual culture)

মূর্তিমান সংস্কৃতি মানুষের ব্যবহারিক জীবন প্রয়াসের মধ্যেই প্রকাশ পায়। মানুষের জীবন যাত্রার যে সকল নিয়ম পদ্ধতি রয়েছে তার মধ্যে তাদের আচার ব্যবহার, রীতিনীতি, উৎসব-অনুষ্ঠান, ধর্মকর্ম, প্রাত্যহিক ক্রিয়াকলাপ, শিক্ষাদীক্ষা, খেলাধূলা, আমোদ-প্রমোদ, খাওয়া-দাওয়া প্রভৃতি রয়েছে। অন্যদিকে সাংগঠনিক রূপ হচ্ছে সমাজ ব্যবস্থার বিভিন্ন কাঠামো ও সংগঠনের মাধ্যমে গঠিত হয়, যেমন পারিবারিক প্রথা, ধর্মীয় শিক্ষা, সামাজিক রীতি, গোষ্ঠীচেতনা ইত্যাদি সংস্কৃতির সবচেয়ে সূক্ষ্ম ও গভীর স্তর, যেখানে অন্তর্নিহিত ভাবনা, দর্শন, কল্পনা ,ধর্মীয় অনুভব, নীতিবোধ, নন্দনতাত্ত্বিক চেতনা নিহিত থাকে। সাহিত্য, সংগীত, চিত্রকলা, দর্শন প্রভৃতিতে এই রূপ সর্বাধিক প্রকাশিত হয়। সংস্কৃতির এই ত্রিবিধ রূপ সমাজের বাহ্যিক রূপ নয়, এর গভীরে রয়েছে এক সুসংবদ্ধ চিন্তাজগৎ ও সমাজ চর্চা, যা যুগের পর যুগ ধরে বিকশিত হয়ে আসছে এবং একটি জাতিকে তার স্বকীয়তায় স্থিত করে তুলেছে। বাঙালি সংস্কৃতি ও শিল্পকলা এক অনুপম সৌন্দর্যের ধারা, যেখানে সময়ের রেখায় গাঁথা আছে তার ইতিহাস, ঐতিহ্য ও জীবনচর্চার এক অনন্য পরম্পরা। বাংলার সংস্কৃতি ও শিল্পকলার বৈচিত্র্যময় রূপের বিস্তৃত আলোচনা নিম্নে করা হয়েছে।



অগ্রগতি নির্ধারক প্রশ্ন

১. সংস্কৃতি বলতে কী বুঝেন নিজের ভাষায় গুছিয়ে লিখুন। (১৫০ শব্দের মধ্যে)

২. সংস্কৃতির ত্রিবিধ রূপ বিষয়ে সংক্ষেপে বুঝিয়ে লিখুন। (৮০ শব্দের মধ্যে)

৫.৩ বাংলার লোকায়ত শিল্প ও সংগীত

ভারতীয় ইতিহাসে যুগে যুগে যে মহান সংগীত স্রষ্টারা এসেছিলেন, তাঁদের সংগীত শিল্প ও শৈলী নিয়েই ভারতীয় শাস্ত্রীয় সংগীতের ইতিহাস রচিত হয়েছে। বিশিষ্ট শিল্পীরা তাঁদের পরীক্ষা-নিরীক্ষার মাধ্যমেই শাস্ত্রীয় সংগীতের ধারাটিকে উত্তরকালের শিল্পীদের কাছে প্রবাহিত করেছেন। কিন্তু লোকসংগীতের পরীক্ষা-নিরীক্ষার ক্ষেত্রে তেমন কোনো ইতিহাস রচিত হয়নি। কারণ লোকসংগীত পরীক্ষা-নিরীক্ষার বিষয় নয়। উভয়ের মধ্যে মৌলিক পার্থক্য রয়েছে। লোকসংগীতের সৃষ্টি হয়েছে জীবনের প্রয়োজনে। লোক বলতে একটি নির্দিষ্ট ভূ-খণ্ডের মানব গোষ্ঠীকে বোঝায়। সেই সমাজের সাধারণ মানুষেরাই মুখে মুখে বংশ পরম্পরায় তাদের জীবনের প্রয়োজনের সৃষ্টি করা গীতগুলোকে রক্ষা করে আসছে। লোকসংগীত মানবসমাজের সাংস্কৃতিক অভিব্যক্তির এক প্রাচীন ও মৌলিক রূপ। লোকসমাজে চিরকাল থেকে এই সাংস্কৃতিক ধারা মৌখিক ভাবে বজায় রয়েছে। যে জাতির সামাজিক জীবন যত বিচিত্র হয়, তার লোকসংগীতও বিষয়ের দিক থেকে ততই বৈচিত্র্য লাভ করে। বিষয়ের দিক থেকে ভারতবর্ষের অন্যান্য প্রদেশের তুলনায় বঙ্গদেশের একটি পার্থক্য রয়েছে। বাংলার লোকসংগীত বিষয়বস্তুর দিক দিয়ে যেমন বৈচিত্র্যময় তেমনি রসের দিক থেকেও অত্যন্ত সমৃদ্ধ। বাংলার লোকসংগীত বিষয় ও ভাবগত ভাবে বৈচিত্র্যময়। বাংলার লোকসংগীতগুলো বাঙালি সংস্কৃতি মূল স্রোতধারার অন্যতম প্রধান উপাদান। বাংলার বিভিন্ন অঞ্চলের মানুষের জীবন প্রেম, বিরহ, আনন্দ, দুঃখ, ধর্মীয় ও সামাজিক চেতনার প্রতিফলন ঘটায়। বাংলার এই গানগুলোতে মানুষের স্থানীয় সংস্কৃতি, প্রকৃতি, পেশা এবং মানুষের আবেগময় অনুভূতির সার্থক প্রকাশ ঘটেছে। বাউল, ভাটিয়ালি, ভাওয়াইয়া, জারি, সারি, মুর্শিদি, গম্ভীরা প্রভৃতি লোকগীতির বিভিন্ন ধারা বাংলার অন্যতম জাতীয় চেতনার পরিচয় বহন করে চলেছে। এছাড়াও অসংখ্য লোকগীতি রয়েছে- যা বাংলার আচার অনুষ্ঠান, কর্ম-ধর্ম ও ব্যবহারিক জীবনে সঙ্গে বিশেষভাবে জড়িত।

বাংলার লোকগীতির একটি অন্যতম প্রধান ধারা হচ্ছে বাউল গান। লোকসংগীতের জগতে বাউল গানকে 'গানের রাজা' বলা হয়েছে। নিজস্ব ধর্মীয় সাধনার প্রণালীর নাম বাউল। বঙ্গদেশের হিন্দু, বৈষ্ণব এবং মুসলমান ফকিরি মতের দেহতত্ত্ব ও সহজ সাধনার সংমিশ্রণে বাউলতত্ত্বের সৃষ্টি হয়েছে। বাউল সাধকেরা শাস্ত্র, আচার, বিগ্রহে বিশ্বাসী নয়। তাঁরা বিশ্বাস করেন মানবদেহের আড়ালে লুকিয়ে আছে এক অধরা মানুষ, তাঁদের প্রাণ ব্যাকুল হয়ে ওঠে সেই অধরা মানুষের সাক্ষাৎ লাভের জন্য। পরমার্থ সাঁইয়ের দর্শন লাভই বাউলদের শেষ গন্তব্য। দর্শনের জন্য তাঁরা

চেতনার গভীর তলশায়িত প্রাণশক্তিকে মর্মে মর্মে সাধনা করে থাকেন। পরমার্থের সাধনা করতে গিয়ে বাউলরা তাঁদের গানে মানবিকতা ও প্রেমীর আদর্শের কথা বলেছেন। বাউল সাধনার উদার ও উন্মুক্ত প্রাঙ্গনে মানুষে মানুষে কোন পার্থক্য নেই, সেখানে সকল সম্প্রদায়ের মানুষ একত্রিত হতে পেরেছে। তাই বাউল গান ধর্ম জাতি ও বর্ণের সংকীর্ণতাকে ডিঙিয়ে অখণ্ড মানবতার আদর্শ প্রচার করতে সক্ষম হয়েছে। বাউল গানের প্রধান লক্ষ্য হচ্ছে সাধন পথের ব্যাখ্যা করা। যে সাধন পদ্ধতি সামাজিক ভাবে গোপনীয়তা অবলম্বন করে চলে। তাঁদের সাধনার ভিত্তি গড়ে উঠেছে মূলত নরনারীর দেহ সম্পর্কের উপর। পরকে আপন করার সাধনা যা সামাজিক নিয়মের অধীন। তাই বাউলরা নিজেদের সামাজিক হিসেবে মৃত বলে উল্লেখ করেছেন। বাউল গানের 'জ্যান্ত-মরা' প্রসঙ্গে এই তত্ত্বকথার পরিচয় মেলে।

বাউল গান একান্ত রূপেই বাংলার নিজস্ব সংগীত। বাউল গানের প্রধান দুটি কেন্দ্র রয়েছে— বাংলাদেশের কুষ্ঠিয়া-শিলাইদহ এবং পশ্চিমবঙ্গের মুর্শিদাবাদ-বীরভূম অঞ্চল। এই দুই বঙ্গের বাউল গানকে ফকির ও মধু বাউল বলা হয়। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের অনেক গানই বাউলদের দর্শন ও সংগীত দ্বারা প্রভাবিত। কারণ এই উভয় অঞ্চলের সঙ্গে কবির নিবিড় পরিচয় গড়ে উঠেছিল। পূর্ববঙ্গে নদীমাতৃক ভাটিয়ালি ও পশ্চিমবঙ্গে দ্রুত লয়ের ঝুমুর জাতীয় সুরের প্রাধান্য বাউল গানে লক্ষ করা যায়। বাংলার বিখ্যাত বাউলরা হলেন-লালন ফকির, দদ্দুশাহ, মদন বাউল, ফিকিরচাঁদ, গগন হরকরা, হাসন রাজা প্রমুখ। বাউল গান বিচ্ছিন্ন এককপদ গীত, প্রচলিত বাংলা গানের বিষয় ও রূপরীতি থেকে বাউল গান আলাদা। বাউলরা একতারা, বায়া গোপিযন্ত্র একান্ত ভাবেই গানের সময় ব্যবহার করে থাকেন। তাছাড়া খমক, দোতারা, পঁপুর, প্রেমজুরি, জুরি, সারিন্দা, বাঁশি প্রভৃতি লোকবাদ্যও বাউল গানে ব্যবহৃত হয়ে থাকে। নৃত্য ও কথকতা বাউল গানের প্রথাগত বিষয়। গায়কের সাজসজ্জা, নৃত্য, অঙ্গভঙ্গি, স্বরক্ষেপণ, গীতরীতি, লয় বা তাল ফেরতার বৈশিষ্ট্য যে বাউল গান শুধু বাংলার নয় ,আন্তর্জাতিক মর্যাদা লাভ করেছে।

ভাটিয়ালি সঙ্গীত : ভাটিয়ালি সঙ্গীত বাংলা লোকসংগীতের এক অনন্য ধারা, যা নদীমাতৃক বাংলার সংস্কৃতির গভীরে প্রোথিত, 'ভাটিয়ালি' শব্দটি 'ভাটি' থেকে উদ্ভূত , যার অর্থ নদীর নিম্নপ্রবাহ যা ভাটির দিকে প্রবাহিত স্রোত। এই সংগীতের মূল সুর ও বাণী নদীর স্রোতের মতোই মসৃণ ও প্রবাহমান, যা মাঝি-মাল্লাদের জীবনের আনন্দ-বেদনা, প্রেম- বিরহ এবং প্রকৃতির রূপ-রসকে ধারণ করে। ভাটিয়ালি গানের উৎপত্তি বাংলার ভাটি অঞ্চলে। বিশেষ করে পূর্ববঙ্গের ঢাকা, ময়মনসিংহ, শ্রীহট্ট, ত্রিপুরা, চট্টগ্রাম, নোয়াখালী প্রভৃতি অঞ্চলের মাঝি মাল্লারা এই সংগীতের মুখ্য গায়ক। ভাটিয়ালি সংগীত শুধুমাত্র সংগীতের ধারা মাত্র নয়; এই বিশেষ অঞ্চলের মুখ্য সুর হিসেবে পরিচিত। নদীমাতৃক বাংলার ভাটির চলমান স্রোতের উপর নৌকার পালে বাতাস লাগিয়ে মাঝিরা এই গান গেয়ে নিজেদের মনের ভাব প্রকাশ করে। নদীর স্রোতের সঙ্গে জীবনের চলার সাদৃশ্য এই গানে বিশেষ রূপে প্রতিফলিত হয় , যেভাবে স্রোত সমুদ্রের দিকে চলে যায় উজানের মুখে ফিরে আসে না অনুরূপভাবে জীবনের মুহূর্তগুলো একবার অতিক্রান্ত হলে আর ফিরে আসার সম্ভাবনা থাকে না। বিস্তীর্ণ নদীর শূন্যতার বুকে নিঃসঙ্গ

মাঝিরা সাধারণত একাকীত্ব মোচনের জন্যই এই গান গায়। যে গানে মাঝির আত্মনিবেদনের আকুতি বা ফেলে আসা প্রিয়জনের কথা ভেসে ওঠে। প্রবাহমান উদার নদীর বুকে মাঝি মাথার উপর আকাশের উন্মুক্ততা দেখে ভাব বিহ্বল হয়ে পড়ে। মাঝির মনের রুদ্ধদ্বার খুলে গান রূপ ভাবের প্রকাশ ঘটায়। ভাটিয়ালি গানের বিষয়বস্তু প্রধানত নদী, মাঝি, দাঁড়, গুণ ইত্যাদিকে নিয়ে রচিত। এই গানের গায়ক, শ্রোতা এবং রচয়িতা মাঝিরা স্বয়ং নিজেই। কিন্তু কখনো কখনো এই গান প্রান্তরের চাষি ও রাখালের কণ্ঠে শোনা যায়। ভাটিয়ালি গানের প্রধানত দুটি বিষয় রয়েছে—প্রেম ও ঈশ্বর। একদিকে লৌকিক প্রেমচেতনা এবং অন্যদিকে আধ্যাত্মিক ঈশ্বর চেতনা। গ্রামীণ দৈনন্দিন বাস্তব জীবনের প্রেম-বিরহ, আকুলতা এবং আধ্যাত্মিক চেতনা এই গানে প্রকাশ পায়। উদাহরণস্বরূপ— 'মন মাঝি তোর বৈঠা নেরে, আমি আর বাইতে পারলাম না।' -এই গানটিতে ইহলৌকিক জগতের সঙ্গে পারলৌকিক জগতের মেলবন্ধন ঘটতে দেখা যায়। বাউলের 'মনের মানুষ' ভাটিয়ালিতে 'ভব নদীর নাইয়া'-তে রূপান্তরিত হয়েছে। এই গানের মধ্যে একটি সহজ সরল আবেদন রয়েছে। ভাটিয়ালি গানে কোন কৃত্রিমতা লক্ষ করা যায় না। মাঝি তাদের প্রাণের সহজ, স্বাভাবিক স্বতঃস্ফূর্ত আবেগকে সরল বাণীরূপে ও সুরের মাধ্যমে প্রকাশ করে। ভাটিয়ালি মূলত একক সংগীত । ভাটিয়ালি উদাসীন এবং দ্রুততালের সম্প্রসারিত গান, যে গানে কোন বাদ্যযন্ত্রের প্রয়োজন হয় না। কিংবা এই গান কোনো শ্রোতার প্রয়োজনে গাওয়া হয় না। এর সংগীতের বিভিন্ন ধাঁচ রয়েছে, যেমন— মুর্শিদি ও বিচ্ছেদী, যা ভিন্ন ভিন্ন আবেগ ও অনুভূতিকে প্রকাশ করে।

ভাটিয়ালি গানের সুর ও বাণী প্রাচীন বাংলার সংস্কৃতির ঐতিহ্যের ধারাবাহিকতাকে বহন করে। চর্যাপদ থেকে শুরু করে মধ্যযুগের এবং পরবর্তীতে বাউল ও বৈষ্ণব সহজিয়া ভাবধারার প্রভাব এই গানে পরিলক্ষিত হয়। বাউলদের মতে ভাটিয়ালি গান তাদের প্রকৃতিতত্ত্ব ভাগের অন্তর্ভুক্ত, যা প্রকৃতি ও জীবনের সম্পর্ককে তুলে ধরে। ভাটিয়ালি গানের সুরের মাধুর্য ও গভীরতা শ্রোতার মনে এক বিশেষ আবেগ সঞ্চার করে। নদীর স্রোতের মতোই এই গানের সুর মনকে ভাসিয়ে নিয়ে যায় দূরে অজানার পথে, যেখানে জীবনের আনন্দ- বেদনা, প্রেম- বিরহ সবকিছুই মিলেমিশে একাকার হয়ে যায়।

ভাওয়াইয়া গান : ভাওয়াইয়া গান উত্তরবঙ্গের লোকসংগীতের এক অনন্য শাখা। যা ভারতের কোচবিহার ও আসামের গোয়ালপাড়া এবং বাংলাদেশের রংপুর অঞ্চলে বিশেষভাবে প্রচলিত। এই গানের সুর ও কথায় স্থানীয় সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যময় জনজীবন, নর-নারীর প্রেম বিরহ এবং বাংলার প্রকৃতির অপার সৌন্দর্যের সার্থক প্রকাশ ঘটে। 'ভাওয়াইয়া' শব্দটির উৎপত্তি নিয়ে বিভিন্ন মতামত প্রচলিত রয়েছে। কেউ মনে করেন 'ভাব' শব্দ থেকে 'ভাও' এবং তার সঙ্গে 'ইয়া' যোগে 'ভাওয়াইয়া' শব্দটি গঠিত হয়েছে, যা মনের অনুভূতি প্রকাশকারী গানকে নির্দেশ করে। অন্যদিকে বাতাসে ভেসে আসা সুরকে 'বাও' বা 'বাতাস' থেকে 'বাওয়াইয়া' এবং পরবর্তীতে 'ভাওয়াইয়া' নামকরণ হয়েছে বলেও ধারণা করা হয়।

ভাওয়াইয়া গানকে প্রধানত দুটি শ্রেণিতে ভাগ করা হয়েছে-দীর্ঘ সুর বিশিষ্ট গান এবং

চটকা সুর বিশিষ্ট গান। দীর্ঘসুর বিশিষ্ট গানে নর-নারীর প্রেম, বিরহ এবং আবেগময় অনুভূতির প্রকাশ ঘটে। উদাহরণ স্বরূপে "ওকি গাড়িয়াল ভাই" গানটিতে একজন নারী তার প্রিয়জন গাড়িয়াল বন্ধুর প্রতি গভীর ভালোবাসার ও অপেক্ষা কথা তুলে ধরেছে। দ্বিতীয়ত, চটকা সুর বিশিষ্ট গানগুলো বিশেষত চটুল ও দ্রুত তালের গান, যেখানে হাস্যরস, স্বামী স্ত্রীর সম্পর্কে মনোমালিন্য, সংসার জীবনের বিভিন্ন দিক প্রভৃতি বিষয়বস্তু স্থান লাভ করেছে। উদাহরণ স্বরূপে "ওরে পতিধন বাড়ি ছাড়িয়া না যান" গানটিতে স্বামীর প্রতি স্ত্রীর অনুরোধ ও আবেগময় আবেদন প্রকাশ পেয়েছে। ভাওয়াইয়া গানের প্রচার ও প্রসারে অনেক শিল্পী ও গীতিকার গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছেন। তাদের মধ্যে অন্যতম শিল্পীরা হলেন—আব্বাসউদ্দিন আহমদ, যিনি ভাওয়াইয়া গানের সম্রাট রূপে পরিচিত; প্রতিমা বড়ুয়া পাণ্ডে তাঁর সুমধুর কণ্ঠে ভাওয়াইয়া গান নতুন মাত্রা পেয়েছে এবং কছিমউদ্দিন, যিনি এই ধারার গানে নতুন সুর ও ভাবের সংযোজন করেছেন। ভাওয়াইয়া গানে নারী মানসিকতা যেমন নারীর আশা-আকাঙক্ষা, প্রেম -বিরহ এবং সামাজিক অবস্থানের চিত্রণ বিশেষভাবে লক্ষ করা যায়। এই গানে নারীর আবেগ ভালবাসা, অপেক্ষা এবং বেদনার সুর মূর্ত রূপ লাভ করেছে।

জারি গান : জারি গান বাংলার লোকসংগীতের এক সমৃদ্ধশালী শাখা, যা মূলত কারবালার যুদ্ধ ও তার শোকাবহ ঘটনাকে কেন্দ্র করে উদ্ভূত হয়েছে। 'জারি' শব্দটি ফারসি ভাষা থেকে এসেছে, যার অর্থ ক্রন্দন বা বিলাপ করা। সপ্তদশ শতাব্দী থেকে এই গানের সূচনা হয়, যখন মহরম মাসে ইমাম হোসেন ও তাঁর পরিবারবর্গের করুণ পরিণতি স্মরণে মর্সিয়া ও জারি গান পরিবেশিত হত। পরবর্তীতে এই গানের বিষয়বস্তুতে বৈচিত্র্য আসে, শাহদুলালের জারি, সোহরাব-রোস্তমের জারি ইত্যাদি বিষয়ও অন্তর্ভুক্ত হয়। এছাড়া সামাজিক, রাজনৈতিক, ধর্মীয় , প্রাকৃতিক দুর্যোগ, দাঙ্গা-হাঙ্গামা, ব্যঙ্গ-রসাত্মক বিষয়, পরিবার পরিকল্পনা প্রভৃতি বিষয়ক জারি গান সাধারণত মানুষের মধ্যে জনপ্রিয় হয়ে ওঠে।

জারি গান সাধারণত দলগতভাবে পরিবেশিত হয়। দলে একজন মূল গায়ক বা বয়াতি থাকেন, যিনি দোতারা, সারিন্দা, বেহালা বা ডুগডুগি বাজিয়ে গান পরিবেশন করেন। গায়কের সঙ্গে দোহাররা সমবেত কণ্ঠে ধুয়া গান গেয়ে সুরের মেলবন্ধন তৈরি করেন। ওই গানে বাদ্যযন্ত্র হিসেবে ঢোলক, একতারা, দোতারা, সারিন্দা, বেহালা, বাঁশি, হারমোনিয়াম, কাঁসা ইত্যাদি ব্যবহৃত হয়। জারি গান পরিবেশনার সময় বয়াতি দোহাররা চারদিকে হাঁটে এবং বিভিন্ন অঙ্গভঙ্গি করে গানকে জীবন্ত করে তোলেন।

জারি গানের একটি বিশেষ আঙ্গিক হল 'জোটক', যেখানে দুই দল জারিয়াল প্রশ্নোত্তরমূলক প্রতিযোগিতার মাধ্যমে গান পরিবেশন করে। এতে নারী-পুরুষ, জীবাত্মা-পরমাত্মা, রাম-হনুমান, গুরু-শিষ্য ও শায়িয়ত- মারিফত, আদম-শয়তান, গণতন্ত্র-রাজতন্ত্র ইত্যাদি বিষয় নিয়ে প্রতিযোগিতা হয়। এই অংশটি মূলত কবিগানের অনুরূপ এবং শ্রোতাদের মধ্যে বিশেষ আকর্ষণ সৃষ্টি করে। জনপ্রিয়তা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে জারি গানের বিষয়বস্তুতে বৈচিত্র্য লক্ষ্য করা যায়। তাই জারি গান এখন কেবল ধর্মীয় অনুষ্ঠানেই সীমাবদ্ধ নয়, বরং এই গান সমাজের বিভিন্ন বিষয়কে

কেন্দ্র করে মানুষের আবেগ ও অনুভূতি প্রকাশ ঘটায়। জারি গানের নৃত্যেরও বিশেষ ভূমিকা রয়েছে। বিশেষ করে পূর্ব ময়মনসিংহ অঞ্চলে জারি নৃত্যের প্রচলন রয়েছে। গুরুসদয় দত্তের একটি প্রবন্ধে জারি নৃত্যের সচিত্র বর্ণনা পাওয়া যায়।

সারি গান : সারি গান বাংলা লোকসংগীতের এক অনন্য ধারা, যে গানে মূলত নদীকেন্দ্রিক জীবন ও বাংলা শ্রমজীবী মানুষের আবেগের বহিঃপ্রকাশ ঘটে। জারি গানের উৎপত্তি নির্দিষ্টভাবে নির্ধারণ করা কঠিন, তবে একে বাংলা নদীবাহিত সমাজের সংগীত হিসেবে চিহ্নিত করা যায়। পণ্ডিতদের মতে সারি গান মধ্যযুগ থেকে প্রচলিত থাকলেও মোগল ও ব্রিটিশ পর্বে আসলে এই গান অনেক বেশি বিস্তার লাভ করেছিল। বাংলার নদীবহুল অঞ্চল, বিশেষত পদ্মা, মেঘনা, যমুনা ও ব্রহ্মপুত্রের তীরবর্তী অঞ্চলে নৌপরিবহন ও নৌকাবাইচের সঙ্গে সম্পর্কিত এই জাতীয় গান বিকশিত হয়েছে।

সারি গান সাধারণ দলগতভাবে গাওয়া হয়, যেখানে এক বা একাধিক শিল্পী মূল সারি বা লাইন ধরে এবং দলবদ্ধ কণ্ঠে প্রতিধ্বনি ওঠে। অর্থাৎ এই গানে প্রধান একজন গায়ক যিনি গানের প্রথম পঙক্তি ধরেন এবং পরে সেটাকে কোরাস দলবদ্ধভাবে প্রতিধ্বনি করে। সারিগান সাধারণত দ্রুত লয় বা first tempo- এর গান হয়, যা নৌকা বাইচের উত্তেজনা ও শ্রমের উদ্দীপনা বহন করে।

সারি গান বিভিন্ন উদ্দেশ্যে হয়ে এসেছে, যার ফলে সবকিছু স্বতন্ত্র শাখা গড়ে উঠেছে, যেমন-প্রথমত, শ্রম সংগীতধর্মী সারি, যা মূলত মাঝিদের নৌকা বাইচ ও নদীপথের শ্রমকে কেন্দ্র করে গাওয়া হয়। দ্বিতীয়ত, বৈঠকি বা আসর সারি, যা মূল উৎস বা আমোদ-প্রমোদের জন্য গাওয়া হয়, যেখানে নৌকার মাঝিরাও অংশগ্রহণ করে। তৃতীয়ত, প্রতিযোগিতামূলক সারি, যা নৌকা বাইচের সময় দেওয়া হয়, যেখানে দলগত উদ্দীপনা বৃদ্ধির জন্য সারি গান ব্যবহৃত হয়। সারি গানে প্রকৃতি, নদী, মানুষের জীবন সংগ্রাম, প্রেম, দেশপ্রেম, ধর্মীয় ভাবধারা ইত্যাদির প্রতিফলন ঘটে। এই গান কখনো রোমান্টিক, কখনো উৎসাহমূলক আবার কখনো করুণ বেদনার কথাকে ব্যক্ত করে। সারিগান বাঙালির নদী নির্ভর জীবনের অপরিহার্য অনুষঙ্গ, যা কেবল শ্রম নয় , সংহতির উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত।

মুর্শিদ্যা গান : মুর্শিদ্যা গান বাংলার লোকসংগীতের একটি ধারা, যা আধ্যাত্মিক গুরু বা মুর্শিদের প্রতি ভক্তি ও দেহতত্ত্বমূলক ভাবধারাকে প্রকাশ করে। এই গানের মাধ্যমে মানব জীবনের গভীর দার্শনিক ও আধ্যাত্মিক বিষয়গুলি তুলে ধরা হয়। মুর্শিদ্যা গানের উৎপত্তি সম্পর্কে সুনির্দিষ্ট তথ্য পাওয়া যায় না, তবে ধারণা করা হয় যে মুর্শিদ্যা গান বাংলার অষ্টাদশ থেকে উনিশ শতকের মধ্যে বিকশিত হয়েছিল। সুফি সাধক ও বাউলদের প্রভাব এই গানের বিকাশে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে। মুর্শিদ্যা গান মূলত পশ্চিমবাংলার নদীয়া, মুর্শিদাবাদ, চব্বিশ পরগনা এবং পূর্ব বাংলার কুষ্ঠিয়া, যশোর, পাবনা, ফরিদপুর, খুলনা অঞ্চলে গাওয়া হয়।

মুর্শিদ্যা গান বাংলার সুফি ও মরমিয়াপন্থীদের প্রভাবিত লোকগীতি, যা গ্রাম বাংলার সাধু ফকির, দরবেশ এবং মুর্শিদ পন্থীদের মাধ্যমে জনপ্রিয় হয়েছে। মুর্শিদাবাদ অঞ্চলের নাম থেকে

'মুর্শিদ্যা' শব্দটি এসেছে বলে অনেক গবেষক মনে করেন। যদিও এই গান পুরো পশ্চিমবাংলা ও বাংলাদেশের বিভিন্ন অঞ্চলে ছড়িয়ে পড়েছে। 'মুর্শিদ্যা' শব্দটি মূলত আরবি ভাষার 'মুর্শিদ' শব্দ থেকে এসেছে, যার অর্থ পথ প্রদর্শক গুরু বা আধ্যাত্মিক নেতা । ইসলামি সুফি সংস্কৃতিতে 'মুর্শিদ' বলতে সেই আধ্যাত্মিক গুরুকে বোঝানো হয়, যিনি শিষ্যকে বা মুরিদকে আধ্যাত্মিক জ্ঞানের সঠিক পথ দেখান। বাংলা লোক সংগীতে মুর্শিদ্যা গান প্রধানত মুর্শিদ বা আধ্যাত্মিক গুরুর প্রশংসা, মানব জীবনের ক্ষণস্থায়িত্ব , দেহ মন সম্পর্ক এবং পরম সত্যের অনুসন্ধান নিয়ে আলোচনা করা হয়। এই গানের সহজ সরল অকৃত্রিম ভাষা ও উপমা ব্যবহারে গভীর দার্শনিক দিকগুলো উপস্থাপিত হয়, যা সহজেই সাধারণ মানুষের হৃদয়ে প্রবেশ করে। মুর্শিদ্যা গানে সাধারণত দোতারা, একতারা, খঞ্জনি, ঢোল ইত্যাদি লোকবাদ্যের ব্যবহার করা হয়। সুরের দিক থেকে এই গানগুলি মেলান কলি ও মৃদু সুরে গাওয়া হয়, যা শ্রোতার মনে গভীর আবেগের সঞ্চার করে।

গম্ভীরা গান : বাংলার ঐতিহ্যবাহী লোকসংগীতের সমৃদ্ধ ধারাগুলোর মধ্যে গম্ভীরা গান বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। এটি শুধুমাত্র বিনোদনের মাধ্যম নয়, বরং সমাজের বিভিন্ন অসঙ্গতি, সামাজিক অনাচার ও রাজনৈতিক বৈষম্যের বিরুদ্ধে এক শক্তিশালী কণ্ঠস্বর। গম্ভীরা গানের উৎপত্তি নিয়ে একাধিক মত প্রচলিত আছে। অনুমান করা হয় প্রায় দেড় হাজার বছর আগে এই গানের উদ্ভব হয়েছিল। প্রাচীনকালে অনার্য সম্প্রদায়ভুক্ত লোকেদের মধ্যে গম্ভীরা পূজকেন্দ্রিক উৎসব প্রচলিত ছিল। অনেকের ধারণা যে, শিবের আরেক নাম 'গম্ভীর' তাই শিবের বন্দনাগীতিকেই গম্ভীরা গান বলা হয়। এই প্রাথমিক রূপটি মূলত পশ্চিমবাংলার মালদহ অঞ্চলের নিম্ন বর্ণের হিন্দু, কোচ রাজবংশী, পোলিয়া সম্প্রদায়ের লোকদের মধ্যে প্রচলিত ছিল। তাছাড়া পূর্ব বাংলার চাঁপাইনবাবগঞ্জ অঞ্চলের লোকেরাও এই উৎসবে অংশগ্রহণ করতেন।

গম্ভীরা গান সাধারণত দলবদ্ধ ভাবে গাওয়া হয় এবং এটি বর্ণনামূলক গান। যা বাদ্যযন্ত্র সহকারে পরিবেশিত হয়। মালদহ অঞ্চলে গম্ভীরার মুখোশ পরে গানের তালে নৃত্য পরিবেশন করা হয়। বাংলাদেশের চাঁপাইনবাবগঞ্জে গম্ভীরা আর তার মুখ্য চরিত্র নানা ও নাতি খুব জনপ্রিয়। নানা বা ঠাকুরদা ও নাতি নামক দুটি চরিত্রের সংলাপধর্মী কথোপকথনের মাধ্যমে গম্ভীরা পরিবেশিত হয়। নানা চরিত্রটি সমাজের একজন অভিজ্ঞ ও বাস্তববাদী ব্যক্তি, যিনি জীবন ও সমাজ সম্পর্কে গভীর জ্ঞান রাখেন, অন্যদিকে নাতি হল কৌতূহলী, অল্পশিক্ষিত ও তুলনামূলকভাবে উদাসীন যুবক, যে তার নানার কাছে শিক্ষা নেয়, তাদের সংলাপের মধ্য দিয়ে সমাজের ত্রুটি - বিচ্যুতিগুলো ফুটে ওঠে। এক সময় গম্ভীরা শুধুমাত্র ধর্মীয় অনুষ্ঠানের অঙ্গ ছিল কিন্তু সময়ের সঙ্গে সঙ্গে গম্ভীরা গানে সামাজিক ও রাজনৈতিক বৈষম্যের দিকগুলো ব্যঙ্গাত্মক ভঙ্গিতে পরিবেশিত হয়েছে।

বাংলার শিব বা অন্যান্য দেবদেবী পূজা সংক্রান্ত লোকগান প্রাক্ বৈদিক যুগ থেকে বাংলার বিভিন্ন অঞ্চলে পৌরাণিক শিব লৌকিক শিব রূপে পূজিত হয়ে আসছেন। শিব ঠাকুরকে কেন্দ্র করে বাংলার বিভিন্ন অঞ্চলে ভিন্ন ভিন্ন উৎসব প্রচলিত আছে। তেমনি একটি উৎসব হচ্ছে

গাজন। গাজন উৎসবে শিব হচ্ছেন প্রধান উপাস্য দেবতা। গাজন নানাভাবে বিভক্ত যেমন— চড়ক গাজন, নীল গাজন, ধর্ম গজন, বোলান গাজন, গম্ভীরা গাজন প্রভৃতি। গাজনের ক্রিয়াকর্মের সঙ্গে যে লৌকিক ভাষায় মন্ত্র উচ্চারিত হয় তা গানের আকারেই ব্যবহৃত হয়। তাই গাজন উৎসবে গান বা সংগীত একটি অপরিহার্য অঙ্গ। গাজন উৎসবে যে সকল গান প্রচলিত আছে তার মধ্যে নীলের গান, বোলান গান, অষ্টক গান, বান্দুটি গান, ত্রিনাথের গান ইত্যাদি। পশ্চিমবঙ্গে হুগলি জেলার পান্না গ্রাম, মেদিনীপুর জেলার কেন্দুয়ার গাজন, হাওড়া জেলার দক্ষিণ চব্বিশ পরগনার বিভিন্ন গ্রামে গাজন উৎসবে প্রধান অঙ্গ রূপে গানের প্রচলন রয়েছে।

শিবের অপর নাম নীল। হর-পার্বতীর বিবাহকে কেন্দ্র করে গাজন উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। সন্ন্যাসীরা ত্রিশূল হাতে বাঘছাল পরা অবস্থায় নৃত্য করেন, নৃত্য শেষে নীলের গান শুরু হয়। গানের বিষয়বস্তুতে থাকে শিবের পারিবারিক জীবনের ঘটনা সম্পৃক্ত খণ্ড গীতি।

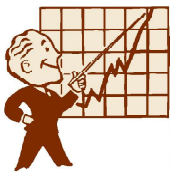
'বোলান' শব্দের অর্থ আবৃত্তি। লোকসংগীতের মধ্যে বোলান তার একটি স্থান করে নিয়েছে। বর্ধমান জেলার কাটোয়া, মুর্শিদাবাদ জেলার কান্দি এবং বীরভূম ও নদীয়া জেলার কোনো কোনো অঞ্চলে এ গানের প্রচলন দেখা যায়। চৈত্র মাসের গাজন উৎসবের আঙ্গিকেই বোলান উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। অর্থাৎ শিবকে উপলক্ষ করে বোলান গান অনুষ্ঠিত হয়। শিব ভক্তরা নৃত্য সহকারে বোলান পরিবেশন করেন। বোলান গান দলবদ্ধভাবে পরিবেশিত হয় এবং গানের তালে তালে মৃদঙ্গ বাজানো হয়। একজন মূল গায়ক গান গায় এবং অন্যরা নৃত্যরত অবস্থায় গান গায়। গানের বিষয়বস্তুতে শিব ছাড়াও রাধা-কৃষ্ণ, রাম-সীতা স্থান পেয়েছে। কোনো কোনো অঞ্চলে শিবভক্তরা শিবকে নিয়ে নৃত্যগীত সহ গ্রাম পরিক্রমা করেন।

নীল গাজনে অষ্টক গানের প্রচলন আছে। রাধা কৃষ্ণ গোষ্ঠলীলা, নিমাই সন্ন্যাস প্রভৃতি বিষয়গুলো অষ্টক গানের অন্তর্ভুক্ত। এ গানের কথা, সুর ও গায়ন রীতি ভিন্ন হয়। এছাড়া নীলগাজনে বান্দুটি বা বান্দুটিয়া গানের প্রচলন আছে সমবেত কণ্ঠে ধীর লয়েই এ গান গাওয়া রীতি প্রচলিত। বাংলার শ্রীহট্ট জেলার বিভিন্ন অঞ্চলে ত্রিনাথের গানের প্রচলন দেখা যায়। তিন নাথ অর্থাৎ ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বরকে কেন্দ্র করে পুরুষ ব্রতীরা সন্ধ্যায় ত্রিনাথের গান ধরেন। বাংলা প্রচলিত লোকসংগীতের তালিকা অন্তর্ভুক্ত না হলেও বাংলার কিছু কিছু কর্মানুষ্ঠানের সঙ্গে জড়িত গান রয়েছে, যা বাংলা লোকসংগীতকে বৈচিত্র্যময় করে তুলেছে। যেমন— ঝুমুর গান,ছাদ পেটানোর গান, বাটরি গান বা উড়িই গান।

ঝুমুর গান : ঝুমুর গান বাংলা লোকসংগীতের এক অনন্য ধারা, যা পশ্চিমবঙ্গ ও ঝাড়খণ্ড ওড়িশার বিস্তীর্ণ অঞ্চলে প্রচলিত। এই গানের সুর ও ছন্দে মিশে আছে বাংলার ও বাইরের স্থানীয় সংস্কৃতি, সমাজের সুখ-দুঃখ, প্রেম বিরহের কাহিনি। ঝুমুর গানের উৎপত্তি সম্পর্কে সুনির্দিষ্ট তথ্য পাওয়া যায় না। তবে পণ্ডিতেরা ধারণা করেছেন যে, এই প্রায় হাজার বছরের বেশি পুরোনো, কারণ মধ্যযুগীয় কবি বড়ু চণ্ডীদাসের 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন' কাব্যে ঝুমুর গানের প্রভাব লক্ষ করা যায়। বিদ্যাপতির পদাবলি এবং গোবিন্দ দাসের রচনায়ও ঝুমুরের উল্লেখ পাওয়া যায়, যা এই গানের প্রাচীনত্বের প্রমাণ বহন করে। কেউ কেউ অনুমান করেছেন যে নরনারীর

মিলনমূলক রাগিনী 'ঝুমুরি' থেকে ঝুমুরের উৎপত্তি, আবার কেউ বলেছেন, প্রাচীন 'ঝোম্বড়াই' এখন রূপে ঝুমুর পরিচিতি লাভ করেছে। ঝুমুর গানের মূল বিষয়বস্তু রাধাকৃষ্ণ। সীমান্ত বাংলার গানে বৈষ্ণব গানের প্রভাব পড়েছে। ঝুমুর গান প্রধানত পশ্চিমবঙ্গের পুরুলিয়া, বাঁকুড়া, বীরভূম, পূর্ব ও পশ্চিম মেদিনীপুর, ঝাড়খণ্ডের সাঁওতাল পরগনা, সিংভূম , রাচি, হাজারিবাগ, পালামৌ ,গিরিডি, ধানবাদ ও বোকারো; এবং ওড়িশার ময়ূরভঞ্জ, সুন্দরগড় ও সম্বলপুর জেলায় প্রচলিত আছে। ঝুমুর গান সাধারণত নৃত্য গীত ও বাদ্য সহযোগে পরিবেশিত হয়, তবে এতে গানের প্রাধান্য বেশি থাকে। এর গায়নরীতি অবরোহন করে উচ্চগ্রাম থেকে নিম্নগ্রামে। তালকে অগ্রাহ্য করে মাত্রা অনুসরণ করে সুর দেওয়া হয় এবং খালি থেকে গান শুরু করা হয় — যা ঝুমুর গানের একটি অন্যতম বৈশিষ্ট্য। ঝুমুর গানের পরিবেশনা দুভাবে হয়— সমঝদারের আসর ও নাচের আসর। সমঝদারের আসরে বৈঠকী, ছুট ও পালাবদ্ধ ঝুমুর গাওয়া হয়। বৈঠকী ঝুমুরে গায়ক একাই গান পরিবেশন করেন, যেখানে নাচ থাকে না এবং বাদ্য যন্ত্র হিসেবে হারমোনিয়াম ও পাখোয়াজ ব্যবহৃত হয়। ছুট ঝুমুরে নাচ গান ও বাদ্যযন্ত্রের সমন্বয়ে পূর্ণাঙ্গ পরিবেশনা হয়। বাদ্যযন্ত্র হিসেবে বাজানো হয় মাদল ও ধামসা। পালা ঝুমুর একটি নির্দিষ্ট বিষয়কে কেন্দ্র করে গাওয়া হয়। ঝুমুর গান ও নাচ মূলত প্রান্তিক ও নিম্নবর্গের মানুষের মধ্যে প্রচলিত ছিল। কুর্মি, মাহাতো, কুমোর, বাজওয়ার, ঘাটাল, হাঁড়ি, মুচি প্রভৃতি সম্প্রদায়ের লোকেরা এই গানের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন।

বাংলার শ্রমজীবী মানুষের কর্মানুষ্ঠানের এক অন্যতম অংশ হচ্ছে বাংলা কর্মসংগীতগুলো। কৃষক, মাঝি, তাঁতি ,শ্রমিক ,কামার ও কুমার প্রভৃতি বিভিন্ন পেশাজীবী শ্রেণির মানুষেরা কাজের সময় নিজেদের উদ্দীপিত রাখতে যে গান গেয়ে থাকেন । এই গানগুলো সমষ্টিগতভাবে গাওয়া হয়। এই গানগুলো শ্রমজীবী মানুষের একতা ও সংহতির প্রতীক। বাংলার কর্ম সংগীতের মধ্যে রয়েছে — কৃষি সংগীত , বাউরি সংগীত, ছাদ পেটানোর গান, তাঁতির গান, নৌকা বাইচের গান, কামার-কুমারদের গান ইত্যাদি বর্তমান যন্ত্রচালিত যুগে এই কর্মসংগীতগুলো প্রায় হারিয়ে যেতে বসেছে। কিন্তু এই গানগুলো বাংলার সংস্কৃতির অমূল্য সম্পদ। যেমন— মাঠের ও বাটের গান, ধান কাটার গান, পটের গান, পাটকাটার গান, পালকী বাওয়ার গান, চিড়াকোটার গান, ধান ভানার গান, মাছ ধরার গান প্রভৃতি। এছাড়া বাংলার লোকসংগীতের মধ্যে মেয়েলি ব্রতানুষ্ঠানের সঙ্গে জড়িত বিভিন্ন গান বাঙালি সমাজে প্রচলিত আছে আজও। তার মধ্যে অন্যতম হচ্ছে টুসু গান, ভাদু গান, আলকাপ গান, লঘু রঙ্গ রসিকতার গান । এছাড়াও বিয়ের গান, পুতুল খেলার গান, হাত পুতুল নাচের গান, মঙ্গল গান, রামায়ণ পাঁচালী গান, কবিগান, ধামাইল, মৈমনসিংহ গীতিকা, নাথ গীতিকা, প্রাচীন পূর্ববঙ্গ গীতিকা, রংপুর গীতিকা, প্রভাতী, আগমনী-বিজয়া উল্লেখযোগ্য।



অগ্রগতি নির্ধারক প্রশ্ন

৩. বাংলা লোকসঙ্গীতের প্রধান প্রধান ধারাগুলোর নাম লিখুন (১০০ শব্দের মধ্যে)

৪. ভাওয়াইয়া ও ভাটিয়ালি গান বিষয়ে সংক্ষিপ্ত প্রতিবেদন লিখুন (২০০ শব্দের মধ্যে)

৫.৪ নৃত্য

বাংলার লোকনৃত্য নৃত্যশৈলী হচ্ছে মানব সংস্কৃতির একটি প্রাচীনতম শিল্প ধারা, যা মানুষের জীবনযাত্রার সঙ্গে ওতোপ্রতোভাবে জড়িত। লোকনৃত্যের উৎপত্তি একেবারে আদিম সমাজে হয়েছিল, যখন মানুষ ভাষার বিকাশের আগে হাত-পা নেড়ে বা বিভিন্ন অঙ্গভঙ্গির মাধ্যমে অনুভূতি প্রকাশ করত। এই নৃত্যের মূল উদ্দেশ্য ছিল: প্রথমত, প্রাকৃতিক শক্তিকে সন্তুষ্ট করা অর্থাৎ প্রাচীন সমাজে বৃষ্টি যা জল শিকার ও যুদ্ধের সাফল্য ইত্যাদি নিশ্চিত করার জন্য নৃত্যের আয়োজন করা হত। গবেষকদের ধারণা যে শিকারের পশুর নকল করা, অস্ত্র চালনার কৌশল অনুশীলন থেকে নৃত্যের সূচনা হয়েছিল। অনেক সমাজের নৃত্য ছিল প্রেমের প্রতীক, যেখানে পুরুষ ও নারীরা একসঙ্গে নাচের মাধ্যমে পারস্পরিক আকর্ষণ প্রকাশ করত। বাংলার লোকনৃত্যের প্রসার ঘটে মূলত ধর্মীয় ও সামাজিক আচরণ অনুষ্ঠানের মাধ্যমে। বাঙালি বহু শতাব্দী ধরে কৃষিজীবী সমাজ তাদের দৈনন্দিন জীবনের আনন্দ বেদনা, ঋতু পরিবর্তন, ফসল তোলার উৎসব, শিকার বা যুদ্ধের প্রস্তুতি, দেব দেবীর পূজা ইত্যাদির সঙ্গে নৃত্যকে যুক্ত করে এসেছে।

বাংলা লোকনৃত্যের স্বতঃস্ফূর্ততা ও সারল্য তার অন্যতম প্রধান বৈশিষ্ট্য। বাংলা লোকনৃত্যের মধ্যে দুটি উদ্দেশ্য পরিলক্ষিত হয়। প্রথমত, সকলের সঙ্গে একত্রে চিত্ত বিনোদন এবং দ্বিতীয়ত, নৃত্যের মাধ্যমে চেতনা জাগ্রতকারী কাহিনি ব্যক্ত করা। আবার আঙ্গিকে বিনিয়োগের তারতম্যে দিক থেকে বাংলা লোক নৃত্যগুলো দুটো ভাগে ভাগ করা যায়। যেমন— স্বতঃস্ফূর্ত সহজ, সাবলীল দ্বৈত বা সমবেত গোষ্ঠী বা সারি নৃত্য এবং অন্যটি হচ্ছে জটিল তাল নয় ছন্দে, পাদ ভেদে বা হস্তকর্মে পুষ্ঠ নৃত্যাদি। তবে ভৌগোলিক পরিবেশ রীতি-নীতি, আঞ্চলিক ভাষা, রুচি ও রসভেদে এবং আঙ্গিক প্রয়োগ কৌশলের বিভিন্ন পার্থক্যের জন্য বাংলা লোকনৃত্যের অনেকগুলো ভাগে ভাগ করা হয়েছে, যেমন—

(ক) ধর্মীয় আচার অনুষ্ঠানমূলক নৃত্য— যেসব নৃত্য বছরের বিশেষ তিথিতে অনুষ্ঠিত হয়। যেমন-কীর্তন, মদনকাম ত্রিনাথ ইত্যাদি।

(খ) সামাজিক উৎসবের অনুষ্ঠিত নাচ বা প্রমোদ নৃত্য যেমন— ঘাটু নাচ, খেমটা নাচ, লেটো নাচ, ঝুমুর নাচ, ঘোড়া নাচ, বাঘ নাচ ইত্যাদি।

(গ) বাংলার আচার সংক্রান্ত নৃত্য যেগুলোকে কয়েকটি ভাগে ভাগ করা যায়। যেমন— (১) গাজন, হরগৌরী নাচ, কালী নাচ, গম্ভীরা, দশাবতার নাচ। (২) মেয়েলি ব্রতানুষ্ঠানের সঙ্গে জড়িত নাচ, যেমন— সূর্যব্রত ,মাঘমণ্ডলের ব্রত, ভাদু, করম জাওয়া প্রভৃতি। (৩) বিবিধ আচার

সংক্রান্ত নাচ যেমন— রাবণ কাটা,ওঝা, গোপিনী ,আরতি, জারি নাচ, বউ নাচ প্রভৃতি।

(ঘ) যুদ্ধ সংক্রান্ত নৃত্য — শক্তি চর্চা ও অঙ্গ চলনার কৌশলযুদ্ধ রণ নৃত্যের অঙ্গীভূত নৃত্য যেমন— রায়বেঁশে, ঢালি, কাঠি, রণপা ,পাইক, লাঠি নাচ ইত্যাদি। (ঙ) লোকনৃত্যে নৃত্য— মধ্যযুগের কৃষ্ণলীলা কুশান পালা ,মনসা যাত্রা, আলকাপ ,ভাসান যাত্রা, বিষহরা, রামায়ণ - মহাভারতের নৃত্য ইত্যাদি।

বাংলার লোকনৃত্য বিষয় ও আঙ্গিকের দিক থেকে সমৃদ্ধ ও বৈচিত্র্যময়। বাংলা প্রচলিত লোক নৃত্যগুলোর সামান্য পরিচয় নিম্নে আলোচিত হয়েছে। বাংলার প্রচলিত ধর্মীয় লোকনৃত্যের মধ্যে জারি নাচ, ফকির নাচ, চেলা নাচ, কীর্তন নাচ, গম্ভীরা নাচ ও বাউল নাচ অন্যতম।

বাংলা মুসলমান ধর্মাবলম্বী সমাজের সবচেয়ে প্রসিদ্ধ ও ব্যাপক প্রচলিত নাচ হল জারি নাচ। মহররম উপলক্ষে জারি নাচ অনুষ্ঠিত হয়। শিয়া সম্প্রদায়ের লোকেরা মহররম পর্ব পালনকে ধর্মের অঙ্গ বলে মনে করেন। তাদের কাছে জারি নাচের ধর্মীয় আবেদন স্বীকৃত হয়েছে। জারি নাচে সাধারণত তরুণ ও কিশোররা অংশগ্রহণ করে। জারি গান ও নাচ একই সময়ে অনুষ্ঠিত হয়। দলের প্রধান ব্যক্তি গান করে কিন্তু নাচে না। অঞ্চল বিশেষে জারি গানের বিভিন্ন নাম ও আঙ্গিক বৈশিষ্ট্য রয়েছে, যেমন—রংপুরে 'হাদি', রাজশাহীতে 'ওস্তাদ', ময়মনসিংহে 'বয়াতি', কুমিল্লায় 'জোগালি' ইত্যাদি। দলের মধ্যে যারা গানে নাচে অংশগ্রহণ করে তাদের যথাক্রমে— 'পাইল' ও 'দোহার' বলা হয়। জারি নাচের দলটিকে 'জারিয়া দল' বলা হয়। জারি নাচ বৃত্তাকার রেখায় অনুষ্ঠিত হয়। মূল গায়েন প্রধানত কারবালার করুণ রসের শোকগাথা গায় এবং দোহাররা দিশা বা গড়ান গেয়ে তাকে সাহায্য করে। জারি নাচে পোশাকে কিছু বিশিষ্টতা থাকলে কোন বাধ্যবাধকতা নেই। জারিয়ালরা পরনে নিত্য ব্যবহার্য লুঙ্গি, গায়ের শার্ট বা গেঞ্জি, হাতে ও মাথায় লাল রুমাল বাধে। কোনো কোনো অঞ্চলে তারা পায়ে নূপুর পরিধান করে। জারিয়া দলের কোনো লোকসংখ্যা নির্দিষ্টতা নেই। সাধারণত পনের বিশ জন নিয়ে একটি জারিয়া দল গঠন করা হয়। মহররমের চাঁদ দেখার রাত থেকে জারি নাচ শুরু হয়। উৎসবের দশ দিন তারা বাড়ি বাড়ি গিয়ে নাচ গান করে। উৎসবের শেষ দিন স্থানীয় দরগাহ অথবা নকল কারবালায় বিভিন্ন দলের সমাবেশে নাচ গানের উত্তেজনা চূড়ান্ত রূপ নেয়।

বাংলার পল্লীর পথে ঘাটে বাউল গান ও বাউল নাচ দীর্ঘকাল ধরে জনপ্রিয়তা অর্জন করে আসছে। বাউল গানের মতো নাচও একান্তভাবে বাউলদের নৃত্য, তাই এখানে ভিন্ন সম্প্রদায়ের লোকের অংশগ্রহণ করার কোনো সুযোগ নেই। বাউল গানে বা নাচে কোনো কোনো লৌকিক উপলক্ষ্য নেই। বাউল গান সাধনার অঙ্গ হলেও বাউল নাচ অপরিহার্য বিষয় নয়। কেবল মানসিক প্রস্তুতি ও আনন্দ তীব্রতা অনুসারে গানের গূঢ়ার্থ পরিপূর্ণভাবে উপলব্ধি করার জন্যই বাউলরা গান করতে গিয়ে নাচে মেতে ওঠেন। বাউল নাচ পুরুষদের নাচ এবং প্রধানত একক নাচ। বাউল আখড়ার মিলোনোৎসবে দলবদ্ধভাবে বাউল নাচ হয়ে থাকে। কোনো দৈহিক গতি ভঙ্গিমা বা মুদ্রাভিনয় বাউল নাচে থাকেনা। বাউলে সৌন্দর্য ও মাধুর্য নিহিত রয়েছে তাঁদের বিচিত্র ভঙ্গিতে পদচালনায় এবং গতিবিধিতে। অনুরূপভাবে বাংলার ফকির নাচকেও বাউল নাচের

শ্রেণিভুক্ত করা যায়। যদিও বাউলদের সঙ্গে ফকিরদের বিস্তর পার্থক্য রয়েছে। বাংলা মুসলমান সমাজে এক বিশেষ শ্রেণির লোক রয়েছেন যারা ঢিলাঢালা পোশাক পরিধান করেন ও লম্বা বাবরি চুল রাখেন, এরা সাধারণভাবে ফকির নামে পরিচিত। ফকিররা নৈমিত্তিক জিকির গাওয়া ছাড়া ও আনুষ্ঠানিক ভাবে নাচ ও গান করে থাকেন। পূর্ব বাংলার 'মাইজ ভাণ্ডার' উৎসবে পীরের মাজারে অনুষ্ঠিত আসরে পীরের ভজনায় যে গান গাওয়া হয় তার সঙ্গে ফকিররা অগ্নিকুণ্ডের চারপাশে বৃত্তাকারে ঘুরে ঘুরে নাচেন। পেশোয়ারের পাঠানদের 'খটক' নাচের ভঙ্গিটা অনেকটাই এই নাচে অনুরূপ। বাউল নাচের মতো ফকির নাচেও এ ভক্তিভাব প্রকাশিত হয়। পশ্চিমবঙ্গের বর্ধমান জেলায় বাঙালি মুসলমান সম্প্রদায়ের লোকের মধ্যে দুটি বাঁশ নিয়ে যে নাচ দেখানোর প্রচলন আছে, তা 'মাদার নাচ' নামে অভিহিত। ঢোল ও কাঁসি সহযোগে মুসলমান সম্প্রদায়ের দুজন লোক দুটি সরল সম্পূর্ণ বাঁশ নিয়ে গোটা পল্লী নৃত্য করে বেড়ানোর প্রচলন আছে। বগুড়া জেলায় এটি 'নিশানের নাচ' নামে অভিহিত। মাদারের বাঁশের অনুরূপ গাজীর বাঁশের অনুষ্ঠানে উত্তরবঙ্গের কিছু কিছু অঞ্চলে পালিত হয়, এখানে গাজীর দরগায় চারপাশ ঘিরে গাজির শিষ্যরা গাজীর বাঁশ নিয়ে বিভোর হয় নাচে। উত্তরবঙ্গে এই নাচ 'চেলা নাচ' নামে পরিচিত।

ঘাটু নাচ একান্তভাবে বাংলার আঞ্চলিক নাচ। নদীমাতৃক বঙ্গদেশের উত্তর-পূর্ব এবং শ্রীহট্টের পশ্চিম অঞ্চলে ঘাটু নাচের আসর বসে। এ অনুষ্ঠানে ধর্মীয় বা সামাজিক কোনো উপলক্ষ্য নেই, মনোরঞ্জন করা একমাত্র উদ্দেশ্য। বছরের যে কোনো সময়ই ঘাটু নাচের আসর বসে তবে বর্ষাকালে চারিদিকে যখন জলময় হয়ে ওঠে গ্রাম্য চাষীর হাতে কাজ থাকেনা, তখন ঘাটু নাচের আসর জমজমাট হয়ে ওঠে। এক বা একাধিক ঘাটু নিয়ে একটি ঘাটুদল গঠন করা হয়। ঘাটু দলের প্রধানকে সরকার বলা হয়, যিনি মূল গায়েন হন। তাদের সরকারী বাইনদের কাজ হল গান করা এবং বাজনা বাজিয়ে তাল যোগানো। ঘাটু হচ্ছে গানের তরুণ কিশোর, দশ থেকে বিশ পর্যন্ত তার বয়স। ঘাটুতে তরুণ কিশোর নারী বেশে রূপসজ্জা করে যখন নৃত্যের ঝঙ্কার তুলে তখন সে দর্শক দৃষ্টিতে একটি রূপবতী বালিকা রূপে প্রতিভাত হয়। ঘাটু নাচের সুর ও তাল বাদ্য হিসেবে ঢোল, মন্দিরা, বাঁশী ও সারিন্দা প্রধান। ঘাটু গান ও নাচের বিষয়বস্তু হিন্দুর পৌরাণিক রাধাকৃষ্ণের লৌকিক প্রেমলীলা। ঘাটু নাচ অনেকাংশে আধুনিক অপেরার মতো, যেখানে অভিনয়কে প্রাধান্য দেওয়া হয়।

নৌকা বাইচের সময় সারি গানের সঙ্গে সারি নাচ অনুষ্ঠিত হয়। প্রতিযোগিতার মুহূর্তে নাচ করা হয় না, যখন প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করতে যায় এবং প্রতিযোগিতার শেষে গৃহে ফিরে আসার সময় সারি দল নাচ ও গান করে। সারি গানের বিষয় বিবিধ যেমন— রাধা কৃষ্ণ, হর গৌরী, নিমাই সম্পর্কিত গান, লৌকিক নর নারীর প্রেম বিষয়ক গান ,পরস্পর আক্রমণাত্মক গান ইত্যাদি। মনসা ভাসানের দিন নৌকা বাইচের আয়োজন হয় নৌকায় বেশিরভাগ লোক বইঠা টানে। গানের বয়াতি ও নাচের দু-একজন ব্যক্তি নৌকার পাটাতনে দাঁড়িয়ে ঘুরে ঘুরে নাচে ও গান গায়। তাদের মুখ্য বিষয় আনন্দোল্লাস।

ঘাটু নাচের মতো ছোকরা নাচ ও শুধুমাত্র লোক মনোরঞ্জনের নিমিত্ত অনুষ্ঠিত হয় । মাঠে ঘাটে খেত খামারে সারাদিন কাজ করে রাতে ছোকরা নাচের আসরে আমোদ স্ফূর্তির মধ্যে ডুবে থেকে মজুর কর্ম ক্লান্তি ও সংসার চিন্তা লাঘব করার চেষ্টা করে। সাধারণত লোক উৎসবগুলোতে ছোকরা নাচের আয়োজন হয়। কিন্তু বছরের যে কোনো সময় এই নাচ অনুষ্ঠিত হতে পারে উত্তরবঙ্গের রংপুর, রাজশাহী এবং পশ্চিমবঙ্গের মালদহ, মুর্শিদাবাদ জেলায় এই নাচের জনপ্রিয়তা বেশি। স্থান বিশেষে এর ভিন্ন ভিন্ন আঞ্চলিক নাম রয়েছে । যেমন— রংপুরে 'বেনাকুশাইন', রাজশাহী এবং পশ্চিমবঙ্গে মালদহ , ও মুর্শিদাবাদে 'আলাকাপনাচ' প্রভৃতি। বাংলার পশ্চিম সীমান্তের যে 'নাচনী নাচ' অনুষ্ঠিত হয়,তা ছোকরা অর্থাৎ তরুণ ছেলেটি ঘাটুর মতো সাজসজ্জা করে। ছোকরা নাচের বা গানের বিষয় মূলত রাধাকৃষ্ণের প্রেমলীলা। গানের প্রধানকে 'গীদাল' ও সহকারীদের 'দোহার' বলা হয়। গীদালের গানের সুর ও ভাব অনুযায়ী ছোকরা নাচের ভঙ্গিমা নিয়ন্ত্রিত হয়।

সংগীতের একপ্রকার তালের নাম খেমটা তাল। খেমটা তালের গানের সঙ্গে নাচ হয় বলে এরূপ নামকরণ হয়েছে বলে মনে করা হয়। খেমটা নাচ হচ্ছে বাঈজী নাচের গ্রামীণ সংস্করণ। তারা দক্ষ পেশাদার নর্তকী। সাধারণত গ্রামীণ জমিদারের মনোরঞ্জনে ও বিলাসের জন্য এই নাচ অনুষ্ঠিত হয়। এই নাচের ভাবভঙ্গি আদি রসাত্মক। যার বিষয় রাধা কৃষ্ণের লৌকিক প্রেম, এই নাচের কোন নির্দিষ্ট নিয়ম নেই। যে কোনো সামাজিক আনন্দ অনুষ্ঠানে এই নাচের আয়োজন করা হতো। ড. দীনেশচন্দ্র সেনের মতে হিন্দু পুজোৎসবে খেমটা নাচ ও বিদ্যাসুন্দরের যাত্রার আসর একসময় বাংলা সমাজে খুব প্রচলিত ছিল।

মহরম পর্বে অনুষ্ঠিত হওয়া লাঠি নাচ একপ্রকার যুদ্ধ নৃত্য। দেশব্যাপী এর প্রচলন আছে। বাংলার জারি নৃত্যের মতো এই নাচে লাঠিয়ালদল গঠন করা হয়। এই নাচে দৈহিক বল ও কায়দা কানুনের প্রয়োজন হয় বলে বয়স্করা অংশগ্রহণ করে এবং তরুণরা শিক্ষানবিশ হিসেবে উপস্থিত হয়। লাঠি নাচের তাল ও ছন্দ রক্ষা করা হয় ঢোল ও কাঁসির সাহায্যে। পোশাক পরিচ্ছদ নিতান্ত সাধারণ—লাঠি নাচের পুরুষেরা পায়জামা এবং মালকোচা করে লুঙ্গি, গায়ে গেঞ্জি বা আঁটসাঁট শার্ট পরে। অনেক সময় কোমরে ও মাথায় কাপড় বাঁধে। কোনো অঞ্চলে পায়ে ঘুঙুর পরার রীতি আছে। এই নাচের একমাত্র উপকরণ লাঠি ছাড়াও তলোয়ার, ছোরা, থালা প্রভৃতি দিয়ে নাচ দেখানো হয়। লাঠি নাচে নাচ খেলার মাধ্যমে কৃত্রিম যুদ্ধের ভঙ্গিতে শক্তি ও কৌশল প্রয়োগের দ্বারা বীরত্ব প্রকাশ করা হয়। এই নাচ নিতান্ত ভাবেই পুরুষের একক বা দ্বৈত নাচ। নাচের সঙ্গে কোনোরূপ গান থাকে না, পায়ের গতি ভঙ্গি এবং হাতের ঘোরপ্যাঁচ ছাড়া দেহের কোনো ক্রিয়া থাকে না। জারিয়াল দলের মতোই লাঠিয়াল দল বাড়ির উঠানে উঠানে, রাস্তার মোড়ে, দরগায় মহরমের চাঁদের দশ দিন ধরে নাচ প্রদর্শন করে এবং শেষ দিন কারবালার আসর জমায়। দর্শক তাদের অর্থ দিয়ে পুরস্কৃত করে।

বাংলার পুরুষদের একপ্রকার যুদ্ধ নৃত্য হচ্ছে ঢালি নাচ। ঢাল নিয়ে নাচ করা হয় বলে এর নাম ঢালি নাচ। এই নাচের সর্বাংশই দ্বৈত যুদ্ধের অভিনয়। তাই এই নাচে সংগীত থাকে না।

বাদ্যের বিশেষ ভূমিকা এই গানে লক্ষ্য করা যায়। বেতের ঘন বুনট দ্বারা তৈরি ভাল অনেকটা ব্যাঙের ছাতার মতো হয় এবং বাঁশের শক্ত অংশ দিয়ে লাঠি তৈরি করা হয়, যা এই নাচের প্রধান উপকরণ। দৈহিক শক্তির অভ্যাস ও কলা কৌশলগত চেষ্টাতেই এ নাচের লক্ষ্য সীমাবদ্ধ। যশোর ও খুলনা জেলায় এই নাচের প্রচলন রয়েছে।

লাঠি নাচের মতোই রায়বেঁশে নাচ বাংলার বীরত্বপূর্ণ লৌকিক নাচ। 'রায়বাঁশ' নামক একপ্রকার শক্ত বাঁশের তৈরি লাঠি নিয়ে এই নাচ অনুষ্ঠিত হয় বলে এরূপ নামকরণ করা হয়েছে। রায়বেঁশে মূলত হিন্দুদের নাচ। ডোম বাউরি প্রভৃতি শ্রেণির লোকেরা এতে অংশগ্রহণ করত। বীরভূম, বর্ধমান এবং মুর্শিদাবাদ জেলার বিভিন্ন অঞ্চলে এই নাচের প্রচলন আছে। বীরভূমের মুসলমানরাও রায়বেঁশে নাচে অংশগ্রহণ করে। অন্যান্য যুদ্ধ নাচের মতো এই নাচেও সংগীত ছাড়া ঢোল ও কাঁসি বাজিয়ে তাল রক্ষা করা হয়।

পূর্ববঙ্গের ঢাকার মানিকগঞ্জ অঞ্চলে ডাক নাচের প্রচলন আছে। ডাক নাচ প্রধানত পুরুষদের যুদ্ধনৃত্য। নাচের ভিতর দিয়ে সঙ্গীদের যুদ্ধে আহ্বান করা হয়, তাই এই নাচের নাম ডাক নাচ। ডাক প্রকৃত পক্ষে গান নয়, উচ্চস্বরে একটানা কণ্ঠধ্বনি—যা শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত ধ্বনি ও লয়ের নির্দিষ্ট মাপে উঠা নামা করে। এই নাচের তিনটি অংশ রয়েছে—ডাক, নাচ, এবং খেলা। ডাক নাচ পুরোপুরি সামাজিক নাচ। গোষ্ঠী বা সমাজের নিরাপত্তা রক্ষার জন্য যে সর্তকতা ও যুদ্ধের ব্যবস্থা ছিল, তার থেকে ডাক নাচের উদ্ভব হয়েছে বলে মনে করা হয়। যুদ্ধের শেষ পর্বে লাঠি নিয়ে যুদ্ধের যে দৈহিক কলাকৌশল দেখান হয়, তা লাঠি খেলার অনুরূপ।

ডাক নাচের দলপতিকে 'সরকার' বলা হয় । 'সরকার' যখন প্রথম ডাক শুরু করে তখন অকস্মাৎ মনে হতে পারে শত্রুরা বুঝি আক্রমণ করেছে, তা টের পেয়ে আশে পাশের সহচরদের ডাক দিয়ে সে সচেতন ও সতর্ক করে দেয়। ডাক নাচের সরকারের পার্শ্বচর দুজন লাঠিয়াল থাকে। কিন্তু সরকারের ভূমিকাও সজীব ও প্রধান হয়। কৃত্রিম দ্বৈতযুদ্ধের মাধ্যমে নাচ শেষ হয়।

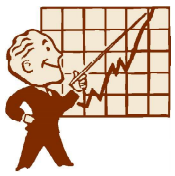
পূর্ব বাংলার চট্টগ্রাম জেলায় চৈত্র সংক্রান্তির পর থেকে বৈশাখ মাস ধরে মাঠে—ময়দানে কুস্তির লড়াই অনুষ্ঠিত হয়, তাকে 'বলীখেলা' বলে। এটি সম্পূর্ণরূপে প্রতিযোগিতামূলক অনুষ্ঠান। মুর্শিদাবাদ জেলায় চৈত্র মাসের দিকে কুস্তির খেলার প্রচলন আছে। প্রতিযোগিতার দিন লোকে মাঠে সমবেত হয়। আখড়ার বিচিত্র তালে ঢোল ও কাঁসর বেজে ওঠে। দুইদলের কুস্তির লড়াই হয়। 'বাঁধা কুস্তি' ও 'ছাড়া কুস্তি'। দুজন প্রতিযোগীকে নির্বাচন করে তাদের মধ্যে বাঁধা কুস্তির লড়াই হয়। আখড়ায় নামা মাত্রই বাদ্যের তালে তালে পাঁয়তারা করে। এতে থাকে প্রতিযোগিতার বলিষ্ঠ পদক্ষেপ, তালঠুকা, হুঙ্কার, হাতের কসরত এবং চোখের ক্রুদ্ধ চাহনি। কুস্তির আগে পর্যন্ত পাঁয়তারার অংশটুকু প্রকৃতপক্ষে নাচের পর্ব। এই নাচকে চট্টগ্রামে 'বলীনাচ' বলা হয়। এ নাচে ঢুলির ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ। লড়না বা বলীখেলা ধর্ম—সমাজ নিরপেক্ষ লৌকিক অনুষ্ঠান।

ছৌ নৃত্য বাংলার এক প্রাচীন ও সমৃদ্ধ লোকনৃত্যশৈলী, যা প্রধানত পশ্চিমবঙ্গের পুরুলিয়া জেলায় প্রচলিত। 'ছৌ' শব্দটি সংস্কৃত 'ছায়া' থেকে এসেছে। যার অর্থ ছদ্মবেশ বা মুখোশ। পুরুলিয়ার ছৌ নৃত্য তার মুখোশ, শক্তিশালী ভঙ্গিমা, তালবাদ্যের গম্ভীর সুর এবং নাট্যশৈলীর

জন্য বিশেষভাবে পরিচিত। বাংলার ছৌ নৃত্যের উৎপত্তি নিয়ে গবেষকেরা ভিন্ন ভিন্ন মত পোষণ করেছেন। ছৌ- নাচের শারীরিক গঠন ও ভঙ্গিমা, যুদ্ধকলার পরিবেশনা প্রাচীন ভারতীয় 'পারিখণ্ডা' যুদ্ধকলার রূপান্তর বলে অনেকে মত প্রকাশ করেছেন। বাংলার গ্রাম্য সমাজে ছৌ নৃত্য চৈত্র মাসের শেষে বসন্তোৎসব ও চৈত্র পার্বণে অনুষ্ঠিত হয়।

বাংলার ছৌ নৃত্যের প্রধান বিষয়বস্তুগুলো মূলত পৌরাণিক আখ্যান কেন্দ্রিক। রামায়ণ, মহাভারত, কৃষ্ণলীলা, রামের বনবাস, মহিষাসুর বধ, প্রভৃতি বিষয়কে কেন্দ্র করে ছৌ নৃত্য অনুষ্ঠিত হয়। পুরুলিয়ার ছৌ নাচের সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য বিষয় হচ্ছে মুখোশের ব্যবহার। বিশাল আকৃতির ও রঙিন মুখোশের মাধ্যমে নৃত্যশিল্পীরা পৌরাণিক চরিত্রগুলোকে চিত্রিত করেন। মুখোশগুলো সাধারণত কাঠ, কাগজ মণ্ডল ও কাপড়ের সংমিশ্রণে তৈরি হয় এবং হাতে আঁকা হত। ছৌ নাচে বিভিন্ন লোকবাদ্যের ব্যবহার লক্ষ্য করা যায়। যেমন—ঢোল, ধামসা, নাগাড়া, শিঙ্গা ও শেইনাই। এই বাদ্যযন্ত্রগুলির মাধ্যমে গতি ও আবেগ বাড়ানো হয়, যা ছৌ নৃত্যের অন্যতম আকর্ষণীয় দিক। বর্তমানে ছৌ নাচ শুধুমাত্র গ্রামাঞ্চলে সীমাবদ্ধ নয়। জাতীয় ও আন্তর্জাতিক মঞ্চে লোকনৃত্যের প্রতিনিধিত্ব করছে। ২০১০ সালে UNESCO ছৌ নৃত্যকে 'অমূল্য সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য' (Intangible Cultural Heritage) হিসেবে স্বীকৃতি দিয়েছে।

ঝুমুর নাচ বাংলার ঐতিহ্যের এক অনন্য অংশ। ঝুমুর গানের তালে তালে সাধারণত দলবদ্ধভাবে ঝুমুর শিল্পীরা বৃত্তাকারে একে অপরের কোমর ধরে নাচ পরিবেশন করে। ঝুমুর নাচে মৃদু ও ছন্দময় সুরের প্রাধান্য থাকে। এতে ঢোল ধামসা করতাল মাদল ইত্যাদি লোকবাদ্য ব্যবহৃত হয় । ঝুমুর নাচের জন্য বিশেষ ধরনের পোশাক ব্যবহৃত হয়, যা সাধারণত রঙিন ও উজ্জ্বল হয়। সাঁওতাল বা কুর্মি নারীরা শাড়ি পড়ে, মাথায় ফুলের সাজ এবং হাতে ঘুঙুর পরিধান করে। শিল্পীদের একই ছন্দে কোমর দোলানো, হাতের নান্দনিক মুদ্রা ও পায়ের ছন্দময় গতির মাধ্যমে বিশেষ সৌন্দর্য ও শোভা ফুটে ওঠে। ঝুমুর নাচের বিভিন্ন ধারা রয়েছে। যেগুলো অঞ্চল ভেদে বৈশিষ্ট্য বহন করে। যেমন-আদিবাসী ঝুমুর, কৃষিজীবী ঝুমুর, বৈষ্ণব ঝুমুর , ঝুমুর নাচগান প্রভৃতি।



অগ্রগতি নির্ধারক প্রশ্ন

৫. স্বরূপভেদে বাংলার প্রধান লোকনৃত্যগুলোর পরিচয় লিখুন। (১০০ শব্দের মধ্যে)

৬. ছৌ নৃত্যের উপর একটি সংক্ষিপ্ত প্রতিবেদন লিখুন। (২২০ শব্দের মধ্যে)

৫.৫ মৃৎ শিল্প

মানব সভ্যতার ইতিহাসের সঙ্গে মৃৎশিল্পের ইতিহাস ওতপ্রোতভাবে জড়িত। প্রাচীন সভ্যতাগুলোর প্রত্নতাত্ত্বিক উৎখননে মৃৎ পাত্রের নিদর্শন পাওয়া যায়, যা এই শিল্পের প্রাচীনত্বর সাক্ষ্য বহন করে। বাংলার মৃৎশিল্পের উৎপত্তি নব্যপ্রস্তর যুগ থেকে শুরু হয়েছিল বলে ধারণা

করা হয়। সম্ভবত প্রয়োজনের তাগিদে তৈরি করা মৃৎপাত্রাদি থেকে মানুষের শৈল্পিক ভাবনার সূত্রপাত হয়েছিল। বাংলা একটি প্রবাদে আছে 'কাঁদামাটি করিয়ার শাসন, কুম্ভকার গড়ায় মাটির বাসন'। পাল শাসনকালে বাংলার কুম্ভকাররা মৃৎশিল্পের ঐতিহ্যকে সমৃদ্ধ করে তুলেছিল। ঐতিহাসিকদের মতে, পালপর্বের আগে প্রস্তর নির্মিত ভাস্কর্য বা শিল্পকলার নিদর্শন খুব বেশি না থাকলেও, সুলভ মৃৎশিল্পের প্রসার উল্লেখযোগ্য ছিল। দীর্ঘ চারশ বছর পাল রাজত্বের নানা উত্থান পতনের মধ্যে আর্য জনগোষ্ঠীর সংমিশ্রণে ভাষা, সংস্কৃতি ও শিল্পকলার যে বিকাশ ঘটে, তার মধ্যে মৃৎশিল্পের উন্নয়ন গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে।

হরপ্পা ও মহেঞ্জোদারো সভ্যতায় দেখা যায় শিল্পীরা অত্যন্ত নিপুণতার সঙ্গে নানান মাটির পাত্র তৈরি করত, এর সঙ্গে মাটির ভাস্কর্যে জীবজন্তুর ও পৌরাণিক কাহিনি নির্ভর কাহিনির নারী ও দেবীর মূর্তি নির্মাণ করত। বাংলার লোকায়ত শিল্পে মৃৎশিল্পের ইতিহাস আলোচনায় ঐতিহাসিক নীহাররঞ্জন রায় বলেছেন, "পালপর্বের আগে প্রস্তর ভাস্কর্যের নিদর্শন যে বাঙলাদেশে খুব বেশি নাই, তাহার প্রধান কারণ সুলভ মৃৎশিল্পের প্রসার নমনীয় মাটির নিজস্ব একটা গুণ ও প্রকৃতি আছেই; সহজ দ্রুত আঙ্গুলি ও করতালু চালনার ফলে বিচিত্র দ্রুত ভঙ্গি সহজেই রূপ গ্রহণ করে,ডৌলের মার্জনা সহজ নয়। এই মাধ্যমে কাজ করার ফলে বাঙলার লোকায়ত শিল্পের কতগুলো বৈশিষ্ট্য আপনি ধরা দিয়েছিল।" তাঁর মতে লৌকিক মৃৎশিল্প পূর্বে সুঅভ্যস্ত ছিল, কারণ বাংলার সমগ্র জুড়ে ছিল মসৃণ গাঙ্গেয়ভূমি।

বাংলা খাদ্যকে নান্দনিক রূপ দেওয়ার জন্য যে ছাঁচের ব্যবহার করা হত, তা মূলত মৃৎশিল্পের অন্যতম দৃষ্টান্ত। মাটি নির্মিত ছাঁচ ছিল প্রাচীন বাংলার মৃৎশিল্পের অবিচ্ছেদ্য অংশ। বাংলার রকমারি সন্দেশ ও পিঠার নান্দনিক নক্শার পিছনে রয়েছে মৃৎশিল্পের অবদান। পোড়ামাটির অলঙ্করণ বাংলার সবচেয়ে আকর্ষণীয় অঙ্গ। মৃৎ শিল্পের ক্ষেত্রে টেরাকোটা বা পোড়ামাটির অলঙ্করণের আলোচনা 'বাংলা স্থাপত্য ও ভাস্কর্য' অংশে করা হয়েছে। বর্তমানে এই টেরাকোটার ব্যবহার বিভিন্ন ক্ষেত্রে দেখা যায়—মেয়েদের অলংকার, আধুনিক আসবাব বা তৈজস পত্র, নানান প্রতিকৃতি ও মূর্তি যা ঘর সরঞ্জাম রূপে ব্যবহৃত হয়।

বাংলার শিল্প ঐতিহ্যে মৃৎশিল্প এক অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ রূপে বিরাজমান। বাংলার শিল্পচর্চা শুধু নান্দনিক বিষয় নয়, তা বাংলার সমাজ ধর্ম ও সংস্কৃতির সঙ্গে গভীর ভাবে যুক্ত। বঙ্গদেশে প্রাগৈতিহাসিক যুগ থেকেই মানুষ মাটির ব্যবহারের সঙ্গে পরিচিত ছিল এবং জীবনের প্রাত্যহিক কাজের প্রয়োজনে ব্যবহৃত হত। এই অব্যাহত ধারাটি ক্রমেই বৈচিত্র্য ও শৈল্পিক উৎকর্ষে উন্নীত হয়। প্রাচীন যুগে তাম্রযুগীয় ও লৌহযুগীয় প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শনগুলিতে মাটির নির্মিত পাত্র, খেলনা এবং বিভিন্ন ধর্মীয় প্রতিমূর্তির খণ্ডাংশ পাওয়া যায়, তার থেকে প্রমাণিত হয় যে, মৃৎশিল্প সেই সময়ের থেকেই বাঙালি জীবনের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ ছিল। প্রাচীন বঙ্গের মানুষ নদীকেন্দ্রিক সভ্যতার সঙ্গে যুক্ত ছিল বলে কাদামাটিকে সহজলভ্য উপকরণ হিসাবে ব্যবহার করে নানাবিধ তৈজসপত্র বা আসবাব পত্র তৈরি করত, যা স্থানীয় সংস্কৃতির পরিচয় বহন করত। মৌর্য ও গুপ্ত যুগে বাংলা মৃৎশিল্প এক নতুন মাত্রা লাভ করেছিল। তখনকার মৃৎপাত্রের খোদাই এবং খাঁজকাটা

অলঙ্করণ দেখা যায়, যা শুধু ব্যবহারিক ছিল না শৈল্পিক দৃষ্টিকোণ থেকে এর মান ছিল খুব উন্নত ধরনের। পাল যুগে বৌদ্ধধর্মের প্রসারে স্তূপ, মঠ-মন্দির নির্মাণে মাটির ফলক ও টেরাকোটার ফলকগুলিতে বিভিন্ন পৌরাণিক ও ধর্মীয় কাহিনি তথা লোকজ জীবনের চিত্র এবং দৈনন্দিন জীবনযাত্রার দৃশ্য প্রতিফলিত হয়েছে।

মধ্যযুগে সেন ও সুলতানি শাসনকালে মঠ ও মন্দির নির্মাণ কালে টেরাকোটা ফলকের মাধ্যমে পুরাণ ও লোকজ জীবনের ব্যাখ্যা দৃষ্ট হয়। যেমন—কান্তজীর মন্দির (দিনাজপুর), রাজশাহীর বাগমারা ও কৃষ্ণনগরের বহু পুরাতন মন্দিরগুলোতেও এই শিল্পচর্চা বিস্তৃত হয়। এই ধারাবাহিকতা শিখরে পৌঁছায় বিষ্ণুপুরের মল্ল রাজাদের পৃষ্ঠপোষকতায়। শ্যামরায়, রাসমঞ্চ, মদনমোহন ও জোড়বাংলা মন্দিরের প্রতিটিতেই পোড়ামাটির ফলকে কৃষ্ণলীলা, পৌরাণিক কাহিনি স্থানীয় জীবন যাত্রা তথা রাজনৈতিক অবস্থা পর্যন্ত প্রকাশ পেয়েছে। বিষ্ণুপুর ছাড়াও বঙ্গদেশের বগুড়ার মহাস্থানগরে প্রাপ্ত ফলক ও খেলার পাত্র, ব্রাহ্মণবাড়িয়ার কুটির শিল্পে ব্যবহৃত মাটির সামগ্রী, খুলনার রূপসা অঞ্চলে প্রাপ্ত প্রত্ন নিদর্শনগুলো এই শিল্পধারার বিস্তৃত সাক্ষ্য বহন করছে। এ ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য যে, বাঁকুড়ার অন্তর্ভুক্ত মৃৎশিল্পের মধ্যে পুতুল, ঘোড়া মাটির মুখোশ ইত্যাদি ছিল বাংলার মানুষের রঙিন কল্পনার প্রকাশ। যাকে মানুষ 'ভাব প্রকাশের মাধ্যম' রূপে গ্রহণ করেছিল। বাংলা মৃৎশিল্প চর্চা শুধু ধর্মীয় বা শৈল্পিক পরিমণ্ডলে সীমাবদ্ধ থাকেনি, এই শিল্প বাংলার লোকজ জীবনের অংশরূপে পরিণত হয়েছিল। অর্থাৎ টেরাকোটার আলেখ্য যেমন সমাজের চালচিত্র তুলে ধরেছে, তেমনি নান্দনিকতার প্রতিমূর্তি হয়ে উঠেছে। বাংলার মৃৎশিল্প তাই কোনো নির্দিষ্ট কালের প্রতিনিধিত্ব করে না, এই শিল্প সময়ের ধারাবাহিকতায় তৈরি এক সাংস্কৃতিক উত্তরাধিকার রূপে পরিচিত হয়েছে।

৫.৬ পাট শিল্প

পাট বা সোনালি আঁশ যুক্ত শিল্প আধুনিক বাংলার অর্থনীতির মেরুদণ্ড, যার উৎপত্তি এবং শিল্পায়নের ইতিহাস বহু প্রাচীনকালের। প্রাচীন এবং মধ্যযুগীয় বাংলার গ্রামীণ অর্থনীতি, হস্তশিল্প ও সাংস্কৃতিক রীতির সঙ্গে পাট শিল্পের এক ঘনিষ্ঠ যোগ ছিল, যা পরবর্তীকালে এক বিস্তৃত বাণিজ্যিক কাঠামো গঠন করে। প্রাচীন বাংলায়, বিশেষত গঙ্গা-ব্রহ্মপুত্র অববাহিকায় পাট চাষের জন্য উপযুক্ত জলবায়ু থাকায় পাটের ফলন কৃষিভিত্তিক সমাজ ব্যবস্থার পাশাপাশি মৃৎশিল্প, তাঁত ও পাটভিত্তিক হস্তশিল্প একত্রে বিকশিত হতে থাকে। এই প্রেক্ষিতে উল্লেখ্য যে, প্রাচীন গ্রন্থ কৌটিল্যের 'অর্থশাস্ত্র' বিদেশি পর্যটকদের বিবরণে ভারতীয় অঞ্চলে পাটজাত দ্রব্যের উল্লেখ পাওয়া যায়। যদিও 'জুট' শব্দটি পরবর্তীকালে ব্যবহৃত হয়েছে, এর পূর্বে পাট শব্দটি 'পট্ট', পট্টবস্ত্র নামে পরিচিত ছিল।

পাটগাছ থেকে তৈরি পট্টবস্ত্র, দড়ি, ঝুড়ি এবং ঘরের দৈনন্দিন কাজে ব্যবহৃত সামগ্রী বাংলার গ্রামীণ জীবনে অভ্যন্তরীণ চাহিদা পূরণ করত। এসব তখনকার গ্রামীণ অর্থনীতিতে

অর্থ উপার্জনের গুরুত্বপূর্ণ মাধ্যম ছিল। কৃষকেরা পাট বিক্রয় করে অন্যান্য সামগ্রী ক্রয় করত বিনিময়ের মাধ্যমে। বাংলার নদীবহুল ভূ-প্রকৃতি পাট পরিবহনকে সহজ করে তুলেছিল, ফলে বঙ্গদেশে রাজশাহী, পাবনা, খুলনা, যশোর, কুমিল্লা, নদীয়া ও মুর্শিদাবাদে পাটের আমদানি-রপ্তানি দ্রুত ছড়িয়ে পড়ে। পাট নির্মিত চট, দড়ি, থলে মাদুর একটি আত্মনির্ভরশীল শিল্প কাঠামো গঠনে সহায়ক হয়ে ওঠে। বাংলা বিভিন্ন জেলাতে স্থানীয় কবিগণদের মাধ্যমে পাটশিল্প বিকাশ লাভ করেছিল, যাদের নিয়ে একটি স্বতন্ত্র গোষ্ঠীর জন্ম হয়। এই শ্রেণি বাঙালির হস্তশিল্প ভিত্তিক অর্থনীতিতে গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে। অনেক অঞ্চলে পাটকাঠিকে জ্বালানি রূপে ব্যবহার করা হয়। অন্যদিকে নদী ও জলাভূমি প্রবাহ পাট চাষের জন্য উপযুক্ত বলে বাংলার পাট চাষের ফলন বিশেষত বর্ষাকালে বন্যা-পরবর্তী সময়ে জমিতে পাট ফলানো ও আঁশ ছাড়ানো একটি যৌথ সামাজিক প্রক্রিয়া ছিল, যেখানে নারীরাও অংশ গ্রহণ করতেন। বাংলা লোকসংগীতে, বিশেষত বাউল-ফকিরদের গানে 'পাটের থলি', 'পাটের দড়ি', 'পাটকাঠির আগুনে রান্না' প্রভৃতি অভিব্যক্তি তখনকার পাটশিল্প নির্ভর গ্রামীণ জীবনের প্রতিফলন ঘটায়।

৫.৭ বস্ত্র শিল্প

বাংলার শিল্পজাত দ্রব্যের মধ্যে অন্যতম শিল্প বলে চিহ্নিত বস্ত্র শিল্পের খ্যাতি খ্রিস্টের জন্মের বহু পূর্বে দেশে-বিদেশে ছড়িয়ে পড়েছিল। বস্ত্রশিল্প ছিল এই দেশের প্রধান শিল্প, এর প্রমাণ পাওয়া যায় কৌটিল্যের 'অর্থশাস্ত্র'-এ, 'Periplus of Erythrean sea' গ্রন্থে, যেখানে আরব, চীন ও ইতালীর পর্যটক ও ব্যাবসায়ীদের বৃত্তান্ত রয়েছে। কৌটিল্যের মতে, বঙ্গদেশের উৎপন্ন সূক্ষ্ম বা রেশমি বস্ত্র ছিল খুব নরম ও সাদা, পুণ্ড্রদেশের বস্ত্র ছিল শ্যাম বর্ণের এবং দেখতে মণির মতো পেলব এবং কামরূপের বস্ত্রের রঙ ছিল নবোদিত সূর্যের মতো। পত্রোর্ণ বা এন্ডি বা মুগাজাতীয় বস্ত্র মগধ, কামরূপ এবং পুণ্ড্রে উৎপন্ন হত। পুণ্ড্রদেশে শুধু কোমল সূক্ষ্ম বস্ত্রই নয় পত্রোর্ণ ক্ষৌম বস্ত্রও উৎপন্ন হত। শ্রেষ্ঠ কার্পাস উৎপন্ন হত মধুরা (মাদুরা), অপরান্ত, কলিঙ্গ, কাশী, বঙ্গ, বৎস শ্রেষ্ঠ কার্পাস বস্ত্রের অন্যতম উৎপত্তিস্থল ছিল। বঙ্গে ও পুণ্ড্রে চার প্রকারের বস্ত্র শিল্প ছিল--- দুকূল, পত্রোর্ণ, ক্ষৌম ও কার্পাসিক।

বাংলার প্রাচীন বস্ত্রশিল্প প্রধানত ছিল তাঁত নির্ভর। হাতে চালানো চরকা ছিল উৎপাদনের প্রধান মাধ্যম। মুর্শিদাবাদ, চন্দ্রকেতুগড়, ময়মনসিংহ ও বর্ধমান ছিল তাঁত শিল্পের প্রধান কেন্দ্র। চন্দ্রকেতুগড়ে প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শন ও পোড়ামাটির ফলকে নারীর বস্ত্র পরিধানরীতি সুস্পষ্টভাবে চিত্রায়িত হয়েছে। বাংলার বস্ত্রশিল্পের মধ্যে।

৫.৫ স্থাপত্য ও ভাস্কর্য

বাংলার ভাস্কর্য শিল্প এক দীর্ঘ ঐতিহ্যের ধারক, যা প্রাকৃতিক রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক পরিবর্তনের সঙ্গে বিবর্তিত হয়েছে। বাংলার স্থাপত্য ও ভাস্কর্যের ইতিহাস মূলত মঠ-মন্দির, স্তূপ

ও বিহার, মূর্তি ও মন্দির-অলংকরণের ভিত্তিতে গড়ে উঠেছে। বাংলার প্রাচীন ভাস্কর্যগুলো প্রধানত গুপ্ত রাজত্বকালে বিকাশ লাভ করেছিল। গুপ্ত সম্রাটরা ব্রাহ্মণ্যধর্ম প্রসারে প্রয়াসী হওয়ায় তাঁদের নির্দেশে বঙ্গদেশে বহু হিন্দু দেব-দেউল নির্মিত হয়েছিল। পরবর্তী যুগে সেন রাজাদের শাসনকালেও হিন্দু দেব-দেউল নির্মিত হয়েছিল। সম্প্রতিকালে নদীয়া জেলার কৃষ্ণনগরের বামুনপুকুর গ্রামে বলালটির নামে সেন-যুগের এক বিরাট 'পঞ্চরথ' মন্দির এর সন্ধান পাওয়া গিয়েছে। তার অনেক পূর্বে পাল রাজত্ব কালে বৌদ্ধধর্মের প্রসারে বৌদ্ধ স্তূপ ও মূর্তি নির্মিত হয়েছিল। কিন্তু ১২০৪ খ্রিস্টাব্দের পর বাংলা যখন মুসলমানদের অধিকারে চলে যায় তখন এদেশের সমস্ত দেব-দেউল বিনষ্ট হয়ে যায়। কিন্তু ক্ষুদ্রকায় স্তূপগুলো মুসলমান রাজাদের ধর্মদ্বেষের হাত থেকে বেঁচে যায়। এইরূপ ক্ষুদ্রাকায় স্তূপের প্রাচীন নিদর্শন হচ্ছে ঢাকা জেলার আসফপুর গ্রামে রাজা দেবখড়্গের তাম্রশাসনের অষ্টধাতু নির্মিত স্তূপটি। পাহাড়পুর ও চট্টগ্রামের অন্তর্গত ঝেওয়ারি অঞ্চলে এই জাতীয় ধাতু নির্মিত স্তূপের সন্ধান পাওয়া যায়। পাহাড়পুর ও বাঁকুড়ার বহুলাড়া অঞ্চলে ইষ্টক নির্মিত বিভিন্ন স্তূপের অধোভাগ আবিষ্কৃত হয়েছে--- সেগুলো বাংলার প্রাচীনতম স্থাপত্যের পরিচয় বহন করছে। অষ্টম শতাব্দীতে সম্রাট ধর্মপাল 'সোমপুর বিহার' নামে যে বিখ্যাত বিহারটি নির্মিত করিয়েছিলেন, সেটি পাহাড়পুরে আবিষ্কৃত হয়েছিল, এ বিরাটাকার বিহারের অঙ্গনটি প্রতি দিকে ৬০০ হাত দীর্ঘ ছিল, যেখানে ১৩ ফুট করে দীর্ঘ ১৭৭ টি কক্ষ ছিল। অঙ্গনটির মাঝখানে ছিল প্রকাণ্ড একটি মন্দির। ভারতে আজ পর্যন্ত যতগুলো বৌদ্ধ বিহারের ধ্বংসাবশেষ আবিষ্কৃত হয়েছে, সোমপুর বিহার ছিল তার মধ্যে সর্বাপেক্ষা বৃহৎ। এছাড়া কুমিল্লা ও মালদহ জেলার জগদ্দলে কয়েকটি বিহার ও মহাবিহারের ধ্বংসাবশেষ পাওয়া যায়।

বৌদ্ধ গ্রন্থের পুথিতে অঙ্কিত চিত্র ও প্রস্তর মূর্তিতে উৎকীর্ণ মন্দিরের প্রতিকৃতি থেকে বাংলার মন্দিরসমূহের গঠনরীতি সম্পর্কে জানা যায়। এই মন্দিরগুলো সাধারণত উড়িষ্যার 'ভদ্র' ও 'রেখ' মন্দিরের আদলে নির্মিত হত। বাঁকুড়ার একেশ্বর মন্দিরের অঙ্গনে নন্দীর ছোটো মন্দিরটি 'ভদ্র' রীতি দ্বারা গঠিত মন্দিরের একমাত্র নিদর্শন। বর্ধমান জেলার বরাকরে ও বাঁকুড়ার দেহার মন্দির 'রৈখ' রীতিতে নির্মিত মন্দিরের নিদর্শন। বাংলার মন্দিরসমূহকে সাধারণভাবে তিনটি শ্রেণিতে ভাগ করা হয়েছে। যেমন—চালা, রত্ন ও দালান রীতি গঠিত মন্দির। 'চালা' মন্দিরগুলো বাংলার কুঁড়ে ঘরের অনুকরণে গঠিত। এই দেবালয়গুলো অতীতে সহজলভ্য উপকরণ। যেমন-বাঁশ, খড়, কাঠ ইত্যাদির দ্বারা নির্মাণ করা হত। পরবর্তীতে এগুলো পোড়া—ইটের দ্বারা নির্মিত হয়। চালামন্দিরগুলো দোচালা, জাউবাংলা, চারচালা,আটচালা ও বারোচালা শ্রেণিতে বিভক্ত করা হয়। দোচালা মন্দিরকে এক বাংলা মন্দিরও বলা হত। কিন্তু বঙ্গদেশে এজাতীয় মন্দির খুবই বিরল। দুটি দোচালা মন্দিরকে পাশাপাশি যোগ করে জোড়বাংলা মন্দির তৈরি করা হত। হুগলি জেলার বিশালাক্ষী মন্দির এর যথাযথ দৃষ্টান্ত। গ্রাম বাংলার সর্বত্র খড়ের যে চারচালা কুটির রয়েছে, তার অনুকরণে তৈরি হত চারচালা মন্দির এবং একটি চারচালা মন্দিরের ওপর আরেকটি ছোটো চারচালা নির্মাণ করে আরেকটি আটচালা মন্দির গঠন করা

হত। আটচালা মন্দিরের নিদর্শন বাংলায় সর্বত্রই পাওয়া যায়। সাধারণত এই জাতীয় মন্দিরগুলো শিব মন্দির রূপে পরিচিত ছিল। বাংলা শিখর বা চূড়াযুক্ত মন্দিরগুলো রত্নমন্দির বলা হত। একটি চূড়া অর্থাৎ এক রত্ন মন্দির। এইভাবে পঞ্চ চূড়াযুক্ত 'পঞ্চরত্ন' বা 'নবরত্ন' এবং 'ত্রয়োদশরত্ন' মন্দির বাংলায় নির্মিত হত। বিষ্ণুপুরে শ্যামরায়ের মন্দির পঞ্চরত্ন মন্দির; দক্ষিণেশ্বরের ভবতারিণীর মন্দির নবরত্ন এবং বাঁশ-বেড়িয়ার হংসেশ্বরী মন্দির হচ্ছে ত্রয়োদশরত্ন মন্দিরের নিদর্শন। দালান রীতিতে গঠিত মন্দিরে কোনো শিখর বা চূড়া থাকে না অর্থাৎ মন্দিরের ছাদটি সমতল হয়। বাংলার বীরভূমের নানা স্থানে এই প্রকার মন্দির রয়েছে, যেমন--- উচকরণ, কনকপুর, নানুর ও লাভপুরের মন্দির সমূহ।

বাংলার বহু ইটের মন্দিরের ভাস্কর্যের আকর্ষণীয় অঙ্গ ছিল টেরাকোটা বা পোড়ামাটির অলঙ্করণ। পোড়ামাটির অলঙ্করণ ভারতে খুব প্রাচীনকাল থেকেই প্রচলিত। পালযুগে পাহাড়পুর, মহাস্থানগর প্রভৃতি স্থানের বৌদ্ধবিহারের গায়েও পোড়ামাটির অলঙ্করণ দেখা যায়। একাদশ ও দ্বাদশ শতকে নির্মিত বাঁকুড়ার বাহুলাড়া ও সোনাতোপলের মন্দিরে, বীরভূম ও হুগলি জেলার বহু মন্দিরে, মালদাহ জেলার গৌর, আদিনা ও পাণ্ডুয়ার মসজিদগুলোর গায়ে পোড়ামাটির অলঙ্করণ পরিলক্ষিত হয়। এগুলো তৈরি করা হয় টালির আকারে ছাঁচে ফেলে, বা কাঁচামাটির ওপর উৎকীর্ণ করে 'পোন' বা ভাটিতে পুড়িয়ে। বাংলার এই ভাস্কর্যগুলো তিনশ চারশ বছরের বেশি সময় থেকে অক্ষত অবস্থায় রয়েছে। এগুলো নির্মাণে বিশেষ ধরনের মাটি ও উঁচু দরের দক্ষতা ও নৈপুণ্য ব্যবহৃত হত। এর শিল্পীরা মূলত মেদিনীপুর, হাওড়ার রসপুর, হুগলির খানাকুল ও কৃষ্ণনগর, রাজহাটি, সেনহাটি, বাঁকুড়ার বিষ্ণুপুর, সোনামুখি, গলসি ও বর্ধমান জেলার গুসকরা ও কেতুগ্রাম অঞ্চলে কেন্দ্রীভূত ছিলেন।

পোড়ামাটির অলঙ্করণের বিষয়বস্তু ছিল রামায়ণ, মহাভারতের ও পৌরাণিক বিভিন্ন কাহিনি বিষয়ক বৃত্তান্ত, সমকালীন সমাজচিত্র, বন্য পশুর অনায়াস বিচরণ, ভঙ্গি ও সাবলীল গতিবেগ এবং ফুল-পাতা-লতা ও বিভিন্ন জ্যামিতিক নক্শা প্রভৃতি।

৫.৯ চিত্র ও চারুকলা

প্রকাশরীতি ও সৃষ্টিকর্মের বিচারে চিত্র ও চারুকলা আত্ম-সংস্কৃতির অন্তর্ভুক্ত। মানব বিজ্ঞান ও অভিজ্ঞতা দিয়ে এক সৃষ্টিশীল অনুভূতির প্রেরণায়, রঙ দিয়ে মূর্তি দিয়ে মানস-ফসলকে তুলে ধরে। চিত্র ও চারুকলা রঙ ও রেখার লীলাবিন্যাস। লোকশিল্পজাত এই কর্মের প্রধান বৈশিষ্ট্য হচ্ছে প্রতীক ও মটিফ। প্রাচীন পূজা-সংস্কার, আঞ্চলিক আচার উৎসবের ধারা প্রতীক ও মটিফের দ্বারাই প্রবাহিত হয়ে আসছে। বাংলার লোক চিত্রগুলোতে কতকগুলি স্বতন্ত্র মটিফ পাওয়া যায়। যেমন—পদ্ম, কলকা, সজীব গাছ, বর্ফি, বুটি, পুষ্পিত লতা-ফুল পেচানো রেখা, এককেন্দ্রিক বৃত্ত প্রভৃতি। লোকচিত্রকে অঙ্কনের উপকরণ অথবা চিত্ররূপ দিয়ে ভাগ করা যায় না। এর বিভাগটা আসে আধার বা ক্যানভাসের দিক থেকে। যেমন—কাঁথার মধ্যে চিহ্নিত ছবি

সূচকর্মের বিষয়; পাটি বয়ান শিল্পের মধ্যে পড়ে। লোকসমাজে 'নক্‌শী কাঁথা' বা 'নক্‌শী পাটি' নামে পরিচিত। এইরূপে পটের উপর চিত্র অঙ্কিত হয় বলে পটচিত্রের নাম, রঙ রেখার আলিম্পন থেকে 'আলপনা' নামকরণ হয়েছে মনে করা যায়। আধারকে অবলম্বন করে 'কুলাচিত্র' 'পিঁড়িচিত্র' তৈরি হয়। পটচিত্রের মধ্যে পশ্চিমবঙ্গের পটুয়ার পট, পূর্ববঙ্গের গাজীর পট, কালীঘাটের পট, সরার চিত্র প্রভৃতি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

ঘট চিত্র, মুখোশ চিত্র, দারুচিত্র ও পটচিত্র বাংলার চিত্রকলার অন্যতম। এই চিত্রগুলো কোনটি কত প্রাচীন তা ঠিকভাবে নির্ণয় করা সম্ভব নয়। কারণ এগুলোর প্রাচীন নিদর্শন কোথাও রক্ষিত হয়নি। চিত্র আঁকার উপলক্ষ্য, চিত্র মটিফ বা প্রতীকের ব্যঞ্জনা থেকে তার প্রাচীনত্ব অনুমান করা যায়। বাংলার চিত্রকলার অন্যতম প্রাচীন দৃষ্টান্ত হচ্ছে আলপনা। হিন্দু নারী সমাজে ব্রতানুষ্ঠানে আলপনা প্রধান উৎস। মুখ্যত আলপনা হচ্ছে মঙ্গল চিত্র। চালের গুড়ি সাদা পিটালি আলপনার প্রধান রঙ। রঙ ফুটিয়ে তোলার জন্য সিদুঁরের ব্যবহার বাংলা গৃহে গৃহে আজও প্রচলিত আছে।

৫.১০ অধ্যায় সংক্ষেপ

এই অধ্যায়টিতে বাঙালি সংস্কৃতি এবং শিল্পকলার বিভিন্ন দিক তথা লোকায়ত শিল্প, সংগীত, নৃত্য, মৃৎশিল্প, পাট শিল্প, বস্ত্র শিল্প, ছাড়াও বাংলার স্থাপত্য, ভাস্কর্য, চিত্র এবং চারুকলা সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে। এছাড়া বাঙালি জাতির ঐতিহ্য, জীবনধারায় শিল্পকলার প্রয়োগ এবং ঐতিহাসিক বিবর্তনের বিশ্লেষণে বহুধর্মীয় বাংলার সাংস্কৃতিক পরিচয় তুলে ধরা হয়েছে অধ্যায়টিতে।



৫.১১ অধ্যায়টি পাঠ করে আমরা কী শিখলাম

এই অধায়টি পড়ে শিক্ষার্থী-

- বাঙালির সংস্কৃতি এবং শিল্পকলা সম্পর্কে সম্যক জ্ঞান লাভ করলেন।
- বাংলার লোকায়ত শিল্প, সংগীত এবং নৃত্য সম্পর্কে জানলেন।
- বাংলার মৃৎশিল্প, পাট শিল্প এবং বস্ত্র শিল্প সম্পর্কে অবগত হলেন।
- বাংলার স্থাপত্য, ভাস্কর্য, চিত্র ও চারুকলা সম্পর্কে জ্ঞান লাভ করলেন।
- বাঙালি জাতির ঐতিহ্য, জীবনধারাও শিল্পকলার মাধ্যমে জাতিসত্তার সচেতনতাবোধ অনুধাবন করলেন।
- লোকজ শিল্প ও সংস্কৃতির ধারার ঐতিহাসিক বিবর্তনের বিশ্লেষণ এবং বহুধর্মীয় ও বহু সাংস্কৃতিক প্রভাবের সংমিশ্রণে গঠিত বাংলার সাংস্কৃতিক পরিচয় লাভ করলেন।



৫.১২ অতিরিক্ত পঠন

আহমেদ, ড. ওয়াকিল (১৯৬৫ ইং); বাংলার লোক-সংস্কৃতি; ঢাকা: বাংলা একাডেমী

রায়, নীহাররঞ্জন (১৯৯৩); বাঙ্গালীর ইতিহাস (আদি পর্ব) : কলকাতা: দে'জ পাবলিশিং

সেনগুপ্ত, পল্লব (১৯৫৯ ইং); লোকসংস্কৃতির সীমানা ও স্বরূপ; কলকাতা: পুস্তক বিপণি

সরকার, সঞ্জীব ও অরুণকুমার রায় সম্পাদনা (১৯৮০ ইং); লোকায়ত সংস্কৃতি: উইলিয়াম কেরী কলকাতা: স্টাডি আন্ড রিসার্চ সেন্টার

সুর, ড. অতুল (২০১৭); বাংলা ও বাঙালির বিবর্তন; কলকাতা: সাহিত্যলোক

হালদার, গোপাল (১৯৬৫); সংস্কৃতির রূপান্তর; কলকাতা : ওরিয়েন্ট বুক কোম্পানি



৫.১৩ অগ্রগতি নির্ধারক উত্তর-সংকেত

১।নং প্রশ্নের উত্তর: আরিস্টটল শিল্পকে বলেছেন জীবজগৎ ও জড় বস্তুর অনুকরণ।... অপরটি হচ্ছে মানুষের মানস উপকরণ।-এভাবে উত্তর সাজিয়ে লিখুন। (দ্রষ্টব্য ৫.২)

২।নং প্রশ্নের উত্তর: সংস্কৃতির মোট তিনটি রূপ রয়েছে... মানুষের জীবন যাত্রার যেসকল নিয়মপদ্ধতি রয়েছে তার মধ্যে... একটি জাতিকে তার স্বকীয়তায় স্থিত করে তুলেছে। -এভাবে উত্তর সাজিয়ে লিখুন। (দ্রষ্টব্য ৫.২)

৩।নং প্রশ্নের উত্তর: বাংলার লোকগীতগুলো হল-... বাংলার কর্ম সংগীতের মধ্যে রয়েছে ... নাথ গীতিকা, প্রাচীন পূর্ববঙ্গ গীতিকা, রংপুর গীতিকা, প্রভাতী, আগমনী-বিজয়া উল্লেখযোগ্য। -এভাবে উত্তর সাজিয়ে লিখুন। (দ্রষ্টব্য ৫.৩)

৪। নং প্রশ্নের উত্তর: ভাটিয়ালি সংগীত : ভাটিয়ালি সংগীত বাংলা লোকসংগীতের এক অনন্য ধারা, ... ভাওয়াইয়া গান : ভাওয়াইয়া গান উত্তরবঙ্গের লোকসংগীতের এক অনন্য শাখা।... এই গানে নারীর আবেগ ভালবাসা ,অপেক্ষা এবং বেদনার সুর মূর্ত রূপ লাভ করেছে। -এভাবে উত্তর সাজিয়ে লিখুন। (দ্রষ্টব্য ৫.৩)

৫।নং প্রশ্নের উত্তর: ভৌগোলিক পরিবেশ রীতি-নীতি, আঞ্চলিক ভাষা, রুচিও রসভেদে এবং আঙ্গিকপ্রয়োগ কৌশলের বিভিন্ন পার্থক্যের জন্য বাংলা লোকনৃত্যের অনেকগুলো ভাগে ভাগ করা হয়েছে, যেমন —... বাংলার প্রচলিত ধর্মীয় লোকনৃত্যের মধ্যে জারি নাচ, ফকির নাচ, চেলা নাচ, কীর্তন নাচ, গম্ভীরা নাচ ও বাউল নাচ অন্যতম। -এভাবে উত্তর সাজিয়ে লিখুন। (দ্রষ্টব্য ৫.৪)

৬। নং প্রশ্নের উত্তর: ছৌ নৃত্য বাংলার এক প্রাচীন ও সমৃদ্ধ লোকনৃত্য শৈলী,... বাংলার ছৌ নৃত্যের প্রধান বিষয়বস্তুগুলো মূলত পৌরাণিক আখ্যানকেন্দ্রিক।... ২০১০ সালে

UNESCO ছৌ নৃত্যকে 'অমূল্য সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য' (Intangible Cultural Heritage) হিসেবে স্বীকৃতি দিয়েছে। -এভাবে উত্তর সাজিয়ে লিখুন। (দ্রষ্টব্য ৫.৪)



৫.১৫ আদর্শ প্রশ্নাবলি

১। লোকায়ত শিল্প কীভাবে বাংলার সামাজিক ও ধর্মীয় জীবনের প্রতিফলন ঘটায় ?

২। বাংলার বিভিন্ন অঞ্চলের লোকায়ত শিল্পে কী ধরনের বৈচিত্র্য দেখা যায় ?

৩। বাংলা লোকসংগীতের প্রধান প্রধান ধারাগুলো কী কী এবং তাদের বৈশিষ্ট্য আলোচনা করুন।

৪। বাউল গান বাংলা লোকসংগীত জগতে কী ধরনের দার্শনিক ভিত্তি প্রদান করে ?

৫। লোকনৃত্য কীভাবে কোনো জাতিগোষ্ঠীর সাংস্কৃতিক পরিচয় বহন করে ?

৬। পাল ও সেন যুগের স্থাপত্য ও ভাস্কর্যের বৈশিষ্ট্য বিশ্লেষণ করুন।

৭। আধুনিক বাংলার চিত্র ও চারুকলায় লোকজ ধারার প্রভাব কীভাবে প্রতিফলিত হয়েছে ?

৮। বস্ত্রশিল্পে নারীদের ভূমিকা সম্পর্কে আলোচনা করুন।

অধ্যায় ৬ : বাঙালির সংস্কৃতি- ধর্মকর্ম ও ধ্যান ধারণা

৬.১ জ্ঞাতব্য বিষয়
৬.২ পরিচিতি
৬.৩ বাংলার লৌকিক ধর্ম বিশ্বাস
৬.৪ বাংলার পৌরাণিক ধর্ম বিশ্বাস ও উৎসব
৬.৫ বাঙালির ধর্মীয় চেতনা
৬.৬ বাঙালির মেয়েলি ব্রত-পার্বণ
৬.৭ অধ্যায়টি পাঠ করে আমরা কী শিখলাম
৬.৮ অগ্রগতি নির্ধারক উত্তর-সংকেত
৬.৯ অতিরিক্ত পঠন
৬.১০ আদর্শ প্রশ্নাবলি

৬.১ জ্ঞাতব্য বিষয়

বাঙালির ইতিহাস ও সমাজচিন্তার বুননে ধর্ম একটি মৌলিক ও অবিচ্ছেদ্য উপাদান। বাঙালির ধর্মচর্চা কেবল শাস্ত্রীয় অনুশাসন বা উপাসনার মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়, বরং এক দীর্ঘ সাংস্কৃতিক অভিযাত্রার ফসল। প্রাক্ আর্য যুগের লোকধর্ম, আর্য সাংস্কৃতিক প্রভাব, তান্ত্রিক ও শাক্ত সাধনার বিস্তার, বৈষ্ণব ও সুফি চেতনার অন্তঃস্রোত— সব মিলিয়েই গড়ে উঠেছে বাঙালির এক স্বতন্ত্র ধর্মীয় সত্তা, যা ইতিহাস, সমাজ, শিল্প ও নৃতত্ত্বের নিরিখে অন্বেষণযোগ্য।

এই অধ্যায়টি নির্বাচনের উদ্দেশ্য হচ্ছে—

- বাঙালির ধর্মীয় রীতিনীতি ও ধ্যানধারণার ঐতিহাসিক উৎস ও বিবর্তন সম্পর্কে ধারণা লাভ করা।
- আর্য ও অনার্য সংস্কৃতির সংমিশ্রণে উদ্ভূত ধর্মীয় চরিত্র বিশ্লেষণ করা ।
- ধর্মকে সমাজের একটি সাংস্কৃতিক ও মানবিক প্রক্রিয়া হিসেবে বিশ্লেষণ করা।
- ধর্ম ও সমাজের পারস্পরিক সম্পর্ক, প্রভাব ও প্রতিক্রিয়া সম্বন্ধে গভীর অন্তর্দৃষ্টি অর্জন করা।

৬.২ পরিচিতি

মানব সভ্যতার প্রাচীনতম অনুষঙ্গগুলোর একটি হচ্ছে ধর্মচেতনা। মানুষ যখন থেকে প্রকৃতির রহস্যময়তা উপলব্ধি করতে শুরু করেছিল, তখন থেকেই ধর্মীয় অনুভূতির বীজ তার চেতনার ভিতর অঙ্কুরিত হয়। যেমন—আকাশে বিদ্যুৎ চমকানো, বৃষ্টি আসা প্রভৃতিকে কোনো অদৃশ্য শক্তির প্রভাব জাত ফল বলে মনে করত, যা জীবনের শুভাশুভ নির্ধারণ করে। এই গভীর

ও জটিল মানবিক প্রবণতা বিশ্ব সভ্যতার বিভিন্ন গোষ্ঠীর মতো বাঙালি জাতির মধ্যেও স্বতঃস্ফূর্ত বিকাশ ঘটিয়েছিল। তাই বলা যায়, বাঙালির ধর্ম তথা ধ্যান ধারণার বিষয়টি কেবল মানুষের বিশ্বাস বা উপাসনার কাঠামো মাত্র নয়। তা সমাজ, সংস্কৃতি, নৈতিকতা এবং ইতিহাসের এক অঙ্গাঙ্গি অংশ হিসাবে বিবেচ্য। বাঙালির ধর্ম জীবনের প্রারম্ভিক অধ্যায় সূচিত হয়েছিল প্রাক্ আর্য যুগে, যখন বঙ্গভূমিতে অনার্য ও আদিবাসী গোষ্ঠীগুলোর উপস্থিতি ছিল প্রধান বিষয়। এই জনগোষ্ঠীয় ধ্যান ধারণা ছিল মূলত লৌকিক প্রকৃতি নির্ভর। যেখানে গাছ, নদী, অরণ্য, পশু ও নারীশক্তিকে কেন্দ্র করে উপাসনার পরিসর গড়ে উঠেছিল। এই উপাস্য শক্তিরা ছিল কখনো রক্ষা কর্তার, কখনো মাতৃময় আবার কখনো হানিকর ও প্রবল শক্তির প্রতীক। ফলে প্রাচীন বাংলার ধর্ম-চিন্তা ছিল এক ধরনের বাস্তবমুখী, অভিজ্ঞতা নির্ভর জীবনদর্শনের প্রতিফলন, যা শুধু আধ্যাত্মিক নয়, ছিল জীবনমুখী বিশ্বাস।

পরবর্তীকালে বাংলায় আর্যজাতির আগমন ঘটে এবং তাঁদের বৈদিক ধর্ম, যজ্ঞ পদ্ধতি, পুরুষ প্রধান দেবতা ও ব্রাহ্মণ্য কাঠামো উপাসনা পদ্ধতির প্রধান বাহন হয়ে দাঁড়ায়। আর্যদের আগমনে এক সাংস্কৃতিক সংঘর্ষ তথা মেলবন্ধন রচনা করে। তবে এই সংঘর্ষ কখনো অন্ধ দমন নীতির রূপ নেয়নি, বরং দীর্ঘ এক সময়ের মধ্য দিয়ে বাঙালির আদিম ধর্মবিশ্বাসের সঙ্গে বৈদিক ধর্মের সমন্বয় ঘটে। এই দুই শ্রেণির দেবতারা একে অপরের মধ্যে মিশে যান এবং আচার ও রীতিনীতির মধ্যে পারস্পরিক রূপান্তর ঘটে। সর্বোপরি ধর্মীয় অনুভবের ক্ষেত্রে এক বহুমাত্রিক দৃষ্টিভঙ্গির উদ্ভব হয়। এই দীর্ঘ ঐতিহাসিক বিবর্তনের মধ্য দিয়ে বাঙালির ধর্ম ধারণা একাধিক স্তরে নির্মিত হয়। এই আলোচনার সূত্র ধরে বাঙালির লৌকিক ও পৌরাণিক ধর্ম ও তার বৈশিষ্ট্য এবং সাংস্কৃতিক প্রভাব কীরূপে বাঙালির পরিচয় গড়ে তুলেছে, সেই বিষয়ে বিশ্লেষণ করা হবে।

৬.৩ বাংলার লৌকিক ধর্ম-বিশ্বাস

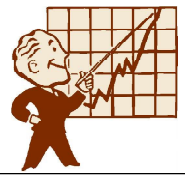
প্রাচীনকালে বাংলার ধর্মীয় জীবনের ভিত্তি ছিল মূলত লৌকিক ধর্মবিশ্বাস ও পূজা পদ্ধতি। এই ধর্মবিশ্বাসের কেন্দ্রবিন্দু ছিল প্রকৃতি, প্রাকৃতিক শক্তি, মৃতপূর্বপুরুষ, মাতৃশক্তি ও দৈনন্দিন জীবনের বিভিন্ন অনিশ্চয়তা। বহুক্ষেত্রে ভয় ভীতির আধার ছিল। মৃত্যুর পর আত্মার অস্তিত্বে বিশ্বাস, মৃত ব্যক্তির প্রতি শ্রদ্ধা জ্ঞাপন এবং ঐন্দ্রজালিক ক্রিয়া ও মন্ত্রের যোগে উপাসনা করা হত। প্রাচীন সমাজে মানুষ ও প্রকৃতির সৃজনশক্তিকে মাতৃরূপে পূজা করা হত; টোটেমের প্রতি ভক্তি ও শ্রদ্ধা করা ছিল সাধনার অপরিহার্য অঙ্গ। অনার্য কৌম সমাজের ধারণা করা হত যে, তাদের জীবনযাত্রায় যা কিছু বিপর্যয়, মৃত্যু, প্রাকৃতিক দুর্যোগ, রোগব্যাধি, পশু বা সর্প দ্বারা জীবন হানি প্রভৃতি সব বিশ্বাস ও নানান নিষেধাজ্ঞা জ্ঞাপক অনুশাসন ইত্যাদি নিয়ে প্রাক্ আর্য ধর্ম গঠিত হয়েছিল। আদিম সমাজ আরো একটু উন্নত হলে,তাদের ঐ ধারণার অনেক পরিবর্তন হয়, তাদের নতুন ধারণা জন্মায় যে, ঐ অদৃশ্য শক্তি ভীতিজনক হলেও বশীকরণ নরবলি ও কৃপা প্রার্থনা দ্বারা যদি তুষ্ট করা যায়, তাহলে তাদের জীবনযাত্রায় বিপদ ঘটবে না। কালক্রমে এ

ধারণাও আদিবাসী সমাজে প্রতিষ্ঠিত হয় যে বিপদ নিয়ন্ত্রক শক্তি শুধু একটি নয়, হিংস্রপশুর, বিষাক্তসর্প, রোগব্যাধির, প্রাকৃতিক দুর্ঘটনার জন্য ভিন্ন ভিন্ন শক্তি রয়েছে। পরবর্তীযুগে আদিবাসী সমাজের মানুষদের কোনো কোনো কৌম বা শাখা আকস্মিক ভাবে চাষ করতে বা বন্যপশু বধ করতে অক্ষম হলে চাষের ও পশু রক্ষার দেবতা তাদের মধ্যে কল্পিত হয়। এরপরে সেই অদৃশ্য শক্তির ভয় তাদের মধ্যে কিছু পরিমাণে হ্রাস পায়। বলা যায়, প্রাচীনকালে 'পূজা' বলে ঠিক যা বোঝায় তার প্রবর্তন আদিবাসী সমাজে প্রথম হয়েছিল অর্থাৎ এদেশীয় অস্ট্রিক, মঙ্গোলীয় ও দ্রাবিড় গোষ্ঠীর দ্বারা।

পল্লীর একান্ত দেবতার বা তাদের পূজাচারের মধ্যে আদিম ধর্মাচরণের নিদর্শনগুলোর মধ্যে ছিল, এসকল দেবতারা কোনো শাস্ত্র বা পৌরাণিক দেবতা নন, এদের পূজা লোকায়ত বিধানে অনুষ্ঠিত হত। সমাজের হাড়ি ডোম প্রভৃতিরা পৌরহিত্যের ভার গ্রহণ করতেন। দেবতাদের, কাছে ভক্তের কামনা ছিল ব্যক্তিগত এবং পার্থিব সুখ সুবিধা ও বিপদাদি থেকে ত্রাণের জন্য। দেবতাদের প্রতি ভক্তদের ভক্তি মিশ্রিত ভয় ক্রিয়া করত, পূজাচারে বীভৎস আচার অনুসৃত হত, যেমন—অত্যধিক পশু হত্যা, নৈবেদ্যর জন্য বলি করা পশুমুণ্ড ও রক্ত এবং মদ্য ও গঞ্জিকার ভোগ নিবেদন করা ইত্যাদি। বৃক্ষ বা বৃক্ষশাখাকে ও ছোটো ছোটো মাটির ঢিবি এবং স্বাভাবিক প্রস্তরখণ্ডকে দেবতা বা তার প্রতীক রূপে ধারণা করা হত এবং সকল দেবতাই ছিলেন আঞ্চলিক রূপে পূজ্য। এই সকল পূজায় বর্ণ সম্প্রদায় ভিত্তিক ভেদেভেদ না থাকায় সাধনা প্রার্থনার ঘনঘটা ছিল না। কিন্তু নাচগান, আমোদ প্রমোদের আধিক্য ও অপরিহার্য বৈশিষ্ট্য ছিল। বাংলার লৌকিক দেবতাদের মধ্যে যাঁরা বিশেষরূপে খ্যাত, তাঁদের ভক্তসংখ্যা এবং পূজাক্ষেত্র অপর বহু দেবতা অপেক্ষা অধিক ছিল। তাই তাঁদের প্রথম স্তরের দেবতা বলা হয়েছে। তাঁদের মধ্যে অন্যতম ছিলেন ধর্মঠাকুর, দক্ষিণ রায়, পঞ্চানন, ঢেলাই চণ্ডী, বাসলী, শীতলা অন্যতম।

কালের গতিতে এই সকল লৌকিক দেবতা, তাঁদের আরাধনা পদ্ধতি, লোকবিশ্বাস ক্রমশ আর্যদের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয় এবং সমস্ত বিষয়ই হিন্দুধর্মের মধ্যে স্থান লাভ করে। এইসকল সংস্কার হিন্দুধর্মের অন্তর্ভুক্ত হয়ে জন্ম, মৃত্যু, বিবাহ, শ্রাদ্ধ প্রভৃতি আনুষ্ঠানিক ধর্মীয় ক্রিয়াকাণ্ডে পরিণত হয়। ব্রাহ্মণ্যধর্মের অনেক কিছু পূজা পার্বণের অনুষ্ঠান আদিম অধিবাসীদের থেকে গৃহীত হয়েছিল। যেমন--- বাঙালির দুর্গাপূজা সঙ্গে সংশ্লিষ্ট নবপত্রিকার পূজা ও শারদোৎসব, নবান্ন, পৌষপার্বণ, হোলি, চড়ক, গাজন উৎসব প্রভৃতি। এছাড়া আনুষ্ঠানিক কর্মকাণ্ডে চাউলের ব্যবহার, কলাগাছের অপরিহার্যতা, নারিকেল, পান, সুপারি, সিঁদুর, ঘট স্থাপন, আলপনা আঁকা, শঙ্খধ্বনি, উলুধ্বনি, গোময় পঞ্চগব্যের ব্যবহার প্রভৃতি সকল আদিবাসী কৌম সমাজ থেকে নেওয়া । বর্তমানকালে হিন্দু বাঙালি দ্বারা পালিত আটকৌড়ে, সুবচনীপূজা, শিশুর জন্মসংক্রান্ত আচার যেমন- ষষ্ঠীপূজা; বিবাহে গাত্রহরিদ্রা, পানখিলি, গুটিখেলা, স্ত্রী আচারাদি লাজ বা খই ছড়ানো, দধিমঙ্গল , লক্ষ্মীপূজার সময় ঝাঁপি স্থাপন করা ইত্যাদি সকল অনুষ্ঠানই আসলে প্রাক আর্য সংস্কৃতির থেকে গৃহীত হয়েছে। বাংলার অন্যতম প্রধান গ্রাম্য দেবদেবীর পূজা, বৃক্ষপূজা, ধ্বজাপূজা, ঝুলন যাত্রা প্রভৃতি এবং বাংলার ধর্মঠাকুর, মনসা, শীতলা, পর্ণশবরী, জাঙ্গুলি প্রভৃতির পূজা ও

অম্বুবাচী অরন্ধন, পৌষপার্বণ প্রভৃতি আর্যেতর দেবদেবীরা বাংলার প্রাচীন সংস্কৃতি থেকে উদ্ভূত, যাঁদের আর্যায়ণ তুর্কি আক্রমণের দ্বারা সাধিত হয়। এই প্রাক্ আর্য সংস্কৃতির উপর প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল জৈন, আজীবিক ও বৌদ্ধধর্ম। জৈন আজীবিক ধর্মের সঙ্গে বৌদ্ধধর্ম ও খুব প্রাচীনকালে থেকে বঙ্গদেশে বিস্তার লাভ করেছিল। রাজা গোপাল কর্তৃক পালবংশ প্রতিষ্ঠার পর বৌদ্ধধর্মের যথেষ্ট অবনতি হয়। বজ্রযান নামে তান্ত্রিক বৌদ্ধধর্মের নতুন শাখার অভ্যুত্থান ঘটে, অবশ্য সেটা ভগবান বুদ্ধের তিরোধানের পরবর্তীতে বুদ্ধ শিষ্যদের মতানৈক্যের ফলে সংগঠিত হয়।



অগ্রগতি নির্ধারক প্রশ্ন

১. বাংলার লৌকিক ধর্ম বিশ্বাস সম্পর্কে লিখুন (১৫০ শব্দের মধ্যে)

৬.৪ বাংলার পৌরাণিক ধর্ম-বিশ্বাস

বাংলার গৌরবময় প্রাচীন সংস্কৃতি, তার ধর্মীয় বিশ্বাস ইত্যাদির অবসান ঘটেছিল মুসলমান কর্তৃক বাংলা বিজিত হওয়ার পর। ত্রয়োদশ শতাব্দীর গোড়ার দিকে তুর্কি আক্রমণের ফলে বঙ্গদেশে সমাজ, ধর্ম, শিক্ষা সংস্কৃতি ও সাহিত্যক্ষেত্রে এক বিশৃঙ্খল পরিস্থিতিতে বাংলার অনেক লোকায়ত দেবদেবীর অভ্যুত্থান ঘটে। মুসলমান শাসিত বাংলায় ব্রাহ্মণ্যতন্ত্রের শৈথিল্য ঘটায় বাংলার বহু লৌকিক দেবদেবী প্রাধান্য লাভ করেছিলেন, ফলে শীতলা, বাসুলী, চণ্ডী ইত্যাদিকে হিন্দু পৌরাণিক দেবতা স্থলে শিবজায়া উমার সহিত অভিন্ন মনে করা হয়। বাংলা সাহিত্যের মধ্যযুগে এই আর্যেতর দেবদেবীদের নিয়ে নতুন সাহিত্যধারা সূচনা হয়েছিল, যা 'মঙ্গল সাহিত্য' নামে পরিচিত। মঙ্গলকাব্যের এই সাহিত্য চার শ্রেণিতে বিভক্ত— 'মনসামঙ্গল', 'চণ্ডীমঙ্গল', 'ধর্মমঙ্গল' ও 'শিবায়ন'। লৌকিক জনপ্রিয় ধর্ম হিসেবে নাথধর্মের প্রসার বঙ্গদেশে এককালে প্রচলিত ছিল। এটি শৈবধর্মের শাখা বিশেষ, কিন্তু এর ওপর বৌদ্ধ তন্ত্র-ধর্মেরও প্রভাব ছিল বলে অনেক সমালোচকেরা মত প্রকাশ করেছেন। মধ্যযুগে ইসলাম ধর্মের প্রভাবে হিন্দু সমাজে কিছু দেবদেবী আত্মপ্রকাশ করেছিলেন, তাঁদের মধ্যে সত্য, গাজীসাহেব, বনবিবি অন্যতম। সত্যপীরের পূজা-কথায় বলা হয়েছে যে তিনি সত্যপীর ও নারায়ণের অভিন্ন রূপ।

বাংলার পৌরাণিক ধর্ম ও সংস্কারের ভিত্তি সেনযুগে বিস্তার লাভ করেছিল। এই পর্বের বাংলার সর্বব্যাপী ধর্ম ছিল ব্রাহ্মণ্যধর্ম। সেই ব্রাহ্মণ্যধর্ম বেদ ও পুরাণ, শ্রুতি ও স্মৃতি শাস্ত্র শাসিত ও নিয়ন্ত্রিত এবং তন্ত্রশাস্ত্র দ্বারা উদ্বুদ্ধ ছিল। সেন রাজা ছাড়া বর্মণ ও দেব বংশীয় সকল রাজারাও ছিলেন ব্রাহ্মণ্য ধর্মাশ্রয়ী । এই পর্বে বৈদিক যাগযজ্ঞের বিকাশ সাধন বিভিন্ন পৌরাণিক দেবদেবীর পূজা প্রচার লাভ করেছিল। মধ্যদেশ থেকে বঙ্গভূমিতে ব্রাহ্মণাভিযানের ফলে বিশেষ বিশেষ তিথি-নক্ষত্র অনুযায়ী স্নান-দান-ধ্যান তথা ধ্যান ক্রিয়াকাণ্ডের প্রাবল্যে বাংলার আকাশ-বাতাস ধ্বনিত হয়ে ওঠেছিল। বর্মণ-বংশের রাজারা সকলেই ছিলেন বিষ্ণুর পরমভক্ত। বর্মণ-বংশের দ্বারা ব্রাহ্মণ্যধর্মের সূচনা হয়েছিল এবং সেন রাজাদের দ্বারা এর বিকাশ হয়। বাংলার

স্মৃতিশাস্ত্রের ব্যবহারে এই যুগে রচিত অসংখ্য স্মৃতিশাস্ত্রের গ্রন্থাদিতে ব্রাহ্মণ্যধর্মের অমোঘ ও সুনির্দিষ্ট আদর্শ সক্রিয় ভাবে পরিচালিত হয়। বিজয় সেন ও বল্লাল উভয়ই ছিলেন পরম শৈব ভক্ত লক্ষ্মণসেন বৈষ্ণবভক্ত, তাঁর দুই পুত্র বিশ্বরূপ ও কেশবসেন উভয়েই নারায়ণ ও সূর্যের উপাসক ছিলেন। এই রাজবংশের সচেতন চেষ্টার দ্বারা বৈদিক ও পৌরাণিক ব্রাহ্মণ্য ধর্মের আকাশ বঙ্গদেশে বিস্তারিত হয়। রামায়ণ-মহাভারত ও পুরাণে যে প্রাচীন ব্রাহ্মণ্যাদর্শের কথা পাওয়া যায়, সেই আদর্শ সমাজ ও ধর্মজীবনে সঞ্চার করার প্রয়াস সমসাময়িক লিপি ও সাহিত্যে সুস্পষ্ট হয়ে উঠেছিল। এই লিপিগুলোতে কনক তুলা পুরুষ মহাদান, ঐন্দ্রীমহাশান্তি, হেমাশ্বমহাদান, হেমাশ্বর মহাদান প্রভৃতি যাগযজ্ঞ; সূর্যগ্রহণ, চন্দ্রগ্রহণ, উত্থান দ্বাদশী তিথি,উত্তরায়ণ-সংক্রান্তি প্রভৃতি উপলক্ষে স্নান, তর্পণ, পূজানুষ্ঠান, শিবপুরাণোক্ত ভূমিদানের ফলাফল; বিভিন্ন বেদাধ্যায়ী ব্রাহ্মণের পুঙ্খানুপুঙ্খ উল্লেখ প্রভৃতির প্রমাণ পাওয়া যায়। ব্রাহ্মণদের মধ্যে ঋক্, যজু, সাম ও অথর্ব—এই চারবেদই সুপরিচিত ছিল। বিশেষত যজুর্বেদীয় কাণ্বশাখা এবং সামবেদীয় কৌঠুমশাখার চর্চা ছিল বেশি পরিচিত। এই পর্বে বাংলার ব্রাহ্মণ্য জীবন সর্বভারতীয় শ্রৌত ও স্মৃতিশাস্ত্র বন্ধনে সম্পূর্ণরূপে বাঁধা পড়েছিল। গর্ভধারণ, পুংসবন, সীমান্তোন্নয়ন,হোম, জাতকর্ম, নিষ্ক্রমণ, নামকরণ, পৌষ্টিককর্ম, অন্নপ্রাশন, চূড়াকরণ, বিবাহ, গৃহপ্রবেশ, অন্ত্যেষ্টি প্রক্রিয়া প্রভৃতি সংস্কার পালনের অপরিহার্য অঙ্গ ছিল বৈদিক মন্ত্র উচ্চারণ করে কুশণ্ডিকানুষ্ঠান এবং সমিধহোম বা অন্য কোনো হোমযজ্ঞের দ্বারা গৃহাগ্নি শোধন বা প্রতিষ্ঠা করা। বাংলার এই সংস্কারাদির প্রাণপুরুষ স্বরূপ স্মার্ত পণ্ডিতদের মধ্যে ছিলেন-ভট্টদেব, বৃহস্পতি মিশ্র, রঘুনন্দন ভট্টাচার্য, হলায়ূধ ও জীমূতাবাহন। সেন শাসন কালে হলায়ূধ ব্রাহ্মণ্যধর্ম ও ব্রাহ্মণ সমাজের জন্য অনেকগুলি প্রসিদ্ধ গ্রন্থ রচনা করেছিলেন। ভবদেব ভট্ট বঙ্গদেশের ব্রাহ্মণদের মাছ খাওয়ার বিধান দিয়েছিলেন। রঘুনন্দন ছিলেন মধ্যযুগীয় সবচেয়ে বড় স্মার্ত পণ্ডিত। তিনি চৈতন্যের সমসাময়িক ব্যক্তি ছিলেন। তিনি বিধান দিয়েছিলেন যে, মুসলমান কর্তৃক অপহৃতা হিন্দু নারীকে সামান্য প্রায়শ্চিত্ত দ্বারা পুনরায় সমাজে গ্রহণ করা যাবে। তিনি আরো বিধান দিয়েছিলেন বাঙালি ব্রাহ্মণরা মসুর ডাল খেতে পারবেন। হিন্দু সামাজিক ও ধর্ম সংক্রান্ত বিষয়ে তাঁর বিধানসমূহ বর্তমানকালে ও হিন্দু সমাজে সাদরে পালিত হয়ে আসছে।

সেন-বর্মণ যুগে বৌদ্ধধর্মের প্রতি ব্রাহ্মণ্যধর্মের বিভিন্ন সম্প্রদায় যেমন বৈষ্ণব, শাক্ত ও শৈব-এর মধ্যে পরস্পর কোনো বিরোধ ছিল না। বস্তুত সাম্প্রদায়িক ধর্মের এই পারস্পরিক সম্বন্ধ বাংলার ব্রাহ্মণ সমাজের অন্যতম প্রধান বৈশিষ্ট্য। তাই আজও বাঙালি একই সঙ্গে সমান উৎসাহ ও নিষ্ঠার সঙ্গে বিষ্ণু ও শিব, লক্ষ্মী ও সরস্বতী, সূর্য ও কার্তিক ও অন্যান্য দেবদেবীর পূজা করে আসছে। এইসব স্মার্ত বিধানসম্মত পূজানুষ্ঠানের সঙ্গে সঙ্গে বঙ্গদেশে আজও নানা লৌকিক ব্রত, অ-স্মার্ত, পৌরাণিক গ্রাম্য দেবদেবীর পূজা প্রচলিত।

বাংলার সাংস্কৃতিক ও ধর্মীয় ও ঐতিহ্য বিভিন্ন ও অনুষ্ঠানকে কেন্দ্র করে সমৃদ্ধ হয়ে উঠেছিল, যা সমাজের বিভিন্ন স্তরে গভীর প্রভাব ফেলেছিল। এই উৎসবগুলোকে প্রধানত দুইটি ভাগে ভাগ করা যেতে পারে—এক, শাস্ত্রসম্মত উৎসবানুষ্ঠান ও শাস্ত্র বহির্ভূত উৎসবানুষ্ঠান।

শাস্ত্রসম্মত উৎসবগুলো প্রধানত হিন্দু ধর্মীয় গ্রন্থ ও বিধানের ভিত্তিতে পালিত হয়। এই উৎসবগুলো ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠান ও সামাজিক সমাবেশের মাধ্যমে সমাজে আনন্দ ও ঐক্য সৃষ্টি করে। যেমন—দুর্গোৎসব, কালী পূজা, সরস্বতী পূজা, সুখরাত্রি ব্রত, শক্রুত্থান পূজা, কামমহোৎসব, হোলাক উৎসব, পাষাণ-চতুর্দশী, দ্যুত-প্রতিপদ, কোজাগরী, ভ্রাতৃদ্বিতীয়া, আকাশ প্রদীপ, দীপান্বিতা, জন্মাষ্টমী, অশোকাষ্টমী, অক্ষয় তৃতীয়া, মাঘী সপ্তমী স্নান প্রভৃতি পৌরাণিক ব্রাহ্মণ্যধর্ম অনুমোদিত উৎসব অনুষ্ঠান । শাস্ত্র বহির্ভূত উৎসবগুলো বাংলার লোকজ সংস্কৃতি ও সামাজিক জীবনের অপরিহার্য অংশ। এই উৎসবগুলো স্থানীয় আচার-অনুষ্ঠান কৃষিভিত্তিক সমাজ ও সামাজিক প্রয়োজনের ভিত্তিতে উদ্ভূত হয়েছে। এই উৎসবগুলোর মধ্যে নবান্ন উৎসব, পৌষ পার্বণ, চড়ক প্রভৃতি অন্যতম।



অগ্রগতি নির্ধারক প্রশ্ন

২. বাংলার পৌরাণিক ধর্ম বিশ্বাস ও উৎসব সম্বন্ধে লিখুন। (২০০ শব্দের মধ্যে)

৬.৫ বাঙালির ধর্মীয় চেতনার প্রকাশ

পণ্ডিতদের মতানুযায়ী বঙ্গদেশের যে ত্রিভুজাকার ভূখণ্ড রয়েছে, সেই স্থান বীরভূম নামে পরিচিত ছিল, এই বীরভূম ছিল বাংলার ধর্মীয় সাধনার 'যাদুঘর' নামে পরিচিত। এই বীরভূমে বহুধর্মের প্রাদুর্ভাব ঘটেছিল, বিভিন্ন সময়ে। বাঙালির ধর্মীয় চেতনার বহিঃপ্রকাশ ঘটেছিল বিভিন্ন মঠ মন্দিরকে কেন্দ্র করে। পশ্চিমে বিন্ধ্যপর্বতের পাদমূল থেকে যে তরঙ্গায়িত মালভূমি পূর্বদিকে ভাগীরথী স্নাত পলিমাটির দেশের দিকে এগিয়ে গিয়েছে, তা বীরভূমকে দু-ভাগে বিভক্ত করেছে — পশ্চিমে বনজঙ্গল পরিবৃত রুক্ষ ও কর্কশ অঞ্চল ও পূর্বে কোমল রসাল সমতলভূমি ছিল। বীরভূমের বনজঙ্গলের মধ্যেই বহু মুনি ঋষির তপোবন ছিল। যেমন—ভাণ্ডীরবনে বিভাণ্ডক ঋষির আশ্রম, শিয়ানে ঋষ্যশিঙ্গ ঋষির আশ্রম, শীতলগ্রামে সন্দীপন ঋষির, গর্গমুনির ও দুর্বাসা মুনির আশ্রম ছিল। বনজঙ্গলের শাশ্বত নির্জনতা বীরভূমকে গড়ে তুলেছিল শাক্ত ধর্মীয় সাধনার প্রকৃষ্ট ক্ষেত্র রূপে, এইজন্যই বীরভূম শাক্তধর্মের লীলাভূমি রূপে প্রসিদ্ধ। তন্ত্রবর্ণিত মহাপীঠস্থানসমূহের মধ্যে বীরভূমে যত মহাপীঠ আছে, ভারতের আর কোথাও নেই বললেই চলে। বীরভূমে প্রায় প্রত্যেক শহরের কাছেই সতীর দেহাংশের ওপর প্রতিষ্ঠিত একটি করে শক্তিপীঠ রয়েছে।

বীরভূমের কোমল অঞ্চলগুলোতে বৈষ্ণবধর্মের পুণ্যস্থানসমূহ নির্মিত হয়েছিল, যেমন— জয়দেবের কেঁদুলি, চণ্ডীদাসের নানুর, একচক্রাপুরের নিত্যানন্দ প্রভুর সাধনক্ষেত্রসমূহ ইত্যাদি। এছাড়া "বীরভূম হচ্ছে শিবের দেশ"। বীরভূমের মাঠে ঘাটে, শহরের সন্নিকটে ও শ্মশানে আছে

অসংখ্য শিবমন্দির। দক্ষিণ- পশ্চিমে বক্রেশ্বর, ফুলেশ্বর ও দুবরাজপুরের মন্দির তার অন্যতম নিদর্শন।

দুবরাজপুরের ছয় মাইল দক্ষিণ-পশ্চিমে ভীমগড়ে অজয় নদের তীরে অবস্থিত কেন্দুলি গ্রাম, এখানে অবস্থিত ফুলেশ্বরের যে শিবমন্দির আছে, কথিত আছে বৈষ্ণবধর্ম গ্রহণ করার আগে জয়দেব শাক্ত ছিলেন এবং এই মন্দিরে তিনি নিত্য পূজার্চনা করতেন। এছাড়া বোলপুরের সন্নিকটস্থ সুপুর গ্রামে মহাদেব সুরমেশ্বরের মন্দির প্রসিদ্ধ ছিল। এর থেকে প্রমাণিত হয় যে, বাংলায় শৈবধর্ম এককালে ব্যাপকভাবে প্রচারিত ছিল।

বীরভূমের সমাজে গ্রাম্যদেবতার পূজা খুব প্রচলন আছে। গ্রাম্যদেবতাদের মধ্যে ধর্মঠাকুরের পূজাই সবচেয়ে বেশি প্রচলিত ছিল। পরবর্তীকালে এই লৌকিক দেবতা ব্রাহ্মণ্যধর্মের দ্বারা প্রভাবান্বিত হয়েছিল ঠিকই কিন্তু ডোম জাতির লোকেরা এর পৌরোহিত্যের ভার নিতেন। বীরভূমে ধর্মঠাকুর শিলারূপে পূজিত হন। 'তিনি আকারহীন শূন্যময় দেবতা'। নিরাকার হলেও তার বর্ণ হচ্ছে শ্বেত ও শ্বেতবর্ণ সিংহাসনে তিনি আসীন হন। আবার অনেক স্থানে ধর্মঠাকুর শিবঠাকুরের সঙ্গে অভিন্ন রূপে মিশে আছেন। এছাড়া গ্রাম্যদেবীর মধ্যে মনসাদেবীর পূজা বীরভূমে খুব প্রচলিত। মনসা-মঙ্গলকাব্যের দ্বারাই হিন্দুসমাজে মনসাপূজা প্রচলিত হয়েছে।

বাংলায় ধর্মীয় চেতনা ও নান্দনিক অনুভূতি বিশেষভাবে প্রকাশিত হয়েছে বিভিন্ন মন্দিরগাত্রের অলঙ্করণে বীরভূমের অনেকগুলো মন্দিরের পোড়ামাটির অলঙ্করণে রামায়ণ-মহাভারত- পুরাণের দৃশ্যাবলি ও অনেক পৌরাণিক দেবী মূর্তির রূপায়ণ দেখতে পাওয়া যায়।

৬.৬ বাংলার মেয়েলি লোকাচার ও পার্বণ

বাংলার মেয়েলি ব্রতের সবচেয়ে বড়ো ব্রত হচ্ছে লক্ষ্মীব্রত। আশ্বিন পূর্ণিমায় যখন হৈমান্তিক শস্য ঘরে আসে, তখন এই ব্রত উদযাপিত হয়। এই ব্রত কোজাগরী পূর্ণিমার ব্রত রূপেও পরিচিত। আমাদের দেশে লক্ষ্মীপূজার সঙ্গে আরো একটি অনুষ্ঠান পালিত হয়। তা 'অলক্ষ্মী বিদায়' নামে পরিচিত। বাংলার গৃহস্থ বড়ো ঘরের মধ্যে লক্ষ্মীপূজার পূর্বে ঘরের বাইরে এই পূজা করা হয়। পাড়াগাঁয়ে মেয়েরা এই অলক্ষ্মী বিদায় নিজেরা করে না, পূজারি ব্রাহ্মণকে দিয়ে এই পূজা করিয়ে থাকে। এই অলক্ষ্মী হচ্ছেন অনার্যদের লক্ষ্মী বা শস্যদেবতা। এছাড়া আরো দুটি লক্ষ্মীব্রত বাংলায় প্রচলিত আছে, তার মধ্যে হরিতালক্ষ্মী ব্রত যার পূজা প্রধানত প্রথম ফাল্গুন মাসে ক্ষেতে বীজ বপনের পূর্বে করা হয়। সাধারণত এই পূজা চাষিরা করে থাকে। বাংলার মেয়েলি লোকাচার বলতে বাংলার নারীদের মধ্যে প্রচলিত সেইসব আচার- অনুষ্ঠান, লৌকিক বিশ্বাস ও পার্বণকে বোঝানো হয়, যেগুলি দীর্ঘকাল ধরে প্রজন্ম থেকে প্রজন্মান্তরে বয়ে এসেছে। এই লোকাচারগুলো মূলত লোকবিশ্বাস, আঞ্চলিক রীতিনীতি ও নারীর নিজস্ব অভিজ্ঞতাজনিত চর্চার ওপর ভিত্তি করে গড়ে উঠেছে। এই লোকাচারগুলো শাস্ত্র নির্ভর না হলেও সমাজে তাদের এক গুরুত্বপূর্ণ ধর্মীয় ও সামাজিক মূল্য রয়েছে। বাংলার নারী সমাজ মূলত পরিবারকেন্দ্রিক, নারীরা গৃহস্থালি, সন্তান জন্ম দেওয়া, তার প্রতিপালন, সাংসারিক দৈনন্দিন কাজকর্মের সঙ্গে

স্বামী ও সন্তানের সুস্থতা ও দীর্ঘায়ুর কামনায় বিভিন্ন রীতিনীতি ও আচার আচরণকে পালন করে থাকে। এইগুলিই ব্রতপালন, ঋতুপার্বণ, চুড়া গান, রান্নাবান্না প্রভৃতি আচরণের মাধ্যমে আত্মপ্রকাশ করে। এই আচারগুলোর প্রধান বৈশিষ্ট্য হল—এগুলো মৌখিকভাবে প্রচারিত হয়, এক প্রজন্ম থেকে আরও এক প্রজন্মে নারীরাই এগুলো ধারণ ও পালন করে থাকেন এবং এই আচার-আচরণগুলো নারীর গৃহস্থালি জীবনের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত। সার্বিকভাবে, মেয়েলি লোকাচার নারীদের জীবনচর্চা বিশ্বাস ও কামনার এক গুরুত্বপূর্ণ প্রতিচ্ছবি, যা বাংলার লোকসংস্কৃতির এক অবিচ্ছদ্যে অঙ্গ স্বরূপ।

বাংলার মেয়েলি লোকাচারের প্রধান অঙ্গ হচ্ছে ব্রত ও পার্বণ। বাংলায় দুই ধরনের প্রধান ব্রত প্রচলিত আছে- একটি শাস্ত্রীয় ব্রত এবং অপরটি মেয়েলি ব্রত। শাস্ত্রীয় ব্রতগুলি ধর্মীয় গ্রন্থ ও পুরোহিতদের নির্দেশনা অনুযায়ী পালিত হয়। মেয়েলি ব্রতের আবার দুটো ভাগ রয়েছে — কুমারী ব্রত, যা পাঁচ-ছয় থেকে আট-নয় বছরের মেয়েরা পালন করে এবং অপরটি নারী ব্রত, যা বড় মেয়েরা বিয়ের পর থেকে পালন করা শুরু করে।

নারী ব্রত শাস্ত্রীয় ব্রত ও খাঁটি মেয়েলি ব্রতের অনেকটা মিলিয়ে গড়ে ওঠে। এগুলি শাস্ত্রীয় এবং অশাস্ত্রীয় দুই অনুষ্ঠানের 'যুগলমূর্তি' বলা যায়। এই ব্রতগুলোতে বৈদিক অনুষ্ঠানের গভীরতা ও সজীবতা অনেকাংশে কমে যায় এবং লৌকিক ব্রতের সরলতাও নষ্ট হয়ে নতুনরূপ লাভ করে। পূজারী ব্রাহ্মণ এবং সামান্য-কাণ্ডের জটিল ক্রিয়া ও অনুষ্ঠানে ন্যাসমুদ্রা ও তন্ত্রমন্ত্র প্রাধান্য পায়। তাই এই ব্রতগুলোকে হিন্দুধর্মের সুলভ সংস্করণ বলা হয়েছে।

কুমারী ব্রতগুলোকে খাঁটি মেয়েলি ব্রতগুলোর অন্যতম রূপ। এই ব্রতগুলোর মূল লক্ষ্য ব্যাক্তিগত শুচিতা, আত্মিক উন্নয়ন, ভবিষ্যৎ সংসারজীবনের শুভকামনা ও শারীরিক তথা মানসিক প্রস্তুতি নেওয়া। এই ব্রতগুলোর গঠন হয় সাধারণ, আহরণ অর্থাৎ ব্রত করতে যা সামগ্রী লাগবে, তা সংগ্রহ করা, আচরণ অর্থাৎ কামনার প্রতিচ্ছবি, আলপনা দেওয়া পুকুর কাটা ইত্যাদি এবং কামনা জানিয়ে কামনার প্রতিকৃতিতে ফুল ধরা, শেষে যদি কোনো ব্রতকথা থাকে সেটা শুনিয়ে ব্রত সাঙ্গ করা। এতে পূজারি বা তন্ত্রমন্ত্রের কোনো স্থান নেই। যেমন পুণ্যিপুকুর ব্রত, বসুধরা ব্রত ইত্যাদি।

বাংলার নারীজগতে যে ব্রতগুলি প্রচলিত রয়েছে তা মূলত নারী কামনা সংক্রান্ত অনুষ্ঠান। বাংলার বিভিন্ন অঞ্চলে এই ব্রতগুলো ছড়িয়ে রয়েছে। মেয়েলি ব্রতগুলো খাঁটি ব্রত নয়। সেখানে কামনা যতরকম হয়, তার চরিতার্থ প্রক্রিয়া ভিন্ন হয়। যেমন — বৈশাখে পুকুরে জল না শুকায়, গরমে গাছ না মরে, এই কামনা করে পূণ্যপুকুর ব্রত পালিত হয়। এই ব্রতে পুকুর কাটা, তার মধ্যে বেলের ডাল পোঁতা, পুকুরে জল ঢেলে পূর্ণ করে বেলের ডালে ফুলের মালা ও পুকুরের চারিধারে ফুল সাজিয়ে ছড়া বলে ব্রত সাঙ্গ করা হয়। বৃষ্টির কামনা করে বঙ্গদেশে পালিত ব্রতের নাম হচ্ছে বসুধারা ব্রত, এই ব্রতে আলপনায় আটাটি তারা আঁকতে হয়। একটি মাটির ঘটে ফুটো করে বৃষ্টি অনুকরণে গাছের মাথায় জল ঢালা হয়। বৃষ্টি—ঝড়ের শেষে আত্মীয়স্বজনের বিদেশ থেকে সমুদ্র যাত্রা থেকে জলপথে বা স্থলপথে নিরাপদে বাড়ি ফেরার কামনায় পালিত ব্রত হল

ভাদুলি ব্রত। এই ব্রতে বিভিন্ন প্রতীকী চিত্রের আলপনা এঁকে ফুল ধরে কামনার উচ্চারণ করে ছড়া বলার রীতি রয়েছে। আমাদের দেশে গ্রাম্য দেবদেবীর মাহাত্ম্যপ্রচারের উদ্দেশ্যে অনেকগুলো ব্রত উদযাপিত হয়। পুত্রকামনা, সর্পভয় নিবারণ প্রভৃতি কামনা করে বাংলার মেয়েরাই এই ব্রতগুলো পালন করে থাকে। তার মধ্যে অরণ্যষষ্ঠী ব্রত , নাগপঞ্চমী ব্রত, নিত্যষষ্ঠী, সুবচনি ব্রত, শীতলা ব্রত, বুড়ঠাকুরুণ ব্রত, ঘেঁটু ব্রত, কুলাই ব্রত, মূলাই ব্রত অন্যতম। এইসব গ্রাম্যদেবতার প্রতিদ্বন্দ্বীস্বরূপ কতকগুলি শাস্ত্রীয় দেবতা এবং তাঁদের ব্রত বাংলার অঞ্চলে উদ্‌যাপিত হয়, তাঁদের মধ্যে কার্তিকের ব্রত বিশেষ উল্লেখযোগ্য। এছাড়া ব্রাহ্মণদের কিছু মনগড়া ব্রত রয়েছে, যেগুলো নৈবেদ্য ও দক্ষিণার উদ্দেশ্য পূজারিরা সৃষ্টি করেছেন। যেমন — দধিসংক্রান্তি ব্রত, কালাছড়া ব্রত, গুপ্তধন ব্রত, ঘৃত সংক্রান্তি ইত্যাদি।

বাংলার কিছু কিছু অঞ্চলে এমন বিশেষ ব্রত পালিত হয়, যা সম্পূর্ণরূপে মেয়েদের দ্বারা সৃষ্ট। যেমন, আদরসিংহাসন ব্রত। স্বামীর আদর ও সম্মান কামনা করে একজন স্বামী সোহাগিনী নারীকে সাজিয়ে গুছিয়ে এই ব্রতে পালিত হয়ে থাকে। এরই অনুরূপভাবে ব্রাহ্মণরা ব্রাহ্মণাদর ব্রত সৃষ্টি করেছেন। এছাড়া মৃতবৎসা দোষনিবারণ ও তেজস্বী বহু সন্তান লাভের উদ্দেশ্যে উদযাপিত ব্রত হচ্ছে কুহটি ব্রত। এই ব্রতটি মূলত ছোটনাগপুর অঞ্চলে পার্বত্যজাতির ব্রত। তাদের দেবী হলেন কুইটি। একসময় অহিন্দু দেবতার পূজা এই ব্রতের মাধ্যমে আমাদের সমাজে প্রচলিত ছিল। বাংলার একটি অন্যতম ব্রত হচ্ছে রালদুর্গা ব্রত। এই ব্রতের পেছনে একটি লোককথা প্রচলিত আছে। এক ব্রাহ্মণ নারায়ণের অভিশাপে কুষ্ঠরোগে আক্রান্ত হন। রাজকন্যা ইচ্ছামতী সেই ব্রাহ্মণকে বিবাহ করেন এবং শিবের বরপ্রাপ্ত হয়ে রালদুর্গা ব্রত পালন করেন। ফলে সূর্যদেবের কৃপায় ব্রাহ্মণ সুস্থ হয়ে রূপবানপুত্র লাভ করেন। এই ব্রতে সূর্য ও দুর্গা উভয়ই আছেন। এই ব্রতের মাধ্যমে নারীরা সূর্যদেবের কৃপা লাভ করে ও পরিবারের কল্যান কামনা করে থাকে। এছাড়া আরেকটি লক্ষ্মীব্রত পালিত হয় যখন অঘ্রাণ মাসে পাকা ধান ঘরে আসে। ইনি অরুণালক্ষ্মী। মেয়েরা বছরে আরও কয়েকবার লক্ষ্মীব্রত করে থাকে যেমন— ভাদ্র, কার্তিক, ও চৈত্র মাসে। এই তিনপ্রকার লক্ষ্মীব্রতই হচ্ছে বাংলার অন্যতম শস্য উৎসব। বাংলার কৃষিভিত্তিক পার্বণের মধ্যে তোষলা ব্রতটি অন্যতম। কোথাও এই ব্রতকে 'তুষ-তুষালি' বলা হয়। অঘ্রাণ সংক্রান্তি থেকে পৌষ সংক্রান্তি পর্যন্ত পুরো মাস জুড়ে প্রতিদিন সকালে মেয়েরা এই ব্রত পালন করে। এই ব্রতের ছড়াগুলোতে একটা নাটকের মতো করে গাঁথা হয়েছে। এই ধরনের গোটা মাস জুড়ে পালিত ব্রতের মধ্যে বাংলার মাঘমণ্ডলের ব্রতটিও অন্যতম। এই ব্রতানুষ্ঠানটি পৌষসংক্রান্তি থেকে আরম্ভ করে মাঘের সংক্রান্তি পর্যন্ত পালিত হয়। এই ব্রতের ছড়াগুলোকে তিনটি অঙ্কে ভাগ করা হয়। প্রথম অঙ্কে রয়েছে শীতের কুয়াশা ভেঙে সূর্যের উদয়ে শীতের পরাজয় ঘোষিত হয়। দ্বিতীয় অংশে মধুমাসের চন্দ্রকলার সঙ্গে সূর্যের বিয়ে এবং তৃতীয় অঙ্কে বসন্তের জন্ম ও মাটির সঙ্গে তার পরিণয় কল্পনার মাধ্যমে ব্রতটি একটি নাটকীয় রূপ পরিগ্রহ করে।

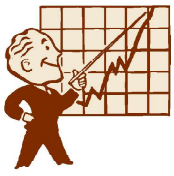
আদর সিংহাসন ব্রতের অনুরূপ একটি কুমারী ব্রত বাংলায় প্রচলিত আছে, যা হরিচরণ ব্রত রূপে পরিচিত। বৈশাখ মাসের কুমারী মেয়েরা চন্দন দিয়ে তামার টাটে হরিপাদপদ্ম লিখে বর

প্রার্থনায় এই ব্রত করে থাকে। এছাড়া কুমারী ব্রতের মধ্যে সেঁজুতি ব্রত রয়েছে, যা প্রধানত পাঁচ থেকে নয় বছরের কুমারী মেয়েরা স্বামী ও পরিবার লাভ, সপত্নী নিবারণ, সন্তান লাভের কামনা করে থাকে। কার্তিক মাসের সংক্রান্তি থেকে অগ্রহায়ণ মাসের শেষ দিন বা সংক্রান্তি পর্যন্ত প্রতিদিন বিকেলে বা সন্ধ্যায় এই ব্রত পালিত হয়।

বাংলার গ্রামীণ লোক পার্বণের মধ্যে টুসু পূজা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। পশ্চিম বাংলার পুরুলিয়া বীরভূম প্রভৃতি অঞ্চলে মাঘ সংক্রান্তি উপলক্ষে এই পার্বণ অন্যতম। এই পূজার প্রধান উপাস্য হলেন দেবী টুসু, যাকে কুমারী মেয়েদের প্রতীকরূপে পূজা করা হয়। এই পূজায় টুসুগান গাওয়া হয়, যেগুলো সামাজিক জীবন, প্রেম, সংগ্রাম ও নারীর দুঃখ-আনন্দকে কেন্দ্র করে রচিত হয়। এছাড়া রাঢ় অঞ্চলে প্রান্ত উত্তরবঙ্গের রাজবংশী নারীদের মেছেনী ব্রত বা ভেদেখেলী বা ভেদই খেলী ব্রত উল্লেখযোগ্য।

মেয়েলি ব্রতপার্বণগুলো ঠিক কোনো দেবতার পূজা নয়, এর মধ্যে ধর্মাচরণ কিছু রয়েছে, কিছু উৎসব, চিত্রকলা, নাট্যকলা, গীতকলা ইত্যাদিও রয়েছে। এইসবের সমন্বয়ে নারীর কামনার প্রতিচ্ছবি, প্রতিধ্বনি ও প্রতিক্রিয়া স্পষ্টরূপ লাভ করে । অর্থাৎ নারীর ইচ্ছাগুলো ছড়া, আলপনা, গান, নৃত্য ইত্যাদি ধর্মাচরণের মাধ্যমে আত্মপ্রকাশ করে।

বাংলার গ্রামীণ সমাজজীবনে মেয়েলি ব্রত ছিল এক সময়ের অন্যতম সামাজিক ও ধর্মীয় অনুশাসন। কিন্তু এই ব্রতগুলো শুধু ব্যক্তিগত ধর্মাচরণের বিষয় ছিল না, তা ছিল পারিবারিক কল্যাণ, সামাজিক একতা ও নৈতিক শিক্ষার প্রতীক। আধুনিকতার প্রভাবে ও ধর্মীয় প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামোয় ব্রতের স্থান অনেকটা সংকুচিত হয়ে পড়েছে। ফলে ব্রতের মধ্যে অনেক পরিবর্তন দেখা গেছে। তাই কোনটা পুজো কোনটা ব্রত এসব হিসাব মিলাতে গেলে গোলে পড়তে হয়। খাঁটি ব্রতের আদর্শগুলো মোটামুটি এই বলে নির্দেশ করা যেতে পারে যে, খাঁটি ব্রতে ব্রতীর কামনা সঙ্গে ব্রতের সমস্তটার পরিষ্কার সাদৃশ্য থাকে এবং একের কামনা অন্যের মনকে দুলিয়ে দিতে সক্ষম হয়।



অগ্রগতি নির্ধারক প্রশ্ন

৩. বাঙালির মেয়েলি লোকাচার ও পার্বণ বিষয়ে লিখুন। (২০০ শব্দের মধ্যে)



৬.৭ অধ্যায়টি পাঠ করে আমরা কী শিখলাম

লৌকিক উপাদান ও পৌরাণিকতার সংমিশ্রণে বাংলার ধর্মীয় সংস্কৃতি যে এক জটিল অথচ সৃজনশীল কাঠামোয় পরিণত হয়েছে, যা বাঙালির সামাগ্রিক জীবনধারা ও মননকে সমৃদ্ধ করে, এই অধ্যায় থেকে আমরা সে সম্পর্কে অবগত হয়েছি।

পৌরাণিক ধর্মবিশ্বাস ও উৎসব বাঙালি সমাজে ধর্মের ভিত্তিতে গড়ে ওঠা সামাজিক ঐক্য, আনন্দ ও সাংস্কৃতিক পরিচয়ের অন্যতম বাহক, এই অধ্যায় থেকে আমরা সে সম্পর্কে একটি স্পষ্ট ধারণা লাভ করেছি।

বাংলায় সংস্কৃতির স্বকীয় পরিচয় নির্মাণে লৌকিক ধর্মবিশ্বাস একটি অন্যতম উপাদান। এই অধ্যায় থেকে ধর্মীয় চেতনার দ্বারা এই সংস্কৃতি প্রজন্মের পর প্রজন্ম ধরে স্থানীয় জীবনযাত্রা, আচার অনুষ্ঠান ও বিশ্বাস ব্যবহার মাধ্যমে কী ভাবে সংরক্ষিত ও রূপান্তরিত হচ্ছে, সে সম্পর্কে শিক্ষা লাভ করতে পেরেছি।

৬.৮ অগ্রগতি নির্ধারক উত্তর-সংকেত

১. নং প্রশ্নের উত্তর: প্রাচীনকালে বাংলার ধর্মীয় জীবনের ভিত্তি ছিল মূলত লৌকিক ধর্মবিশ্বাস ও পূজাপদ্ধতি।... পল্লীর একান্ত দেবতার বা তাদের পূজাচারের মধ্যে আদিম ধর্মাচরণের নিদর্শনগুলোর মধ্যে ছিল,... তাঁদের মধ্যে অন্যতম ছিলেন ধর্মঠাকুর, দক্ষিণ রায়, পঞ্চানন, ঢেলাই চণ্ডী, বাসলী, শীতলা অন্যতম। -এভাবে সাজিয়ে লিখুন। (দ্রষ্টব্য ৬.৩ অংশ)

২. নং প্রশ্নের উত্তর: মুসলমান শাসিত বাংলায় ব্রাহ্মণ্যতন্ত্রের শৈথিল্য ঘটায় বাংলার বহু লৌকিক দেবদেবী প্রাধান্য লাভ করেছিলেন, ফলে শীতলা, বাসুলী, চণ্ডী ইত্যাদিকে হিন্দু পৌরাণিক দেবতাস্থলে শিবজায়া উমার সহিত অভিন্ন মনে করা হয়।... বাংলার পৌরাণিক ধর্ম ও সংস্কারের ভিত্তি সেনযুগে বিস্তার লাভ করেছিল।... এই উৎসবগুলোর মধ্যে নবান্ন উৎসব, পৌষ পার্বণ, চড়ক প্রভৃতি অন্যতম। -এভাবে সাজিয়ে লিখুন। (দ্রষ্টব্য ৬.৪ অংশ)

৩. নং প্রশ্নের উত্তর: বাংলার মেয়েলি ব্রতের সবচেয়ে বড় ব্রত হচ্ছে লক্ষ্মীব্রত।... সার্বিকভাবে, মেয়েলি লোকাচার নারীদের জীবনচর্চা বিশ্বাস ও কামনার এক গুরুত্বপূর্ণ প্রতিচ্ছবি, যা বাংলার লোকসংস্কৃতির এক অবিচ্ছেদ্যে অঙ্গস্বরূপ।... কুমারী ব্রতগুলোকে খাঁটি মেয়েলি ব্রতগুলোকে অন্যতম... তার মধ্যে অরণ্যষষ্ঠী ব্রত, নাগপঞ্চমী ব্রত, নিত্যষষ্ঠী, সুবচনি ব্রত, শীতলা ব্রত, বুড়ঠাকুরুণ ব্রত, ঘেঁটু ব্রত , কুলাই ব্রত, মূলাই ব্রত অন্যতম। -এভাবে সাজিয়ে লিখুন। (দ্রষ্টব্য ৬.৬ অংশ)

৬.৯ অতিরিক্ত পঠন

আহমেদ, ড. ওয়াকিল (১৯৬৫ ইং); বাংলার লোক-সংস্কৃতি; ঢাকা: বাংলা একাডেমী

ঠাকুর, অবনীন্দ্রনাথ (১৩৫০ বং); বাংলার ব্রত; কলিকাতা : বিশ্বভারতী

ভট্টাচার্য, আশুতোষ (২০১৭); বাংলার লোক সংস্কৃতি (৭তম সং) কলকাতা : ন্যাশনাল বুক ট্রাস্ট

রায়, নীহাররঞ্জন (১৯৯৩); বাঙ্গালীর ইতিহাস (আদি পর্ব) কলকাতা: দে'জ পাবলিশিং

সেনগুপ্ত, পল্লব (১৯৫৯ ইং); লোকসংস্কৃতির সীমানা ও স্বরূপ; কলকাতা: পুস্তক বিপণি

সরকার, সঞ্জীব ও অরুণকুমার রায় সম্পাদনা (১৯৮০ ইং); লোকায়ত সংস্কৃতি: উইলিয়াম কেরী কলকাতা: স্টাডি আন্ড রিসার্চ সেন্টার

সুর, ড. অতুল (২০ ১৭); বাংলা ও বাঙালির বিবর্তন; কলকাতা: সাহিত্যলোক



৬.১০ আদর্শ প্রশ্নাবলি

(ক) বাংলার লৌকিক ধর্মবিশ্বাস কী? বাঙালির সামাজিক ও সাংস্কৃতিক জীবনে এই বিশ্বাস কীভাবে প্রতিফলিত হয়েছে আলোচনা করুন।

(খ) বাঙালির ধর্মীয় চেতনার বহুমাত্রিক প্রকাশ কোন কোন মাধ্যমে ঘটেছে উদাহরণসহ আলোচনা করুন।

(গ) বাংলা ও বাঙালি সমাজে নারীর ব্রত পালনের সামাজিক ও সাংস্কৃতিক তাৎপর্য আলোচনা করুন।

(ঘ) বাংলার গ্রামীণ সমাজে ধর্মীয় বিশ্বাস ও আচার অনুষ্ঠানের পারস্পরিক সম্পর্ক ব্যাখ্যা করুন।

(ঙ) ধর্মীয় জীবনে নারীর ভূমিকা সম্পর্কে আলোচনা করুন।

(চ) বাংলার মেয়েলি ব্রতগুলো নারীর মানসিক পরিপূর্ণতার প্রতিফলন--- মন্তব্যটির সাপেক্ষে নিজস্ব অভিমত আলোচনা করুন।

অধ্যায় ৭ : চৈতন্যদেব ও বাংলার সংস্কৃতি

বিন্যাস ক্রম

৭.১ জ্ঞাতব্য বিষয়
৭.২ অধ্যায় পরিচিতি
৭.৩ চৈতন্যদেব ও বাংলার সামাজিক রূপান্তর
৭.৪ চৈতন্যদেবকেন্দ্রিক বৈষ্ণবীয় সমাজের সংক্ষিপ্ত পরিচয়
৭.৫ বিভিন্ন কীর্তন ঘরানা
৭.৬ খেতুরী উৎসব
৭.৭ অধ্যায়টি পাঠ করে আমরা কী শিখলাম
৭.৮ অগ্রগতি নির্ধারক উত্তর-সংকেত
৭.৯ অতিরিক্ত পঠন
৭.১০ আদর্শ প্রশ্নাবলি

৭.১ জ্ঞাতব্য বিষয়

এই অধ্যায়টি পাঠ করে আপনি ষোড়শ শতকের নবজাতকের অন্যতম পুরোধা চৈতন্যদেবের সম্পর্কে জ্ঞান লাভ করতে পারবেন। বাংলার রাষ্ট্রিক ও সামাজিক পটভূমিতে চৈতন্যদেবের প্রভাব সম্পর্কে জানতে পারবেন।

বাংলা ধর্মীয় সমাজে চৈতন্যদেবকেন্দ্রিক যে বৈষ্ণব ধর্মের প্রবর্তন হয়েছিল তার সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত জ্ঞান আহরণ করা যাবে । বৈষ্ণব ধর্মের বিভিন্ন কীর্তন ঘরানা এবং খেতুরী উৎসব সম্পর্কে জানতে পারবেন।

৭.২ পরিচিতি

- প্রথমেই আমরা চৈতন্যদেবের আবির্ভাব এবং বাংলা সমাজের তার প্রভাব সম্পর্কে জানার চেষ্টা করা হবে।
- চৈতন্যদেবকে কেন্দ্র করে কীভাবে বাংলায় এক বৈষ্ণবীয় সমাজের সৃষ্টি হয়েছিল তার সংক্ষিপ্ত রূপ আলোচিত হবে।
- চৈতন্যদেব সৃষ্টি বিভিন্ন কীর্তন ঘরানার সঙ্গে পরিচিতি ঘটবে।
- বৈষ্ণব সমাজের এক বিখ্যাত উৎসব খেতুরী উৎসব সম্পর্কে জানা সম্ভব হবে।

৭.৩ চৈতন্যদেব এবং বাংলার সামাজিক রূপান্তর

পঞ্চদশ শতকের ১৪৮৬ খ্রিস্টাব্দ মহাপ্রভু চৈতন্যদেবের জন্ম এবং ১৫৩৩ খ্রিস্টাব্দে তাঁর মহাপ্রস্থান। ষোড়শ শতকের অন্যতম পুরোধা ব্যক্তিত্ব হিসাবে মানবতার প্রতিমূর্তি হয়েই বাংলার

সমাজ জীবনে তাঁর আবির্ভাব। ফাল্গুন মাসে দোল পূর্ণিমায় নবদ্বীপ ধামে এক ব্রাহ্মণ পরিবারে তিনি জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতা ছিলেন জগন্নাথ মিশ্র, মাতা শচী দেবী। শ্রীচৈতন্যের নাম ছিল বিশ্বম্ভর, ডাকনাম নিমাই। শৈশব থেকেই তিনি মেধাবী ও চঞ্চল। অল্পবয়সেই তিনি শাস্ত্রবিদ্যায় পারদর্শী হয়ে ওঠেন এবং চঞ্চল স্বভাবে টোলের পড়ুয়াদের জ্বালাতন করতে শুরু করেন।

প্রথম স্ত্রী লক্ষ্মীপ্রিয়া মৃত্যুর পর মায়ের অনুরোধে নিমাই দ্বিতীয়বার বিয়ে করেন বিষ্ণুপ্রিয়াকে। বিয়ের কিছুদিন পরই তিনি পিতৃ কৃত্য সম্পাদন করতে গয়া যান এবং সেখানেই তিনি নবজীবনের সাক্ষাৎ পান। তখন থেকেই ভক্তি প্রেমে পাগল বিশ্বম্ভর নবদ্বীপে ভাগবত পাঠ, হরি সংকীর্তন প্রভৃতি নিয়ে মেতে ওঠেন।

তার সঙ্গী হলেন নিত্যানন্দ ও হরিদাস। এরপর ২৪ বছর বয়সে কাটোয়ার কেশব ভারতীর কাছে সন্ন্যাস গ্রহণ করে নিমাই হলেন শ্রীচৈতন্য। সন্ন্যাস গ্রহণ করে প্রথমেই মহাপ্রভু পুরি ধামে যান। এরপর তীর্থ পর্যটনে তিনি মহারাষ্ট্র, দাক্ষিণাত্য, গুজরাট, বৃন্দাবন,শান্তিপুর, গৌড়, রামকেলি হয়ে পুনরায় ফিরে আসেন। সেই রামকেলিতে সুলতান হুসেন শাহের মন্ত্রী দবির খাস সনাতন গোস্বামী ও সাফর মল্লিক (রূপ গোস্বামী) শ্রীচৈতন্যের সান্নিধ্যে এসে বৈষ্ণব ধর্ম গ্রহণ করেন। এইভাবে ভারতবর্ষের বৃহত্তর জীবনধারার সঙ্গে চৈতন্যদেবের যেমন যোগাযোগ ঘটলো তেমনি তাঁর সান্নিধ্যে এসে তাঁর জীবন দর্শন ও প্রেম ধর্মের দ্বারা বাঙালির সামাজিক জীবন অনুপ্রাণিত হয়ে উঠল।

চৈতন্যদেব যখন আবির্ভূত হন তখন বাংলার রাষ্ট্রিক ও সামাজিক পটভূমি ছিল অন্ধকারময়। তুর্কি বিজয়ের অভিযানে তখন বাঙালি জাতি সমাজ দিশেহারা। আবার অন্যদিকে হিন্দু সমাজে তখন প্রবল ধর্মান্তকরণের চাপ। আর ঠিক তখনই কৃষ্ণ নামে মাতোয়ারা করে জাতিকে নতুনভাবে বেঁচে ওঠার স্বপ্ন দেখালেন যিনি -তিনিই চৈতন্যদেব।

যুগের প্রয়োজনে সমাজেই তাঁকে অবতার হিসেবে প্রতিষ্ঠা দেয়। মুসলমান শাসকের অত্যাচারে যখন উচ্চবর্ণ ও নিম্ন বর্ণের বাঙালি হিন্দুদের মধ্যে ঈর্ষা দ্বন্দ্ব দেখা দেয়, তখনই চৈতন্যদেবের মত সকলকে বুকে টেনে নেবার মতো অবতারের অপেক্ষায় ছিলেন মানুষ।

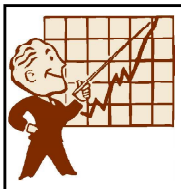
হিন্দুদের মধ্যে অস্পৃশ্য শ্রেণির মানুষের সাথে শ্রীচৈতন্যদেব সম্পর্ক স্থাপন করেছিলেন। তার জীবন কাব্যে পাওয়া যায়, খোলাবেচা শ্রীধর, যবন হরিদাস- এদের তিনি মানুষের মর্যাদা দিয়েছিলেন। বিভিন্ন অন্ত্যজ পল্লীতে ছিল তার অবাধ যাতায়াত। হিন্দু ধর্মের রক্ষণশীল রীতিনীতি থেকে তিনি মানুষকে এক মহামূর্তির দিকে টেনে এনেছিলেন। ব্রাহ্মণ্য ধর্মের অবহেলায় তখন তথাকথিত অন্ত্যজ শ্রেণি আত্মরক্ষা ও সামাজিক প্রতিষ্ঠার কারণে দলে দলে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করছিল। চৈতন্য প্রবর্তিত ধর্ম তাদের এক নতুন ধর্মের সন্ধান দিল। যেখানে বিদ্বেষ নেই আছে পারস্পারিক প্রীতি ও মিলনের পরিবেশ।

প্রচলিত নাম সংকীর্তন ছিল তার সমাজ সংস্কারের একটি বিশেষ দিক। ফুল ও মন্দিরা বাদ্যের সহযোগে তিনি যে প্রেম নাম মানুষের কণ্ঠে পৌঁছে দিয়েছিলেন, তা বাঙালি সমাজ জীবনে দীর্ঘদিনের ক্লেদকে ধুয়ে দিয়েছিল। মুসলমান শাসকের অত্যাচারে উৎপীড়িত বাঙালি

হিন্দুরা চৈতন্যকেই রক্ষাকবচ হিসাবে গ্রহণ করেছিল। হিন্দু ধর্মের অবক্ষয় রোধে নিত্যানন্দকে তিনি বলেছিলেন-

'মূর্খ নিচ পতিত দুঃখিত যত জন
ভক্তি দিয়া কর গিয়া সভার মোচন।'

পরবর্তীকালে রামকৃষ্ণ, বিবেকানন্দ, রবীন্দ্রনাথও চৈতন্যের আদর্শে ও ভাবনায় অনুপ্রাণিত হয়েছিলেন। সমস্ত ভেদাভেদ ত্যাগ করে সামাজিক সাম্যের দ্বারা মানবিক মূল্যবোধকে জাগ্রত করাই ছিল চৈতন্যদেবের সমাজ সংস্কারে মূল সাধনা। চৈতন্যের এই সর্বমানবিক প্রেম ধর্মের জোয়ারে হিন্দু ও মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের মানুষ সমস্ত সংকীর্ণতাকে ত্যাগ করেছিল। এসেছিল এক ভক্তি প্রেমের প্লাবন। এইভাবে চৈতন্যদেব তাঁর জীবন ও আদর্শ দিয়ে সমাজে এক বিপ্লবের বন্যা এনেছিলেন যাতে তিনি মানুষের মনে চিরদিন প্রতিষ্ঠিত থাকবেন।



অগ্রগতি নির্ধারক প্রশ্ন

১. চৈতন্যদেবের জীবন ও কৃতিত্ব সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত আলোচনা করুন। (১০০ শব্দের মধ্যে)

৭.৪ চৈতন্যদেবকেন্দ্রিক বৈষ্ণবীয় সমাজের সংক্ষিপ্ত পরিচয়

চৈতন্যদেব মাত্র আটচল্লিশ বছর বেঁচে ছিলেন। বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের কথা তিনি ভেবেছিলেন বটে। কিন্তু ধর্মমত প্রচারের জন্য তিনি কোন গ্রন্থ লিখে যাননি। তাঁর ধর্মমত ও সাধনার প্রচার করেছিলেন তাঁর অনুচর ও পারিষদের দল। গৌড়ে তাঁর মতাদর্শ প্রচারিত হয়েছিল শান্তিপুরের অদ্বৈত আচার্যের দ্বারা। পরবর্তীতে এই শান্তিপুর বৈষ্ণব কেন্দ্রে পরিণত হয়।

চৈতন্যদেব সহ তার ৫ পরিকরকে স্বরূপ দামোদর পঞ্চতত্ত্ব রূপে আখ্যাত করেছিলেন। চৈতন্য লীলার মুখ্য পরিকর হলেন নিত্যানন্দ, অদ্বৈত, গদাধর এবং শ্রীনিবাস। শ্রীচৈতন্যকে নিয়ে পাঁচ। নিত্যানন্দের সঙ্গে শ্রীচৈতন্যের সাক্ষাৎ হওয়ার পরে তিনি নিত্যানন্দকে ভক্তি ধর্ম প্রচারের জন্য পাঠান। মহাপ্রভুর নামাঙ্কিত বৈষ্ণব ধর্মের আবরণী নিত্যানন্দের অধীনে এক বিরাট বৈষ্ণব সমাজ গঠিত হয়। ভক্তি ধর্ম প্রচারের জন্য মহাপ্রভুর দ্বিতীয় অন্তরঙ্গ সহায় হলেন অদ্বৈত আচার্য। কৃষ্ণের সঙ্গে একাত্ম হওয়ার জন্য তাকে অদ্বৈত এবং ভক্তি প্রচারে 'আচার্য' বলা হয়।

পঞ্চতত্ত্বের ব্যাখ্যায় গদাধর পণ্ডিতকে বলা হয়েছে ভক্তিশক্তি। তিনি নবদ্বীপের অধিবাসী এবং শ্রীচৈতন্যের বন্ধু ছিলেন। শ্রীচৈতন্যের সন্ন্যাস গ্রহণের পর গদাধর সংসার ত্যাগ করেন শ্রী চৈতন্যের নিত্য সঙ্গী হয়েছিলেন। চৈতন্য ভাগবতে বলা হয়েছে-

'আপনে চৈতন্য বলিয়াছে বারে বার
গদাধর মোর বৈকুণ্ঠের পরিবার।'

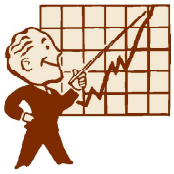
পঞ্চতত্ত্বে শ্রীবাসকে ভক্তিরূপে স্থান দেওয়া হয়েছে। নবদ্বীপ লীলা পরিকরদের মধ্যে শ্রীবাস ছিলেন অতুলনীয় চরিত্রের অধিকারী। শ্রীবাসের গৃহ সব সময় ভক্ত সমাবেশ ও নৃত্য কীর্তনে মুখরিত থাকত। চৈতন্য পরিকরের মধ্যে তিনি ছিলেন ভক্তের আঁধার স্বরূপ।

মহাপুরুষরা পৃথিবীতে কখনো একা আসেন না। তাঁরা তাঁদের আদর্শকে সমাজে ছড়িয়ে দেওয়ার জন্য নিয়ে আসেন কিছু প্রচারক। উল্লেখ করতে হয় চৈতন্য প্রবর্তিত বৈষ্ণব ধর্মের প্রচারক বৃন্দাবনের ষড় গোস্বামীর কথাও। যাঁরা বৈষ্ণব সমাজে ও বাইরে মহাপ্রভু প্রবর্তিত ভক্তি ধর্মের ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ ও প্রচারের সংযুক্ত ছিলেন।

শ্রীচৈতন্যের ভক্তি ধর্ম প্রচারে কেন্দ্র ভূমি ছিল বৃন্দাবন। এই বৃন্দাবনে ছয় গোস্বামীর প্রচেষ্টায় ভক্তি ধর্ম ব্যাপক প্রচার লাভ করে। তাঁরা অত্যন্ত দীনভাবে বৃন্দাবনে বাস করতেন। তাঁদের জীবনাদর্শ, দর্শন ও সাহিত্য গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্মের ভিত্তি স্থাপনে সক্ষম হয়েছিল। এই ষড় গোস্বামীরা হলেন-সনাতন গোস্বামী, রূপ গোস্বামী, জীব গোস্বামী, রঘুনাথ ভট্ট, রঘুনাথ দাস এবং গোপাল ভট্ট। কৃষ্ণদাস কবিরাজ তাঁর চৈতন্যচরিতামৃতে তাঁদের কথা উল্লেখ করেছেন-

"শ্রীরূপ সনাতন আর ভট্ট রঘুনাথ ।
শ্রীজীব গোপাল ভট্ট দাস রঘুনাথ।।
এই ছয় গোসাই করি চরণ বন্দন।
যাহা হইতে বিঘ্ন নাশ অভীষ্টপূরণ।।"

চৈতন্যদেব কেন্দ্রিক এই বৈষ্ণব সমাজ নিঃসন্দেহে বৈষ্ণব আন্দোলনকে বাংলার সর্বত্র এবং বাংলার বাইরে বিস্তার লাভ করার সুযোগ করে দিয়েছিলেন



অগ্রগতি নির্ধারক প্রশ্ন

২. পঞ্চতত্ত্বের নাম উল্লেখ করে তাঁদের অবদান বিষয়ে লিখুন। (১০০ শব্দের মধ্যে)

৭.৫.০ বিভিন্ন কীর্তন ঘরানা

'কীর্তন' শব্দের আভিধানিক অর্থ হল প্রশংসা, বন্দনা, স্তুতিগান, যশগান, নামগান ইত্যাদি। সুকুমার সেনের মতে 'কীর্তন' মানে ভগবানের কীর্তি গান। শ্রীচৈতন্যদেব প্রচারিত কৃষ্ণ নামের কীর্তনে বাঙালি জাতি এক নতুন জীবন লাভ করেছিল এক কথায় অনস্বীকার্য। এই কীর্তন পদ্ধতির অত্যন্ত সহজ সরল। কোন মন্ত্র কিংবা শাস্ত্রপাঠ তাতে নেই। সমাজের যেকোনো মানুষের মুচি, মেথর, শূদ্র সবাই এই কীর্তনের মধ্যে প্রেম বিবর্তন করতে পারে। ক্রমে এই কীর্তন সঙ্গীতের রূপ নেয়। বিষয় এবং প্রয়োগের ক্ষেত্রে নয় ধরনের কীর্তনের প্রচলন পাওয়া যায়। যেমন- বন্দনা কীর্তন, প্রার্থনা কীর্তন, আরতী কীর্তন, অধিবাস কীর্তন, সূচক কীর্তন, নাম কীর্তন,

পদাবলি কীর্তন এবং লীলা বা পালা কীর্তন। এই নানাবিধ কীর্তনের মধ্যে পদাবলি ও লীলা কীর্তন বহুল জনপ্রিয়। এছাড়া চৈতন্যদেব প্রচারিত যে প্রেমধর্মে সংকীর্তন, পরবর্তীতে তা হরিনাম বা কৃষ্ণ নামের পরিবর্তে শ্রীচৈতন্য-নিত্যানন্দের নাম অবলম্বনে কীর্তন গানের রীতিতেও প্রচলিত হয়েছে।

৭.৬ খেতুরী উৎসব

গঙ্গা তীরোবর্তী একটি গ্রামের নাম খেতুরি। চৈতন্য ভক্ত নরোত্তম দাস দত্তের জন্ম এই গ্রামে। পৈতৃক জমিদারি থাকলেও নরোত্তম এসবে আকৃষ্ট ছিলেন না। গ্রামে ক্ষুদ্র কুটির নির্মাণ করে তিনি ধর্ম সাধনায় মনোনিবেশ করেছিলেন। নরোত্তমের কনিষ্ঠ ভ্রাতা সন্তোষ দত্ত, সাধু চরিত্র জ্যৈষ্ঠ ভ্রাতার প্রীতি সম্পাদনের জন্য খেতুরী গ্রামে বিশাল মন্দির নির্মাণপূর্বক রাধা কৃষ্ণ গৌরাঙ্গ প্রভৃতি ছটি বিগ্রহ প্রতিষ্ঠা করেন। শ্রীনিবাসের তত্ত্বাবধানে বৈষ্ণব সম্মেলন ও আনন্দ উৎসব অনুষ্ঠিত হয় তাই 'খেতুরী মহোৎসব' রূপে ইতিহাসে বিখ্যাত হয়ে আছে। এই উৎসব আরম্ভের সাঠিক তারিখ জানা যায় না। অনুমান করা হয় ১৫৮০ খ্রিস্টাব্দে এর সূচনা। গৌড়-বঙ্গ- উৎকলের সমস্ত চৈতন্যপন্থী আচার্য ও ভক্তদের সমাগম ঘটেছিল এই উৎসবে। বৈষ্ণব মতাদর্শের প্রচার এবং পরস্পর ভাব বিনিময়ের মাধ্যমে সংঘের শক্তি বৃদ্ধি সর্বোপরি ব্রাহ্মণ সমাজে বর্ণ প্রথার বিরোধিতা করতে এই উৎসব ভীষণভাবে কার্যকরী হয়েছিল।



৭.৭ অধ্যায়টি পাঠ করে আমরা কী শিখলাম

- ষোড়শ শতকের নবজাগরণের অন্যতম পুরোধা চৈতন্যদেব মধ্যযুগীয় বাংলার একমাত্র সমাজ সংস্কারক।
- চৈতন্যদেবের পাশাপাশি বৈষ্ণব সমাজের প্রচারক ছিলেন তাঁর পাঁচ পরিকর এবং বৃন্দাবনের ষড়গোস্বামী।
- চৈতন্য প্রচারিত বিভিন্ন কীর্তন ঘরানা রয়েছে বাংলায়। যা ভক্তি ধর্মের প্রচারে সহায়ক হয়েছিল।
- বৈষ্ণব ঘরানার এক উল্লেখযোগ্য উৎসব খেতুরী মহোৎসব।

৭.৮ অগ্রগতি নির্ধারক প্রশ্নের উত্তর সংকেত

১. নং প্রশ্নের উত্তর: পঞ্চদশ শতকের ১৪৮৬ খ্রিস্টাব্দ মহাপ্রভু চৈতন্যদেবের জন্ম.. হিন্দুদের মধ্যে অস্পৃশ্য শ্রেণির মানুষের সাথে শ্রীচৈতন্যদেব সম্পর্ক স্থাপন করেছিলেন... এইভাবে চৈতন্যদেব তাঁর জীবন ও আদর্শ দিয়ে সমাজে এক বিপ্লবের বন্যা এনেছিলেন যাতে তিনি মানুষের মনে চিরদিন প্রতিষ্ঠিত থাকবেন। -উত্তরটি এভাবে নির্মাণ করুন। (দ্রষ্টব্য ৭.৩)

২. নং প্রশ্নের উত্তর: চৈতন্যদেব সহ তার ৫ পরিকরকে স্বরূপ দামোদর পঞ্চতত্ত্ব রূপে

পরিচিত করেছিলেন।... চৈতন্য পরিকরের মধ্যে তিনি ছিলেন ভক্তের আঁধার স্বরূপ। -এভাবে উত্তর নির্মাণ করতে হবে। (দ্রষ্টব্য ৭.৪)



৭.৯ অতিরিক্ত পঠন

আচার্য্য, ড. দেবেশ কুমার (২০১৮); বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস, কলকাতা : ইউনাইটেড বুক এজেন্সি

চৌধুরী, যজ্ঞেশ্বর (১৯৮৭); চৈতন্য সংস্কৃতিতে কীর্তনের ভূমিকা;কলকাতা : নবদ্বীপ পুরাতত্ত্ব পরিষদ

জানা ড: শ্রীমন্ত কুমার (২০০৫); বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস, প্রাচীন ও মধ্যযুগ; কলকাতা : ওরিয়েন্টাল বুক কোম্পানি প্রাইভেত লিমিটেড

বন্দোপাধ্যায়, অসিতকুমার (২০১৬-২০১৭); বাংলা সাহিত্যের সম্পূর্ণ ইতিবৃত্ত; কলকাতা : মডার্ণ বুক এজেন্সী প্রাইভেট লিমিটেড

সেন সরকার (২০১৭); মঞ্জুবাণী, চৈতন্যদেবের প্রেম ধর্ম ও নবজাগরণ; কলকাতা : নয়া বুক



৭.১০ আদর্শ প্রশ্নাবলি

১. বাংলার সামাজিক রূপান্তরের ক্ষেত্রে চৈতন্যদেবের অবদান আলোচনা করুন ।

২. বৈষ্ণব সমাজের প্রবর্তনে চৈতন্যদেবের ভূমিকা নিরূপণ করুন ।

৩. চৈতন্যদেব প্রবর্তিত বিভিন্ন কীর্তন ঘরানার উল্লেখ করুন।

৪. টীকা লিখুন— খেতুরী উৎসব।

অধ্যায় ৮ : তুর্কি আক্রমণ ও নবাবি আমল

অধ্যায় বিন্যাস

৮.১ জ্ঞাতব্য বিষয়
৮.২ পরিচিতি
৮.৩ তুর্কি আক্রমণ ও তার প্রতিফলন
৮.৪ বাংলার নবাবি আমল ও বঙ্গীয় সমাজ-সংস্কৃতি
৮.৫ অধ্যায়টি পাঠ করে আমরা কী শিখলাম
৮.৬ অতিরিক্ত পঠন
৮.৭ অগ্রগতি নির্ধারক উত্তর-সংকেত
৮.৮ আদর্শ প্রশ্নাবলি

৮.১ জ্ঞাতব্য বিষয়

এই অধ্যায়টি পড়ে আপনি —

- বঙ্গে তুর্কি আক্রমণের ঘটনা এবং তার ফলশ্রুতি কী হয়েছিল, সেটা জানবেন।
- তুর্কি আক্রমণে বাংলার সমাজ ও সংস্কৃতিতে কী ধরনের পরিবর্তন এনেছিল, তা বুঝতে পারবেন।
- খিলজি বংশ ও নবাবি আমলে বাংলার শাসন ব্যবস্থার একটি রূপরেখা তৈরি করতে পারবেন।
- নবাবি আমলে বাংলার সমাজ ও সংস্কৃতিচর্চার অবস্থানকে বিশ্লেষণ করতে পারবেন।

৮.২ পরিচিতি

বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস আলোচনায় সমাজ ও সংস্কৃতির একটি গুরুত্বপূর্ণ অবদান আছে। কারণ সমাজ-ইতিহাসের বিবর্তন নানা রূপে সাহিত্যের শরীরে দেখা দেয়। সেজন্য বাংলা সাহিত্যের গতিপ্রকৃতিকে বুঝতে হলে সমাজ ও সংস্কৃতির বিবর্তনকে জানতে হয়। বঙ্গদেশে দ্বাদশ শতকের শেষভাগে তুর্কি আক্রমণ যে সামাজিক, সাংস্কৃতিক, অর্থনৈতিক বিবর্তনের সূচনা করেছিল তার গুরুত্ব অপরিসীম। সেই প্রথম বৈদেশিক শক্তির দ্বারা আক্রান্ত তথা শাসিত হওয়া শুরু করল বঙ্গদেশ। ফলে সমাজ-সংগঠন, আচার-আচরণ, পোষাক-পরিচ্ছদ, খাদ্যাভ্যাস, ভাষা ব্যবহার, ধর্মাচরণ ইত্যাদি সব কিছুতেই সময়োপযোগী পরিবর্তন সাধিত হয়েছিল। তেমনই আবার অষ্টাদশ শতকের সূচনায় বাংলার শাসন ব্যবস্থায় পরিবর্তন এসেছিল নবাব মুরশিদ কুলি খাঁর আমলে। এই পরিবর্তনটাও বাংলার সমাজ ও সংস্কৃতিতে গভীর ছাপ রেখে গিয়েছে। তুর্কিদের শাসনে বাংলার যে অবনতি হয়েছিল ইলতুতমিস-হোসেন শাহ হয়ে বাংলার স্বাধীন নবাবদের আমলে তার অবস্থান্তর ঘটে। কী ধর্মাচরণে, কী ব্যবসা-বাণিজ্যে, কী সমাজ-ব্যবস্থায় একটি সদর্থক

পরিবর্তন ঘটতে দেখা যায়। এমনকী দৈনন্দিন কথাবার্তা বা কাজকর্মের ভাষাতেও নানা বিবর্তন আসে — বাংলা ভাষা কৃতঋণ শব্দে সমৃদ্ধ হয়ে ওঠে। সমাজ ও সংস্কৃতির এই বিবর্তনের একটা সামগ্রিক রূপরেখা আপনাদের কাছে তুলে ধরাই বর্তমান অধ্যায়ের মূল উদ্দেশ্য।

৮.৩ তুর্কি আক্রমণ ও তার প্রতিফলন

বাংলা বা বঙ্গদেশের সমাজ ও সংস্কৃতি যে-সব পরিঘটনার হাত ধরে ধীরে ধীরে গড়ে উঠেছে, তুর্কি আক্রমণ তাদের মধ্যে অন্যতম। সুতরাং এই 'তুর্কি আক্রমণ' বিষয়টি কী, কাদের তুর্কি বলছি, কবে এবং কোথায় এই আক্রমণ হয়েছিল, কেন আমরা একে গুরুত্ব দিচ্ছি, সেই কথাগুলো আপনাদের জানা প্রয়োজন।

৮.৩.১ তুর্কি আক্রমণের কাল, বঙ্গাধিপতি ও আক্রমণকারীর পরিচয়

বঙ্গদেশে তুর্কি আক্রমণের প্রায় পঞ্চাশ বছর পর দিল্লির সুলতান নাসিরুদ্দিন মাহমুদের আদেশে পারস্যের প্রখ্যাত ইতিহাসবিদ মিনহাজউদ্দিন 'তবকাত-ই-নাসিরি' নামে একটি গ্রন্থ লেখেন যেখানে বঙ্গদেশে তুর্কিবিজয়ের বিস্তৃত বিবরণ আছে। এই বিবরণ অনুযায়ী, তুর্ক জাতীয় যুদ্ধব্যবসায়ী মুহম্মদ বখতিয়ার খিলজি বারো শতকের শেষদিকে (১১৯৯ সাল) মূলত সম্পদ লুণ্ঠনের জন্য বিহার প্রদেশ আক্রমণ ও দখল করেন। তারপর সামরিক শক্তি বাড়িয়ে ১২০২ সাল নাগাদ বিনা বাধায় বঙ্গদেশের নদীয়া ও পার্শ্ববর্তী অঞ্চল অধিকার করে নেন। এইভাবে বখতিয়ার খিলজির বঙ্গদেশ আক্রমণ ও অঞ্চল অধিকারের ঘটনাটিই বঙ্গদেশের সামাজিক ইতিহাসে 'তুর্কি আক্রমণ' হিসাবে পরিচিত। বঙ্গদেশে তখন সেনবংশের রাজত্বকাল চলছে এবং বঙ্গাধিপতি হিসাবে লক্ষ্মণ সেন (মিনহাজের বিবরণ অনুযায়ী রায় লখমনিয়া) তখন নদীয়াতে অবস্থান করছিলেন। যেদিন এই আক্রমণ হয় সেদিন বখতিয়ার অশ্ব-ব্যবসায়ীর ছদ্মবেশে নগরে আঠারো, মতান্তরে সতেরো জন বিশ্বস্ত যোদ্ধা নিয়ে নদীয়া নগরে প্রবেশ করেছিলেন এবং এতটাই অতর্কিতে আক্রমণ করেছিলেন যে রাজা লক্ষ্মণ সেন গোপনে পূর্ববঙ্গে পালিয়ে যেতে বাধ্য হন। বিপর্যয় নেমে আসে বঙ্গের জনজীবনে। অবাধ লুণ্ঠনে, নারকীয় হত্যালীলায়, যথেচ্ছ ধ্বংসাত্মক ক্রিয়াকর্মে চারদিকে অরাজকতা নেমে আসে।

৮.৩.২ বঙ্গে তুর্কি আক্রমণের পরবর্তী পর্যায় ও বখতিয়ার খিলজির পরিণতি

বখতিয়ার খিলজি নদীয়া বিজয় ও লুঠ শেষ করে লক্ষ্মণাবতী বা গৌড়ের দিকে যাত্রা করেন। এবং প্রায় বিনা বাধায় গৌড় জয় করে লক্ষ্মণাবতীতে রাজধানী স্থাপন করেন। কিছুদিনের মধ্যেই দশহাজার সৈন্য নিয়ে তিনি আরও পূর্বদিকে যাত্রা করেন, উদ্দেশ্য ছিল তিব্বত আক্রমণ করা। উত্তরপূর্ব দিকে অগ্রসর হয়ে বরেন্দ্রভূমি জয়ের পর বর্ধনকোট নামক জায়গায় পৌঁছন। এখান থেকে আরও দশদিন পথ চলে একটি পাথরের সেতুর সামনে পৌঁছান। এটি কামরূপ রাজ্যের শিলসাঁকো। কামরূপ রাজ পৃথু বখতিয়ার খিলজিকে সেসময় তিব্বত আক্রমণ থেকে

বিরত থাকতে বলেন। এমনকী পরের বছর এলে তিনি তিব্বত আক্রমণে তাঁকে সাহায্য করার প্রতিশ্রুতিও দিয়েছিলেন। কিন্তু খিলজি তা না মেনে অগ্রসর হন। ১২০৬ খৃষ্টাব্দে স্থানীয় সৈন্যদের নিয়ে পৃথু বখতিয়ারকে বাধা দেন। পাহাড়ি যুদ্ধে বখতিয়ারের সেনারা বিশেষ সুবিধা করতে না পেরে পালাতে শুরু করে। প্রায় দশহাজার সৈন্য কামরূপের সেনাদের হাতে মারা পড়ে। বখতিয়ারও আহত অবস্থায় পালিয়ে আসেন এবং দেবকোটে অবস্থান করতে থাকেন। সেখানে রোগাক্রান্ত অবস্থায় তাঁর মৃত্যু হয়। পৃথুর হাতে বখতিয়ারের এই পরাজয়ের বিবরণ উত্তর গুয়াহাটির কানাইবরশি প্রত্নতাত্ত্বিক শিলাখণ্ডে খোদিত আছে।

৮.৩.৩ বঙ্গে তুর্কি আক্রমণের ফলশ্রুতি

তুর্কি আক্রমণের মতো নিষ্ঠুর হত্যালীলা, দৈহিক ও মানসিক পীড়ন তথা অত্যাচারের অভিজ্ঞতা এর আগে কখনই বঙ্গদেশে দেখা যায়নি। এর আগে বঙ্গদেশে কোনো বিদেশী শক্তির এতটা ব্যাপক আক্রমণ হয়নি। গুপ্ত-পাল-সেন ইত্যাদি আমলে রাজশক্তির উত্থান-পতন হলেও সাধারণ প্রজার জীবনযাত্রা মোটামুটি নির্বিঘ্নই ছিল। ভারতবর্ষের উত্তরে উত্তরাপথ দ্বাদশ শতকের শেষভাগে তুর্কি অভিযান শুরু হলেও তার আঁচ বাংলার শান্ত পল্লীজীবনে এসে লাগেনি। সুতরাং তুর্কি আক্রমণকে প্রতিহত করার কোনো প্রস্তুতিও ছিল না — শাসক বা প্রজার পক্ষে। ড° সুকুমার সেন এ-সম্পর্কে একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রসঙ্গ উত্থাপন করেছেন। তিনি বলেছেন, গুপ্ত শাসনের আমল থেকে বঙ্গদেশে 'মধ্যদেশীয় ব্রাহ্মণদের উপনিবেশ' গড়ে উঠতে শুরু করে। এঁরা নবীন এবং মনোধর্মের দিক দিয়ে এঁরা ছিলেন সংস্কৃতাশ্রয়ী, যজ্ঞ বা পূজা পরায়ণ ও শাস্ত্রমতাদর্শ পন্থী। অন্যদিকে প্রবীণ দেশীয়রা ছিলেন মূলত প্রাকৃত ভাষাশ্রয়ী, দৈববাদী বা ব্রতপরায়ণ ও জৈন-বৌদ্ধ বা যোগপন্থী। নবীন ও প্রবীণ এই দুই স্তরের মধ্যে বৈবাহিক মিলন, আচার-ব্যবহার প্রচলিত থাকলেও আভিজাত্যে, সমৃদ্ধিতে, শিক্ষা-সংস্কৃতিতে পার্থক্য ছিল। (দ্র. বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস ১ম খণ্ড, পৃ. ৭৯-৮০) সেটাই এই দুই স্তরের মধ্যে দীর্ঘকাল ধরে ব্যবধান তৈরি করে আসছিল যা জাতি হিসাবে বাঙালিকে সুদৃঢ় বন্ধনে বাঁধতে পারেনি। এই অবস্থায় বখতিয়ার খিলজির পক্ষে ব্যবসায়ীর ছদ্মবেশে এসে বঙ্গদেশ অধিকার করে অবাধে লুণ্ঠন বা ধ্বংসলীলা চালানো সম্ভব হয়েছিল।

এই পরিপ্রক্ষিতে বলা যায়, বৈদেশিক শক্তির শাসন প্রতিষ্ঠা বঙ্গে তুর্কি আক্রমণের প্রথম ফল। ত্রয়োদশ শতকের শুরুতেই বঙ্গদেশে মুসলমান শাসনের গোড়াপত্তন হয়। নানা বাঁক পেরিয়ে এই শাসন চলে অষ্টাদশ শতকের মধ্যভাগ পর্যন্ত। প্রথমে পাঠান আমল, তারপর সুলতানি আমল ও মোগল আমল হয়ে শেষে বাংলার স্বাধীন নবাবি আমল।

তুর্কি আক্রমণের অভিঘাতে সুকুমার সেন উল্লেখিত নবীন ও প্রবীণ স্তর দুটি ক্রমশ পরস্পরের কাছাকাছি চলে এল এবং একটি অখণ্ড সংস্কৃতি ও ভাবধারায় পরিণত হয়ে উঠতে শুরু করল। মুসলমান শক্তির মধ্যস্থতায় এবং দেশীয় জনসাধারণের সঙ্গে মিলেমিশে ধীরে ধীরে বাঙালি জাতি আরও সংহত হয়ে উঠতে শুরু করেছিল। এটি তুর্কি আক্রমণের দ্বিতীয় ফল। পঞ্চদশ

শতকে এই সংহত বাঙালি সমাজের নেতৃত্ব গ্রহণ করেছিলেন শ্রীচৈতন্যদেব। তিনি শুধু ওই দুটি স্তর নয়, সমাজের সমস্ত স্তরের মানুষকে নিয়ে বাংলার সংস্কৃতিতে এক নবজাগরণের সৃষ্টি করেছিলেন।

আসুন জেনে নিই



বঙ্গে মুসলমান শাসনের পর্বগুলোকে নিম্নলিখিত ভাবে দেখানো যেতে পারে —

- খিলজি, আমির-ওমরাহদের অধীনে বঙ্গদেশ (১২০৪-১২২৭ খ্রিষ্টাব্দ)
- দিল্লির সুলতানের শাসনকাল (১২২৭-১৩৪১. খ্রিষ্টাব্দ)
- ইলিহাসশাহী বংশের প্রথম ধারার শাসন (১৩৪২-১৪১৩ খ্রিষ্টাব্দ)
- গণেশ-জালালুদ্দিনের অধীনে শাসন (১৪১৪-১৪৪১ খ্রিষ্টাব্দ)
- ইলিহাসশাহী বংশের দ্বিতীয় ধারার শাসন (১৪৪২-১৪৮৭ খ্রিষ্টাব্দ)
- হাবসি-খোজাদের শাসন (১৪৮৭-১৪৯৩ খ্রিষ্টাব্দ)
- হুসেন শাহী বংশের শাসন (১৪৯৩-১৫৩৮ খ্রিষ্টাব্দ)
- শের শাহ ও সুর বংশের শাসন (১৫৩৮-১৫৬৩ খ্রিষ্টাব্দ)
- কররানি বংশের শাসন (১৫৬৪-১৫৭৬ খ্রিষ্টাব্দ)
- দিল্লী-নিয়ন্ত্রিত মোগল আমলের শাসন (১৫৭৪-১৭০০ খ্রিষ্টাব্দ)
- বাংলার স্বাধীন নবাবি আমলের শাসন (১৭০৩-১৭৫৭ খ্রিষ্টাব্দ)

তুর্কি আক্রমণের কালে সৈন্যসামন্ত সহ যে সমস্ত বিজেতা বঙ্গদেশে এসেছিলেন তাঁদের মুখের ভাষা ছিল তুর্কি, ফারসি ও আরবি। এঁদের পোশাক-পরিচ্ছদ, খাদ্যাভ্যাস, ধর্মাচরণ ছিল ভিন্ন ভিন্ন। স্থানীয় প্রচলিত সংস্কৃতির সঙ্গে এই নবাগত সংস্কৃতির মিলন হতে শুরু করল। সবচেয়ে বেশি প্রভাবিত হল মনের ভাব আদান-প্রদানের ভাষা। তখন থেকেই কথ্যভাষায় আরবি-ফারসি-তুর্কি শব্দাবলি গৃহীত হতে শুরু করে। বাংলা ভাষার শব্দভাণ্ডারে আলখাল্লা, বিবি, কেতাব, আয়েশ, কেচ্ছা, দফা, আন্দাজ, বাগিচা ইত্যাদি শব্দগুলো গৃহীত হয়ে যায় তখন থেকেই। এতে বাংলা ভাষা কৃতঋণ শব্দে সমৃদ্ধ হয়ে ওঠে। এর প্রতিফলন দেখা যায় মধ্যযুগের সাহিত্যে। তবে এর জন্য বাঙালিকে দীর্ঘ দুশো বছর বা তার কিছু বেশি অপেক্ষা করতে হয়েছে। তুর্কি বা পাঠান-হাবসি শাসনের প্রথম পর্যায়ে অর্থাৎ মুসলমান রাজশক্তির প্রতিষ্ঠাকালে লুণ্ঠন, মঠ-মন্দির-গ্রন্থাগারের ধ্বংসলীলা, জোর করে ধর্মান্তকরণ প্রচেষ্টায় সাহিত্য-সংস্কৃতির লালন-পালনকে বন্ধ রেখে ভীত সন্ত্রস্ত বাঙালিকে আত্মগোপন করতে হয়। ফলে সেসময় ভাষা-সাহিত্যের বিকাশ কিছুই হয়নি। এজন্য এই দুশ বছর বাংলার ইতিহাসে অন্ধকারময় যুগ নামে পরিচিত। দীর্ঘ সময় অতিবাহিত করার পর বাঙালি সাহস করে সামান্য স্মৃতিমীমাংসাবিষয়ক যা-কিছু লিখতে পেরেছিল, তার সমস্তটাই সংস্কৃতে। বিশেষ কোনো ধরনের রাজনৈতিক প্রতিরোধ না পেয়ে এবং সময়ে

সময়ে স্থানীয় ভূস্বামীদের কাছ থেকে দিল্লীর সম্রাটের বিরুদ্ধে লড়ার জন্য সহায়তা পেয়ে মুসলমান শাসকবর্গ ততদিনে বিজিতদের স্মৃতিমীমাংসা বা ধর্মচর্চার ওপর সদয় হয়ে উঠেছিলেন। হুসেন শাহের আমলে এক্ষেত্রে বঙ্গদেশে নতুন ভাবে প্রাণ সঞ্চার হয়। বাংলা ভাষার সমৃদ্ধিও তখন থেকে শুরু হয়। এই প্রাণস্পন্দন আনুমানিক ১৪শ শতকের শেষভাগ বা ১৫শ শতকের প্রথমভাগে নানুরের বড়ু চণ্ডীদাস, কুলীন গ্রামের মালাধর বসু ও ফুলিয়ার কৃত্তিবাসের রচনায় খুঁজে পাওয়া যায়। এটাকে তুর্কি আক্রমণের গুরুত্বপূর্ণ ফলশ্রুতি বলা যায়।

প্রসঙ্গত বঙ্গদেশে ধর্মসাধনার বৈচিত্র্য ও মিলনে তুর্কি বিজয়ের অবদানের উল্লেখ করতে হবে। বখতিয়ার খিলজি উলেমাদের জন্য মসজিদ, মাদ্রাসা নির্মাণ করেছিলেন, নামাজে প্রশংসামূলক 'খোৎবা' পড়ার ব্যবস্থা চালু করেছিলেন। বৈষ্ণব ও শাক্ত ধর্মকেন্দ্র ছাড়া মসজিদ-মাদ্রাসা কেন্দ্রিক মুসলমান ধর্মচর্চার কেন্দ্র বেশি সংখ্যায় ছড়িয়ে পড়া এবং ধর্মান্তরণ প্রক্রিয়া চালু থাকার ফলে বঙ্গীয় সমাজের একটি অংশ প্রচলিত ধর্মভাবনা গোঁড়ামি মুক্ত হয়ে ইসলামি চেতনার মিলনে সুফি ধর্মের প্রতি আকৃষ্ট হতে পেরেছিল। এই আকর্ষণের অন্যতম কারণ পারস্য ও মধ্য এশিয়া থেকে আগত সুফি-পীরেরা। এঁরাই বঙ্গে ইসলামের প্রসারে সহায়ক ছিলেন। অবশ্য বৈষ্ণব ও শাক্তদের প্রাধান্য একেবারে বিলুপ্ত হয়নি। বিশেষত লৌকিক সমাজে কৃষ্ণলীলা তথা বৈষ্ণব প্রভাবের যে ক্ষীণ ধারা বিদ্যমান ছিল, ১৪শ শতকের মাঝামাঝি সময়ে মাধবেন্দ্রপুরীর দ্বারা ভাগবতের আদর্শ প্রচারে তা বিকশিত হয়। এভাবে বৈষ্ণব মতের প্রাধান্যের সূত্র ধরেই পাঠান আমলের শেষ প্রান্তে রামকেলি গ্রামে চৈতন্য-পরিকর রূপ-সনাতন গোস্বামী বৈষ্ণবকেন্দ্র স্থাপন করেছিলেন। অন্যদিকে ১৪শ-১৫শ শতকের মধ্যে নবদ্বীপ-শান্তিপুরকে কেন্দ্র করে ব্রাহ্মণ্য সংস্কৃতিও নতুন আশ্রয় খুঁজে পেয়েছিল।

নগর সংস্কৃতির পাশাপাশি নতুন বাণিজ্য কেন্দ্রের গোড়াপত্তন তুর্কি আক্রমণের আরেকটি অবদান বা ফলশ্রুতি। এ-প্রসঙ্গে ড° অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের মন্তব্য উল্লেখ করা যায়। তিনি বলছেন, 'ইসলামের ভূমিচারী জীবনাদর্শ, আমির-ওমরাহের ভোগসুখের উদ্দামতা — ইত্যাদির ফলে বাঙালীর শান্ত স্নেহচ্ছায়াশীতল গ্রামীণ সংস্কৃতি ধীরে ধীরে নাগরিক সংস্কৃতির পথে' এগিয়ে গেল ((দ্র) বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত, ১ম খণ্ড, পৃ. ২৫৪)। গৌড়, লক্ষ্মণাবতী, দেবকোট, পাণ্ডুয়া প্রভৃতিকে কেন্দ্র করে নাগরিক সভ্যতার সূচনা হল। রাজকর্মচারী হিসাবে এবং নানা প্রয়োজনে সাধারণ মানুষ এই সমস্ত রাজধানী বা বড়ো নগরীতে আসতে ও বসবাস করতে শুরু করলেন। বহির্বাণিজ্যের প্রসার হবার সঙ্গে সঙ্গে বিদেশী বণিকেরাও এই সমস্ত নগরে আসতে শুরু করলেন। ফলে গ্রামীণ বাঙালি সংস্কৃতি ও সভ্যতা নগর অভিমুখী হয়ে উঠল।

একই সঙ্গে বলা যায়, তুর্কি আক্রমণের পর মসজিদ, মাদ্রাসা নির্মাণের সূত্রে বঙ্গে নতুন স্থাপত্যরীতির প্রচলন হয়েছিল। পাণ্ডুয়ার মসজিদের ধারে নির্মিত মিনারটিতে তুর্কি স্থাপত্য লক্ষ করা যায়। অধিকাংশ ক্ষেত্রে বিভিন্ন মঠ-মন্দিরের ধ্বংসস্তূপ থেকে প্রাপ্ত পাথর বা ইঁট দিয়ে এই নতুন স্থাপত্য তৈরি হয়েছিল। ত্রিবেণীতে জাফর খানের বিরাট মসজিদ নির্মাণ প্রসঙ্গে প্রখ্যাত

গবেষক-লেখক গোলাম মুরশিদ বলছেন, '১২৯৮ সালে নির্মিত তাঁর এই মসজিদে যে-পাথর ব্যবহৃত হয়েছে, সেসব পাথরের অনেকটারই উল্টো দিকে আছে হিন্দু দেবদেবীর মূর্তি'। (দ্র) হাজার বছরের বাঙালি সংস্কৃতি, পৃ. ৩১)। এই মসজিদ-মাজার তৈরি করতে গিয়ে নিয়ে আসতে হয়েছিল পাঠান স্থাপত্য শিল্পীদের। এই শিল্পীরা বঙ্গদেশে পাথর অপ্রতুল হওয়ায় পোড়ামাটির ইঁট ও চুন-সুরকি ব্যবহার করে সেগুলো গাঁথার ব্যবস্থা করেছিলেন। এই অভিনব পন্থায় মুসলমান ধর্ম-সংস্কৃতির আদর্শে তাঁরা মসজিদ-মাজারের গম্বুজ-মিনার-খিলান ইত্যাদি তৈরি করলেন এবং অলংকরণের জন্য ব্যবহার করলেন পোড়ামাটির কারুকার্য। ধ্বংসের ভেতর থেকে এভাবে নতুন স্থাপত্য সংস্কৃতি গড়ে ওঠা একমাত্র তুর্কি আক্রমণই সম্ভব করে তুলেছিল।



আসুন, জেনে নিই

বঙ্গদেশে ত্রয়োদশ শতকের মুসলমান স্থাপত্যরীতি হিসাবে মসজিদগুলোতে থাকত একটি প্রার্থনা কক্ষ, ছাদের ওপর অর্ধ বৃত্তাকার গম্বুজ ও উঁচু মিনার। অলংকরণ হিসাবে পাথর ও টেরাকোটার ব্যবহার হত। পঞ্চদশ শতকের মাঝামাঝি থেকে বাঁকানো কার্নিশ ও চালা-রীতির প্রভাব লক্ষ করা যায়। এমনকী কোনো কোনো ক্ষেত্রে মসজিদের সামনের বারান্দা নির্মিত হয়েছে গ্রামের কুঁড়ে ঘরের খড়ের চালার আকৃতিতে। উদাহরণ হিসাবে সেকালীন পাণ্ডুয়ার একলাখী মাজার, গৌড় নগরীর উপকণ্ঠে পিরোজপুর গ্রামের ছোটো সোনা মসজিদ বা বাগেরহাটের ষাটগম্বুজ মসজিদের উল্লেখ করা যায়।

আপনারা বাংলায় মুসলমান শাসনের প্রথম পর্বের কথা জেনেছেন, যেখানে ত্রয়োদশ শতকের শুরুতে তুর্কি আক্রমণের সূত্র ধরে পঞ্চদশ-ষোড়শ শতক পর্যন্ত বিভিন্ন শাসক-বংশের প্রত্যক্ষ প্রভাবে বাংলার সমাজ ও সংস্কৃতিতে নানা ধরনের পরিবর্তন দেখা দিয়েছিল। এই কালপর্বে এবং তার পরও বাংলাকে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে দিল্লির সম্রাটেরা নিয়ন্ত্রণ করতেন। বিশেষত, সম্রাট জাহাঙ্গির যখন বারো ভুঁইঞাদের দমন করে বাংলায় সুবাদারি শাসন ব্যবস্থার গোড়াপত্তন করেন, তখন থেকেই দিল্লির অধীনে বাংলাকে প্রত্যক্ষভাবে শাসনের পর্যায় শুরু হয়। মুহম্মদ হাদী ওরফে মুর্শিদকুলি খান ছিলেন মোগল সম্রাট ঔরঙ্গজেব দ্বারা নিযুক্ত বাংলার শেষ সুবাদার। ১৭০৭ খ্রিষ্টাব্দে ঔরঙ্গজেবের মৃত্যুর পর দিল্লিতে যে অরাজকতা নেমে আসে তার ফলে মোগল শাসন ব্যবস্থা দুর্বল হয়ে পড়ে। আর সেই সুযোগে মুর্শিদকুলি খান স্বাধীন ভাবে বাংলায় শাসনভার কায়েম করেন। নবাব হিসাবে দিল্লির সম্রাটের কাছ থেকে তিনি বা তাঁর উত্তরসূরীরা শুধু একটি অনুমোদন নিতেন। বঙ্গদেশে মুসলমান শাসনের ইতিহাসে এই স্বাধীন সুবাদারদের শাসনকালকে নবাবি আমল হিসাবে চিহ্নিত করা হয়।

অগ্রগতি নির্ধারক প্রশ্ন

(ক) নিম্নলিখিত প্রশ্নের উত্তর ন্যূনতম ১৫০ শব্দের মধ্যে লিখুন।

১. বঙ্গে তুর্কি আক্রমণের একটি পরিচয় দিন।

২. তুর্কি আক্রমণের ফলে বঙ্গে ধর্মসাধনার যে বৈচিত্র্য দেখা গিয়েছিল, তার বিবরণ দিন।

৩. তুর্কি আক্রমণের ফল হিসাবে বঙ্গের স্থাপত্যরীতিতে কী পরিবর্তন হয়েছিল, লিখুন।

৮.৪ বাংলার নবাবি আমল ও বঙ্গীয় সমাজ-সংস্কৃতি

১৭০৭ খ্রিষ্টাব্দে ঔরঙ্গজেবের মৃত্যুর পর মুর্শিদকুলি খান বাংলার নায়েব-এ-নাজিম হিসাবে শাসনভার গ্রহণ করেন। মাঝখানে সম্রাট বাহাদুর শাহ তাঁকে দাক্ষিণাত্যে পাঠালেও ১৭১০ খ্রিষ্টাব্দে তিনি আবার বাংলায় ফিরে আসেন এবং ১৭২৭ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত বঙ্গদেশ শাসন করেন। ওই বছর তাঁর মৃত্যু হলে নিঃসন্তান মুর্শিদকুলি খাঁর জামাতা সুজাউদ্দিন খান বাংলা-বিহার-উড়িষ্যার নবাব হন। তাঁর রাজত্বকাল ১৭৩৯ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত বিস্তৃত। এরপর নবাবের আসনে বসেন সুজাউদ্দিনের পুত্র সরফরাজ খান। তিনি মাত্র এক বছর (১৭৪০) নবাব ছিলেন। বেশিরভাগ সময় বিলাস-ব্যসনে মেতে থাকার ফলে তিনি অকর্মণ্য হয়ে পড়েছিলেন। সেই সুযোগে তদানীন্তন নায়েব-নাজিম আলীবর্দি খান সরফরাজ খানকে যুদ্ধে পরাজিত করে বাংলা স্বাধীন নবাব হন (১৭৪০-৫৬)। সিংহাসন আরোহণের পর আলীবর্দীকে মুখোমুখি হতে হয় ভাস্কর পণ্ডিতের অধীন মারাঠা সৈনিকের। এক সময় মারাঠাদের সঙ্গে সন্ধি করতে বাধ্য হন আলীবর্দী। যাই হোক, এঁর শাসনকালে বঙ্গদেশ নানাদিক দিয়ে সমৃদ্ধ হলেও আভ্যন্তরীন কোন্দলে অতিষ্ঠ হয়ে উঠেছিল। এর ফল ভোগ করতে হয় বাংলার শেষ স্বাধীন নবাব সিরাজ-উদ-দৌলাকে। ১৭৫৬ খ্রিষ্টাব্দে আলীবর্দীর উত্তরাধিকারী হিসাবে সিরাজ বাংলা-বিহার-উড়িষ্যার নবাব হন। কিন্তু পারিবারিক ঈর্ষা, ষড়যন্ত্র ও বিদেশী ইংরেজশক্তির আক্রমণ — এই ত্রিমুখী আক্রমণে তিনি ১৭৫৭ সালেই পরাজয় ও মৃত্যু বরণ করেন। পরের আট বছর মীরজাফর, মীরকাশিম ও এঁদের অপদার্থ পুত্রেরা ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির শাসকবর্গের অঙ্গুলিহেলনে রাজত্ব করেছিলেন। সুতরাং মুর্শিদকুলি খাঁ থেকে সিরাজ-উদ-দৌলা অর্থাৎ ১৭০৭ খ্রিষ্টাব্দ থেকে ১৭৫৭ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত এই সময়কালকেই বাংলায় নবাবি আমলের পর্ব বলে উল্লেখ করা যায়। বঙ্গ ইতিহাসের পট পরিবর্তন তথা বাংলার আর্থিক অবস্থার উন্নতির জন্য এই নবাবি আমলের অবদান অনেক।

৮.৪.১ নবাবি আমলের বঙ্গীয় সমাজ

মুর্শিদকুলি খাঁ-র সময়ে বঙ্গদেশ ছিল মিশ্র সংস্কৃতির সমাজ। হিন্দু ও মুসলমান -- দুই সম্প্রদায়ের মানুষই নিজেদের ধর্ম পালনে নিয়মনিষ্ঠ ছিলেন। মূলত কৃষি নির্ভর গ্রামীণ সমাজব্যবস্থার পাশাপাশি রাজধানী বা বাণিজ্যকেন্দ্র নির্ভর নতুন নাগরিক সমাজব্যবস্থা প্রচলিত ছিল। যদিও মুর্শিদকুলি ছিলেন দক্ষ প্রশাসক, বুদ্ধি-বিবেচনা দিয়ে বঙ্গদেশে শান্তি-শৃঙ্খলা

এনেছিলেন—তবু সমাজে ধনী ও দরিদ্রের মধ্যে বৈষম্য ছিল প্রচুর। সমাজের ধনী শ্রেণির কাছেই সমস্ত সম্পদ গচ্ছিত ছিল। কর-ব্যবস্থার কড়াকড়ির জন্য সাধারণ চাষি থেকে শুরু করে বর্ধিষ্ণু রায়তেরাও নানা সময়ে শাসকের অত্যাচারের মুখোমুখি হতেন। হিন্দু সমাজে বর্ণাশ্রম ব্যবস্থা প্রবল ছিল। কৌলীন্য প্রথাও খুব দৃঢ় ভাবে অনুসৃত হত। মধু সংগ্রহ, কাঠ কাটা, নৌকো চালানো, জুতো তৈরি করা, টোকা-ছাতা বানানো ইত্যাদি নানা বৃত্তির শ্রমজীবী মানুষ সমাজে ছিলেন। গ্রামে-নগরে ভিক্ষাবৃত্তি করেও অনেকে জীবন নির্বাহ করতেন। গ্রামে প্রত্যেকেই নিজেদের বৃত্তিতে নিযুক্ত ছিল বলে গ্রামসমাজ আত্মনির্ভর হয়ে উঠেছিল।

অন্যদিকে মুসলমান সমাজের মধ্যেও দুটি স্তর ছিল—শাসনকার্যে নিযুক্ত বহিরাগত সম্ভ্রান্ত শ্রেণি ও সূফি-দরবেশ-মুফতি-কাজি এবং ধর্মান্তরিত নব্য মুসলমান। কুল-মর্যাদা তথা আভিজাত্যের মানদণ্ডে এই দুই শ্রেণি তিনটি বড়ো অংশে বিভক্ত ছিল — আশরাফ, আতরফ, আরজল। আশরফেরা বাইরে থেকে আগত অভিজাত শ্রেণির মানুষ, আরজলেরা ধর্মান্তরিত মুসলমান এবং আতরফেরা মিশ্র সংস্কৃতি অর্থাৎ হিন্দুদের মতোই কিছু আচার ব্যবহারে বিশ্বাসী। মূলত এঁরা ধর্মান্তরিত কিন্তু উচ্চ-মধ্যবিত্ত শ্রেণির মানুষ। এঁরা ইসলামের প্রকৃত আদর্শ বা শিক্ষাকে আত্মস্থ করতে পারেননি বরং হিন্দু ও বৌদ্ধদের সামাজিক সংস্কারগুলোকে লালন-পালন করেছিলেন। নবাবি আমলে বঙ্গের মুসলমান সমাজে এঁদের নানা ক্রিয়াকলাপের প্রাধান্য দেখতে পাওয়া যায়।

১৪৯৮ সালে বঙ্গদেশে পর্তুগিজ বণিকদের আগমনের ফলে ধীরে ধীরে খ্রিষ্ট ধর্মাবলম্বীরাও এখানকার অধিবাসী হয়ে উঠেছিলেন। বিশেষ করে চুঁচুরা, হুগলি, কাশিমবাজার ইত্যাদি অঞ্চলে এঁদের বসতি গড়ে উঠেছিল। বঙ্গদেশে আলু, টমেটো, কাঁচা মরিচ, ভুট্টা, পেঁপে, পেয়ারা, আনারস, লেবু ইত্যাদির ফলনে এঁদের অবদান প্রচুর। হুগলি ও চব্বিশ পরগণা জেলার বহু অংশে এসব বিদেশি ফসলের চাষ করতেন তাঁরা। নবাবি আমল শুরু হবার আগেই বারো ভূঁইয়াদের কেউ কেউ যেমন সোনার গাঁয়ের ঈসা খান, বাকলার রামচন্দ্র রায়, যশোরের মহারাজ প্রতাপাদিত্য পর্তুগিজ মিশনারিদের স্বাগত জানিয়েছিলেন আর গির্জা তৈরির জন্য ভূমিদানও করেছিলেন। এই সমস্ত মিশনারিদের প্রভাবে বঙ্গীয় সমাজের নিচুতলার মানুষদের মধ্যে খ্রিষ্টান ধর্ম গ্রহণের প্রবণতা বেড়ে গিয়েছিল। তবে গোমেজ, ডি-কস্টা, রোজারিও, রিবেরো ইত্যাদি পদবীধারী পোর্তুগিজ এবং পরবর্তীকালে এঁদের বাঙালি বংশধরেরা বঙ্গদেশের বিভিন্ন জায়গায় ছড়িয়ে-ছিটিয়ে ছিলেন। মূলত এঁরা ছিলেন বণিক এবং পাদ্রি। এঁরা ছাড়া ইংরেজ বণিকরাও সপ্তদশ শতকের শেষ দিকে (১৬৯৮ খ্রিষ্টাব্দ) কলিকাতা, সুতানুটি, গোবিন্দপুর গ্রামের স্বত্ব কিনে নিয়ে বঙ্গে ইংরেজ রাজত্বের সূচনা করেন। এখানেই তাঁরা ফোর্ট উইলিয়াম দুর্গ তৈরি করেন আর ইংরেজ শাসনকালের ভাবী রাজধানী কলকাতা শহরের পত্তন হয়। এই অঞ্চল তাঁদের ব্যবসা-বাণিজ্যের কেন্দ্র হয়ে ওঠে। বিভিন্ন জায়গায় তাঁরা কুঠি স্থাপন করে কর আদায়ের কাজ করতেন। তাঁরাও খ্রিষ্টান পাদ্রিদের ধর্ম প্রচারের সুবিধা করে দিয়েছিলেন। এইভাবে নবাবি আমলে ইংরেজদেরও বসতি গড়ে ওঠে বঙ্গদেশের বিভিন্ন অঞ্চলে। তাঁরাও বঙ্গীয় সমাজের একটি অংশ হয়ে পড়েন।

৮.৪.৩ নবাবি আমলের বঙ্গীয় সংস্কৃতি

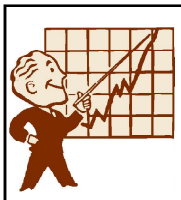
নবাবি আমলে হিন্দু-মুসলমান-খ্রিষ্টান ইত্যাদি ধর্মাবলম্বী মানুষের নিজস্ব সংস্কৃতি চর্চায় বাধা নিষেধ ছিল না বলেই আমরা সিদ্ধান্ত করতে পারি। কারণ পরবর্তীকালে বিভিন্ন রচনায় সমকালীন সমাজের যে ছবি পাওয়া যায় তাতে এ-ধরনের বিধি ব্যবস্থার কোনো প্রমাণ পাওয়া যায় না। সব ধর্মের উৎসব অনুষ্ঠানই পালিত হত, ন্যায়শাস্ত্রের চর্চাও চলত। অষ্টাদশ শতকের শুরুতে মুর্শিদকুলি খাঁয়ের সময় ধর্ম সমন্বয়ের আদর্শ নিয়ে উদ্ভুত হয়েছিল কর্তাভজা, সাহেবধানী ইত্যাদি বেশ কিছু সহজিয়া সম্প্রদায়। তাছাড়া ধর্মীয় গোঁড়ামির প্রশ্রয় না থাকায় দোলের সময় নবাব ও ওমরাহরা হারেমে আবির-গুলাল নিয়ে দোল খেলতেন। অসুখ-বিসুখ হলে দেব-দেবীর চরণামৃত পান করতেও তাঁদের কোনো কুণ্ঠা ছিল না। হিন্দুরা সত্যপীরকে শিরনি দিত।

বিভিন্ন পুরনো জমিদার বংশ ও সামন্ত শ্রেণি ধীরে ধীরে বিলুপ্ত হতে শুরু করে নবাবি আমলে। কিন্তু বর্ধমান, কৃষ্ণনগর, কুচবিহার প্রভৃতি অঞ্চলের রাজারা নিজস্ব সাহিত্য ও সংস্কৃতি চর্চা অব্যাহত রাখতে পেরেছিলেন। এঁদের রাজসভায় ব্রাহ্মণ পণ্ডিত ও কবিদের কদর ছিল। অনেক পণ্ডিত ভাগ্যান্বেষণে এই সমস্ত রাজসভায় যেতেন। কৃষ্ণনগরের মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র নদীয়ার স্মার্ত পণ্ডিত, নৈয়ায়িক, জ্যোতিষশাস্ত্রবিদ পণ্ডিতদের সম্মান করতেন। তিনি টোল-চতুষ্পাঠীর খরচ বহনের জন্য বিশেষ বৃত্তির ব্যবস্থা করেছিলেন। কৃষ্ণনগরের চারপাশে স্মৃতি-মীমাংসা-ন্যায়শাস্ত্র চর্চার নানা কেন্দ্র প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। পণ্ডিত ও শিক্ষিত সমাজে ব্যাকরণ, ভট্টিকাব্য, কালিদাসের রঘুবংশম্, কুমারসম্ভব, অলংকারশাস্ত্র এবং বেদান্ত চর্চা হত। নবদ্বীপের বিখ্যাত জ্যোতিষবিশারদ রামরুদ্র বিদ্যানিধি কৃষ্ণচন্দ্রের রাজসভায় বসে 'সারসংগ্রহ' রচনা করেছিলেন। জ্যোতিষশাস্ত্রের ওপর মুসলমান শাসকদেরও খুব ভরসা ছিল। মীরকাসিম নিজে পণ্ডিত রেখে জ্যোতিষবিদ্যা শিখেছিলেন। সরফরাজ ও আলীবর্দি যুদ্ধযাত্রা বা যেকোনো শুভ কাজে বেরোনোর আগে জ্যোতিষির পরামর্শ নিতেন।

নবাবি আমলে বঙ্গদেশে দাস ব্যবস্থা প্রচলিত ছিল। ১৭২৯-৩০ খ্রিষ্টাব্দের দিকে কোনো কোনো হাটে দশ-এগারো বছরের মেয়ে বিক্রি হত। চরম অত্যাচারিত হলেও দারিদ্র্যর জন্য অনেকে খোরপোষের বিনিময়ে নিজেকে সপরিবারে বিক্রি করতেন। বিদেশী বণিকেরাই এই ব্যবসায় অগ্রণী ছিলেন।

মুর্শিদকুলি খানের সময় থেকেই বিশেষ করে সরকারি রাজস্ব বিভাগে হিন্দু কর্মচারীর সংখ্যা বাড়তে থাকে। যেহেতু রাজকাজ ফারসিতে চলত, সেহেতু রাজকর্মচারীরা সবাই এই ভাষা শিখে নিয়েছিলেন। আলিবর্দির হিন্দু কর্মচারী কিরীটচাঁদ ফারসি ব্যাকরণে বিশেষ অভিজ্ঞ ছিলেন। অভিজাত মুসলমানদের মধ্যে ফারসি কিসসা-সাহিত্য, হেকিমি ও জ্যোতির্বিদ্যার প্রচলন ছিল। হিন্দুদের শিক্ষাদীক্ষা ছিল টোল নির্ভর। তবে নবাবি আমলের শেষদিকে ইংরেজ বণিকদের সংস্পর্শে আসার পর বিশেষত শিক্ষিত হিন্দুরা কাজ চালাবার মতো ইংরেজি শিখতে শুরু করেছিল। কলকাতার আশেপাশে বিভিন্ন অঞ্চলে কোনো কোনো ইংরেজ সাহেব ইংরেজি ভাষা শেখাতেন।

১৭৫৭ খ্রিষ্টাব্দে পলাশীর যুদ্ধের পর মাত্র দশ বছরের মধ্যেই বঙ্গে নবাবি আমলের সমাপ্তি ঘটে, শুরু হয় ইংরেজ আমল। বঙ্গীয় সমাজ পাশ্চাত্য প্রভাবে পাল্টাতে শুরু করে। বাঙালি সংস্কৃতিতে গ্রাম ও নগরের প্রভেদ বড়ো হয়ে উঠতে শুরু করে এবং এই যুগসন্ধির কালে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য সংস্কৃতির টানাপোড়েন দেখা দেয়। সাহিত্য, ধর্ম, শিক্ষা, সমাজ, ঐতিহ্য ইত্যাদি প্রত্যেকটি ক্ষেত্রেই নবজীবন-জিজ্ঞাসার কাল শুরু হয়।



অগ্রগতি নির্ধারক প্রশ্ন —খ

নিম্নলিখিত প্রশ্নের উত্তর ন্যূনতম ১৫০ শব্দের মধ্যে লিখুন

১. বাংলার নবাবি আমলের কালপর্ব ও রাজন্যবর্গের একটি পরিচয় দিন।

২. নবাবি আমলের বঙ্গীয় সমাজ কেমন ছিল, তা লিখুন।

৩. নবাবি আমলে বঙ্গদেশে জ্যোতিষশাস্ত্র চর্চার একটি বিবরণ দিন।



৮.৫ অধ্যায়টি পাঠ করে আমরা কী শিখলাম

এই অধ্যায়টি পড়ে আপনারা জানলেন—

- বঙ্গে তুর্কি আক্রমণের ঘটনা দ্বাদশ শতকের শেষ দিকে বখতিয়ার খিলজির দ্বারা সংঘটিত হয়েছিল।
- ১২০৬-এ বঙ্গ বিজয়ের পরবর্তী পর্যায়ে বখতিয়ার খিলজি কামরূপের শাসক পৃথুর কাছে পরাজিত হন।
- বঙ্গে তুর্কি আক্রমণের ফলে লুণ্ঠন ও ধ্বংসলীলার ভেতর দিয়ে বৈদেশিক শক্তির শাসন কায়েম হয়।
- সমাজের বিভিন্ন স্তরের ব্যবধান দূর হয়ে ক্রমে অখণ্ড সংস্কৃতি ও ভাবধারার প্রবর্তন হয়।
- বাংলা ভাষা আরবি, ফারসি, তুর্কি ইত্যাদি থেকে শব্দ নিয়ে নিজে সমৃদ্ধ হতে শুরু করল।
- নগর সংস্কৃতি সূচনার পাশাপাশি নতুন স্থাপত্যরীতির প্রকাশ দেখা যায়।
- মুর্শিদ কুলি খাঁ-র সময় থেকে বঙ্গে নবাবি আমল শুরু হয়।
- এই সময় হিন্দু, মুসলমান, খ্রিষ্টান মিলে একটি মিশ্র সংস্কৃতির সমাজ গড়ে উঠতে দেখা যায়।
- মিশনারিদের প্রভাবে ধর্মান্তকরণ প্রক্রিয়ার পাশাপাশি বর্ণাশ্রম ধর্ম, কৌলীন্য প্রথা অনুসৃত হতে থাকে।
- হিসাবে ফারসির প্রচলন হয়েছিল — নবাবি আমলের শেষের দিকে ইংরেজি শিক্ষাও শুরু হয়েছিল।

- সাহিত্যচর্চা, জ্যোতিষচর্চা যেমন চলত তেমনি দাসপ্রথার মতো ব্যবস্থারও প্রচলন ছিল।
- বৈদেশিক বাণিজ্য বৃদ্ধি পেয়েছিল, বিদেশী সব্জি-ফল ইত্যাদির চাষাবাদ শুরু হয়েছিল।



৮.৬ অতিরিক্ত পঠন

বন্দোপাধ্যায়, অসিতকুমার (১৯৮০); বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত; তৃতীয় খণ্ড,কলকাতা: মডার্ণ বুক এজেন্সী প্রা.লি.

মুরশিদ, গোলাম (২০০৬); হাজার বছরের বাঙালি সংস্কৃতি; ঢাকা: প্রতীক প্রকাশনা

রায়, নীহাররঞ্জন (১৯৯৩); বাঙালীর ইতিহাস আদি পর্ব, কলকাতা : দে'জ পাবলিশিং

সুর, অতুল (১৯৯১); বাংলা বাঙালীর সমাজ ও সংস্কৃতি; কলকাতা :জ্যোৎস্নালোক প্রকাশন

সেন, সুকুমার (১৯৭৮); বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস (১ম) কলকাতা : আনন্দ পাবলিশার্স



৮.৭ অগ্রগতি নির্ধারক উত্তর সংকেত

ক. ১. উত্তর লেখার জন্য ১.৩.১ পরিচ্ছেদটি দেখুন।

ক. ২. উত্তর লেখার জন্য ১.৩.৩ পরিচ্ছেদের 'প্রসঙ্গত বঙ্গদেশে ধর্মসাধনার বৈচিত্র্য.... নতুন আশ্রয় খুঁজে পেয়েছিল' অংশটি দেখুন।

ক. ৩. উত্তর লেখার জন্য ১.৩.৩ পরিচ্ছেদের 'একই সঙ্গে বলা যায়, তুর্কি আক্রমণের পর .... সম্ভব করে তুলেছিল' অংশটি দেখুন।

খ. ১. ১.৪.১ পরিচ্ছেদ অবলম্বনে উত্তর লিখুন।

খ. ২. ১.৪.২ পরিচ্ছেদ অবলম্বনে উত্তর লিখুন।

খ. ৩. উত্তর লেখার জন্য ১.৪.৩ পরিচ্ছেদের 'বিভিন্ন পুরনো জমিদার বংশ ... পরামর্শ নিতেন' অংশটি দেখুন।



৮.৮ আদর্শ প্রশ্নাবলি

১. বঙ্গদেশে তুর্কি আক্রমণের যেকোনো তিনটি ফলাফল সম্বন্ধে আলোচনা করুন।

২. বঙ্গে নবাবি আমলের শাসন সম্বন্ধে যা জানেন লিখুন।

৩. নবাবি আমলে বাংলার সংস্কৃতিতে কী কী রূপান্তর দেখা গিয়েছিল, লিখুন।

অধ্যায় ৯ : বাংলার সমাজ ও সংস্কৃতিতে ইংরেজ শাসন : ব্রিটিশ পর্ব — ১

বিন্যাস-ক্রম

৯.১ জ্ঞাতব্য বিষয়

৯.২ পরিচিতি

৯.৩ ব্রিটিশ শাসন প্রতিষ্ঠার পর্ব ও ব্যাপ্তি

- ৯.৩.১ দ্বৈত শাসন ব্যবস্থা
- ৯.৩.২ ব্রিটিশ সাম্রাজ্য কায়েমের নানা কৌশল
- ৯.৩.৩ কোম্পানি শাসনের শেষ পর্যায়

৯.৪ নবজাগরণ

- ৯.৪.১ নবজাগরণের সময়পর্ব
- ৯.৪.২ নবজাগরণের কারণ, বৈশিষ্ট্য ও প্রতিফলন
- ৯.৪.৩ নবজাগরণ ও ধর্মসংস্কার
- ৯.৪.৪ নবজাগরণ ও শিক্ষাসংস্কার
- ৯.৪.৫ নবজাগরণ ও সমাজসংস্কার

৯.৫ বাবু কালচার

৯.৬ জাতীয় কংগ্রেস প্রতিষ্ঠা

- ৯.৬.১ বঙ্গে স্ত্রীশিক্ষার আগের পরিবেশ
- ৯.৬.২ বঙ্গে স্ত্রীশিক্ষার সূচনা
- ৯.৬.৩ বঙ্গে স্ত্রীশিক্ষার প্রসার

৯.৭ বঙ্গদেশে ইংরাজি শিক্ষার বিস্তার ও স্ত্রী শিক্ষা

৯.৮ অধ্যায়টি পাঠ করে আমরা কী শিখলাম

৯.৯ অতিরিক্ত পঠন

৯.১০ অগ্রগতি নির্ধারক উত্তর-সংকেত

৯.১১ আদর্শ প্রশ্নাবলি

৯.১ জ্ঞাতব্য বিষয়

এই অধ্যায়টি পড়ে আপনি —

- বঙ্গদেশে ব্রিটিশ শাসনের গোড়াপত্তন ও বিস্তার সম্বন্ধে জানবেন।
- ব্রিটিশ শাসন বঙ্গীয় সমাজে কী ধরনের পরিবর্তন এনেছিল, তা বুঝতে পারবেন।

- উনিশ শতকে বাংলাদেশে ধর্ম-শিক্ষা-সমাজসংস্কার কর্মকাণ্ডের একটি রূপরেখা তৈরি করতে পারবেন।
- বঙ্গে ব্রিটিশ শাসনের নানা সুফল ও কুফলকে বিশ্লেষণ করতে পারবেন।

৯.২ পরিচিতি

রাজনৈতিক শাসনকালের প্রেক্ষাপটে বাংলার সমাজ ও সাংস্কৃতিক ইতিহাসের বিবর্তনকে বুঝে নিতে -আপনারা এর আগের অধ্যায়ে মুসলমান শাসকের অধীনে বঙ্গের সমাজ-সংস্কৃতিতে যে গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তনগুলো হয়েছিল, তাকে জেনেছেন। বর্তমান অধ্যায়ে, ঠিক এর পরেই বঙ্গদেশে যে আর এক বৈদেশিক শক্তির শাসন ব্যবস্থার সূচনা হল এবং তার প্রভাব তৎকালীন সমাজ ব্যবস্থায় কীভাবে পড়ল, সে সম্বন্ধে আপনারা জানবেন। প্রথমে বঙ্গদেশে তারপর সারা ভারতবর্ষে অষ্টাদশ শতকের মাঝামাঝি থেকে কুড়ি শতকের মাঝামাঝি পর্যন্ত যাঁদের শাসন ব্যবস্থার অধীন থাকতে হয়েছিল তাঁদের পরিচয় সাধারণ ভাবে 'ব্রিটিশ'। তবে একে দুটি অংশে ভাগ করা যায়। প্রথমটি ১৭৫৭ থেকে ১৮৫৭ এবং দ্বিতীয়টি ১৮৫৮ থেকে ১৯৪৭। এই প্রথম একশো বছরের কালপর্বকে বলা যায় 'কোম্পানি আমল'। দ্বিতীয়টি অবশ্যই 'ব্রিটিশরাজ'। কোম্পানি আমলে এর পূর্ববর্তী নবাবি আমলের চেয়েও দ্রুতগতিতে বাংলার সামাজিক, সংস্কৃতিক, অর্থনৈতিক বিবর্তন সম্ভব হয়েছিল। তার অন্যতম কারণ ইংল্যান্ডে ১৭৬০ খ্রিস্টাব্দের শিল্প বিপ্লব ও তার প্রভাবে ইউরোপের বিভিন্ন দেশে বিজ্ঞানের নতুন নতুন আবিষ্কার। যোগাযোগ ব্যবস্থা উন্নত হবার সঙ্গে সঙ্গে বঙ্গদেশেও তার প্রভাব আছড়ে পড়তে খুব একটা দেরি হয়নি। ফলে এই কোম্পানি আমলে বঙ্গে যে বিপুল সামাজিক ও সাংস্কৃতিক পরিবর্তন হয়েছিল, তার গুরুত্ব অপরিসীম। সমাজ ও সংস্কৃতির এই বিবর্তনের একটা সামগ্রিক রূপরেখা আপনাদের কাছে তুলে ধরাই বর্তমান অধ্যায়ের মূল উদ্দেশ্য।

৯.৩ ব্রিটিশ শাসন প্রতিষ্ঠার পর্ব ও ব্যাপ্তি

১৭৫৬ খ্রিস্টাব্দের এপ্রিল মাসে নবাব আলিবর্দি খান পরলোক প্রাপ্ত হন। এরপর ঘসেটি বেগম, মিরন, মীরজাফরদের পছন্দ না হলেও আলিবর্দির ঠিক করে দেওয়া উত্তরাধিকারী এবং তাঁরই নাতি সিরাজদ্দৌলা বাংলার সিংহাসনে বসেন। তিনিই অবশ্য বাংলার শেষ স্বাধীন নবাব। পারিবারিক শত্রু এবং ইংরেজ বণিকদের লোভের কাছে তাঁকে পরের বছরই নতি স্বীকার করতে হয়। নিজেদের বাণিজ্যিক স্বার্থকে সুরক্ষিত করতে রবার্ট ক্লাইভের অধীন কোম্পানির সেনাবাহিনি মুর্শিদাবাদের অন্দরমহলের ষড়যন্ত্রে ভরপুর সাহায্য করে এবং ১৭৫৭ সালের ২৩ জুন পলাশি প্রান্তরে সিরাজদ্দৌলাকে পরাস্ত করেন। অবশ্য বঙ্গের প্রভাবশালী জমিদার, ধনী বণিক, অর্থ ব্যবসায়ী জগৎশেঠ ও সিরাজদ্দৌলার সেনাপতি মীরজাফর এই ষড়যন্ত্রে সামিল হয়েছিলেন। বিশেষত সমকালীন হিন্দু বণিকেরা ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির সঙ্গে যে বাণিজ্যিক সম্পর্ক গড়ে তুলেছিলেন, তার স্বার্থ রক্ষার জন্যই সিরাজের বিরুদ্ধাচরণ করেছিলেন। তাছাড়া নবাবের অহংকার

ও ধনলোভ, কৃষ্ণদাস ঘটনা, দুর্গ সংস্কার ও সামরিক প্রস্তুতি, নবাবের সঙ্গে কোম্পানির অর্থনৈতিক ও এক্তিয়ার সম্পর্কিত বিরোধ ও প্রাচ্য-পাশ্চাত্যের জীবনধারা, রীতিনীতি বা আইন ইত্যাদিও সিরাজদ্দৌলার পরিণতিকে ত্বরান্বিত করেছিল। পলাশির যুদ্ধের পর থেকেই বাংলার শিল্প ও বাণিজ্যের ওপর কোম্পানির আধিপত্য কায়েম হয় — আভ্যন্তরীণ পণ্যের দাম বাড়ে, দেশীয় বণিকেরা ক্ষতির সম্মুখীন হন, শিল্প ও বাণিজ্যের প্রতিটি ক্ষেত্রে কোম্পানির কর্মচারীরা একচেটিয়া অধিকার স্থাপন করে। ক্রমে একটি শক্তিশালী রাজনৈতিক শক্তি হিসাবে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির উত্থান হয়।



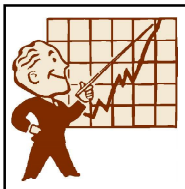
আসুন জেনে নিই

ক. কৃষ্ণদাস ঘটনা —নবাব সিরাজদ্দৌলার রাজনৈতিক প্রতিদ্বন্দ্বী ছিলেন তাঁর পিসি ঘসেটি বেগম। দেওয়ান রাজা রাজবল্লভ ঘসেটির হয়ে ঢাকা প্রদেশ শাসন করতেন। তাঁকে নবাব ঢাকার সম্পদের হিসাব দাখিল করতে বললে রাজবল্লভ ঘসেটির সঙ্গে পরামর্শ করে পুত্র কৃষ্ণদাসের হাতে সঞ্চিত সমস্ত টাকা ও অন্যান্য সম্পদ দিয়ে কলকাতায় ইংরেজদের আশ্রয়ে পাঠিয়ে দেন। ক্ষুব্ধ সিরাজ কলকাতার গভর্নর ড্রেককে সমস্ত ধন-সম্পত্তি সহ কৃষ্ণদাসকে প্রত্যর্পণ করতে আদেশ দেন। কিন্তু ড্রেক সেই আদেশ মানতে অস্বীকার করেন। এতে নবাবের ক্ষোভ বাড়ে এবং তিনি রাজবল্লভ, কৃষ্ণদাস তথা গভর্নর ড্রেককে সমুচিত শাস্তি দিতে মনস্থ করেন।

খ. কোম্পানির সঙ্গে অর্থনৈতিক ও এক্তিয়ারের বিরোধ— সম্রাট ফারুখশায়ারের ফরমানের সাহায্যে ১৭১৭ খ্রিস্টাব্দে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি বাংলা, বিহার ও উড়িষ্যায় শুল্কমুক্ত বাণিজ্যের অধিকার পেয়েছিল। বাংলার নবাবেরা এই ফরমানকে মেনে নিলেও সিরাজের আপত্তি ছিল কোম্পানির কর্মচারীরা ব্যক্তিগত ব্যবসাতেও একই নীতি গ্রহণ করায়। ইংরেজরা দেশীয় বণিকদের কাছে দস্তক বা ছাড়পত্র বিক্রি করে নবাবের রাজস্ব আদায়ে ক্ষতি করতেন। নিজেদের পাওনা দু-কোটি টাকা সিরাজ ইংরেজদের কাছে দাবি করলে তাঁরা সেটা মানতে অস্বীকার করেন। ফলে সিরাজ ইংরেজদের কাশিমবাজার কুঠি দখল করে নেন।

কোম্পানি কলকাতায় জমিদারি কিনলেও তাঁদের উপনিবেশ ছিল নবাবের কর্তৃত্বের অধীন। নবাবের কর্মচারীরা তহবিল তছরূপ ও অন্যান্য আর্থিক অপরাধ করে ইংরেজদের আশ্রয় নিত, যেমনটি করেছিলেন কৃষ্ণদাস। এভাবে অপরাধীদের আশ্রয় দিয়ে ইংরেজরা জমিদারি সনদ ভঙ্গ করে নবাবের সার্বভৌমত্বে ইচ্ছাকৃত ভাবে আঘাত করতেন। বিদেশী বণিকেরা এইভাবে এক্তিয়ারের বাইরে গিয়ে কাজ করলে সিরাজদ্দৌলার সঙ্গে বিরোধ বাঁধে।

৯.৩.১ দ্বৈত শাসন ব্যবস্থা



অগ্রগতি নির্ধারক প্রশ্ন

১. সিরাজদ্দৌলার পতনের কারণ সম্বন্ধে আপনার মতামত কী? (৮০ শব্দের মধ্যে)

১৭৬৪ খ্রিস্টাব্দে সংঘটিত বক্সারের যুদ্ধে ইংরেজ সেনাপতি হেক্টর মানরো দিল্লির বাদশাহ দ্বিতীয় শাহ্ আলমঞ্জ, অযোধ্যার নবাব সুজাউদ্দৌলা ও বাংলার নবাব মীরকাশিমকে হারিয়ে দেন। এই যুদ্ধের পর কোম্পানির অধিকার সম্প্রসারণের জন্য বোর্ড অফ ডিরেক্টরস লর্ড ক্লাইভকে দ্বিতীয়বার বাংলার গভর্নর হিসাবে মনোনীত করে পাঠান। কোম্পানির উচ্চপদস্থ কর্মচারীদের মধ্যে ভ্যান্সিটার্ট, কারনাক, আয়ারকুট ও মানরো অযোধ্যা ও দিল্লি অধিকার করে ব্রিটিশ সাম্রাজ্য গঠনের কথা ভেবেছিলেন। কিন্তু বিচক্ষণ ক্লাইভ সমকালীন পরিস্থিতি ও সৈন্যবলের কথা বিচার করে বাংলার বাইরে ইংরেজ কর্তৃত্বের সম্প্রসারণ করতে চাননি। অবশেষে ৭৬৫ খ্রিস্টাব্দে তৎকালীন বাংলার নবাব মীরজাফরের মৃত্যুর পর তাঁর ছেলে নাজমুদ্দৌলা মসনদে বসেন। তিনি রবার্ট ক্লাইভের সঙ্গে চুক্তি করে প্রতিরক্ষা ও বৈদেশিক সম্পর্ক পরিচালনার বিষয়টি কোম্পানির হাতে ছেড়ে দেন। কোম্পানির সঙ্গে নবাবের এই চুক্তির ফলেই বঙ্গে দ্বৈত শাসন ব্যবস্থা প্রচলিত হয়। ক্লাইভের ব্যবস্থাপনায় বাংলাদেশে রেজা খান ও বিহারে সিতাব রায় নবাবের দায়বদ্ধ না হয়েই শাসন ও রাজস্ব বিভাগের কাজকর্ম দেখাশোনা করতে শুরু করেন। চুক্তি অনুযায়ী নবাবের সৈন্যবাহিনি, ফৌজদারি বিচারব্যবস্থা, নিজামত বা শাসনব্যবস্থার ওপর কোম্পানির নিয়ন্ত্রণ স্থাপিত হয়। ১৭৬৫ থেকে ১৭৭২ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত এই দ্বৈত শাসনব্যবস্থা চলে। এই সময়কালে বঙ্গদেশে আইন-শৃঙ্খলার অবনতি ঘটেছিল, দস্যু বা ঠগীদের উৎপাত বেড়ে গিয়েছিল এবং বিচারব্যবস্থা ভেঙে পড়েছিল। এর ওপর দেখা দিল অষ্টাদশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধের সবচেয়ে বড়ো ঘটনা ছিয়াত্তরের মন্বন্তর, যার মূল কারণ ছিল অনাবৃষ্টি ও খাদ্যাভাব। কোম্পানির কোনো কর্তা ব্যক্তিই দেশের শাসনভার গ্রহণ করেননি। দুর্ভিক্ষের বছরে কোম্পানি কিছুটা ভূমি রাজস্ব মকুব করলেও বহু লক্ষ টাকার সোনা-রুপো ইংল্যান্ডে কর্তা ব্যক্তিরা নিজেদের নামে চালান করে দেন। অবৈধ উপায়ে অর্জিত এই সমস্ত ধনরত্ন তাঁরা নিজেদের দেশীয় রাজনীতিতে প্রভাব খাটানোর জন্য ব্যবহার করতেন। ফলে কোম্পানির বার্ষিক আয়ে ঘাটতি হতে দেখা যায়। সুতরাং অবস্থার উন্নতির জন্য ব্রিটিশ পার্লামেন্টকে এগিয়ে এসে ১৭৭৩-এ রেগুলেটিং অ্যাক্ট তৈরি করতে হয়। ১৭৮১-তে এর ত্রুটিগুলো দূর করার জন্য এই আইনের একটি সংশোধনীও আনা হয়।



অগ্রগতি নির্ধারক প্রশ্ন

২. কোম্পানি আমলের দ্বৈত শাসন ব্যবস্থা সম্পর্কে আপনি যা জানেন লিখুন। (১৫০ শব্দের মধ্যে)

৯.৩.২ ব্রিটিশ সাম্রাজ্য কায়েমের নানা কৌশল

রেগুলেটিং অ্যাক্ট-এর লক্ষ্য ছিল ব্রিটিশ সরকার ও কোম্পানির মধ্যে সম্পর্ক নির্ধারণ করা, কোম্পানির বোর্ড অফ ডিরেক্টরস্-এর পুনর্গঠন করে বঙ্গদেশ তথা ভারতের শাসনব্যবস্থার ওপর নিয়ন্ত্রণ স্থাপন করা আর ভারতে এমন একটি কেন্দ্রীয় শাসন-কাঠামো গড়ে তোলা যাতে সমস্ত ব্রিটিশ উপনিবেশগুলোর ওপর কর্তৃত্ব করা। অর্থাৎ এই আইনের সাহায্যে কোম্পানি ভারতের শাসনব্যবস্থার ওপর পুরোপুরি নিয়ন্ত্রণের অধিকার পেল। আইনে বঙ্গদেশের জন্য একজন গভর্নর জেনারেল ও চার সদস্য বিশিষ্ট একটি কাউন্সিলের ব্যবস্থা করা হয়, যাঁরা লন্ডনের কোর্ট অফ ডিরেক্টরস্-এর নির্দেশ অনুযায়ী শাসন চালাবেন এবং সময়ে সময়ে ব্রিটিশ সরকারকে শাসন সংক্রান্ত তথ্যাদি জানাবেন। সেই হিসাবে ওয়ারেন হেস্টিংস প্রথম গভর্নর জেনারেল হয়ে কলকাতায় আসেন ১৭৭৩ খ্রিস্টাব্দে। পরের বছর কলকাতায় সুপ্রিম কোর্ট স্থাপিত হয়। কোম্পানির শাসনকে সুদৃঢ় করতে এবং সরকারি নিয়ন্ত্রণকে আরও জোরদার করতে ১৭৮৪ খ্রিস্টাব্দে ব্রিটিশ পার্লামেন্টে আনা হয় প্রধানমন্ত্রী পিটের ভারত শাসন আইন। হেস্টিংসের পর গভর্নর জেনারেল হয়ে আসেন লর্ড কর্ণওয়ালিস। তিনি বঙ্গদেশে ভূমিব্যবস্থার নিয়ন্ত্রণ ও রাজস্ব বৃদ্ধির লক্ষ্যে একের পর এক আইন প্রবর্তন করেছিলেন। এর মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হল চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত আইন। এই আইনই বঙ্গদেশ তথা ভারতে অর্থনৈতিক ও সামাজিক ভাবে সবল মধ্যস্বত্বভোগীর উদ্ভবের মূল কারণ। এই শ্রেণিটিকে সৃষ্টি করে কর্ণওয়ালিস ভূমির ওপর কোম্পানির দখলকে নিশ্চিত করলেন। তাছাড়া এই আইনের সাহায্যে কোম্পানি জমিদারদের ভূস্বামী ও কৃষকদের অধীনস্থ প্রজা করে দিয়েছিল। ফলে কৃষকেরা চিরদিনের জন্য ভূমির অধিকার হারিয়েছিলেন। অন্যদিকে এই আইন অনুপস্থিত জমিদারতন্ত্র তৈরি করেছিল, যাঁদের থেকে বাবুসমাজের সৃষ্টি। কর্ণওয়ালিশের আশা অনুযায়ী নতুন ব্যবস্থায় নব্য বা হঠাৎ জমিদারেরা অর্থাৎ কোম্পানির সূর্যাস্ত আইনের দোহাই দিয়ে ভূমি ও রাজস্বব্যবস্থার সঙ্গে সম্পর্কহীন যে-সব ব্যক্তি বনেদি জমিদারদের জমি নিলামে কিনে জমিদার হয়েছিলেন, তাঁরা গ্রামে না থেকে শহর কলকাতায় বড়ো বড়ো বাড়ি তৈরি করে থাকতে শুরু করেছিলেন। এঁরাই সেই তথাকথিত বাবু। এই ধরনের বিভিন্ন শ্রেণি তৈরি করে কোম্পানি নিজেদের শাসনব্যবস্থাকে মজবুত করে নিয়েছিল। ব্রিটিশ পার্লামেন্ট-এ গৃহীত ১৭৯৩ খ্রিস্টাব্দের চার্টার আইন এই শাসনব্যবস্থার সহায়ক হয়েছিল। কেননা আইনটি এদেশে প্রথম নাগরিক আইন প্রবর্তন করেছিল যা কোম্পানির শাসনকে সুদৃঢ় করেছিল।

৯.৩.৩ কোম্পানি শাসনের শেষ পর্যায়

বিভিন্ন শ্রেণির সৃষ্টি, অর্থনৈতিক অসাম্য, কায়েমি স্বার্থের আস্ফালন, নির্দয় শাসন নীতি ইত্যাদি নানা কারণে কোম্পানির শাসন নিস্তরঙ্গ ছিল না। কৃষক চাষ করল, ফসল পেল না। ব্যবসায়ের নামে যে লুণ্ঠন-অত্যাচার-উৎপীড়ন শুরু হল তাতে জনজীবন শুধু বিপর্যস্ত হল না — ধ্বংসের মুখে পড়ল গ্রাম্য অর্থনীতি। ফলে দিকে দিকে শ্রমজীবী মানুষের নিয়ে বিদ্রোহ দানা বেঁধে ওঠে। এদের মধ্যে উল্লখযোগ্য সন্ন্যাসী-ফকির বিদ্রোহ, নায়েক বিদ্রোহ, তীতুমিরের বিদ্রোহ, সাঁওতাল বিদ্রোহ এবং সিপাহী বিদ্রোহ। কোম্পানির সুচতুর শাসকেরা অর্থবল ও সৈন্যবলের সাহায্যে এইসব বিদ্রোহ দমন করলেও ১৮৫৭ সালের সিপাহী বিদ্রোহ ব্রিটিশ পার্লামেন্টকে ভারত শাসননীতি সম্পর্কে ভাবতে বাধ্য করে। একদিকে চাকরির নানা অদ্ভুত ও কষ্টদায়ক শর্ত, অন্যদিকে ধর্মান্তরণের ভয় সৈন্যদের মধ্যে অসন্তোষের জন্ম দিয়েছিল। প্রায় একই সময়ে ভারতের পরম্পরাগত উত্তরাধিকার ব্যবস্থায় হস্তক্ষেপ করে কোম্পানি সাতারা, নাগপুর, সম্বলপুর, উদয়পুর, ঝাঁসি ইত্যাদি রাজ্যগুলো অধিকার করে নেয়। ফলে এইসব রাজ্যের রাজারা কোম্পানির শাসনকর্তাদের ওপর ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠেন। আবার কোথাও কোথাও অত্যাচারিত কৃষকরা জোর করেই তালুকদারদের বিদ্রোহে নামান। সুতরাং প্রায় একই সময়ে ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে ব্রিটিশ কোম্পানির শাসকের বিরুদ্ধে ভারতীয় জনতা গর্জে ওঠেন। ১৮৫৮ খ্রিস্টাব্দের ২ আগস্ট ব্রিটিশ পার্লামেন্ট অ্যাক্ট ফর দি বেটার গভর্নমেন্ট অব্ ইন্ডিয়া নামে একটি আইন প্রণয়ন করেন। সেই অনুযায়ী রানি ভিক্টোরিয়াকে ব্রিটিশ ভারতের সম্রাজ্ঞী ঘোষণা করা হয়। সেদিন থেকেই বঙ্গদেশ তথা ভারতে কোম্পানি শাসনের অবসান হয়। অতএব ১৭৫৭ খ্রিস্টাব্দে পলাশি যুদ্ধের পর দ্বৈত শাসনের পর্ব দিয়ে বঙ্গদেশে কোম্পানি আমলের যে সূচনা হয়েছিল তা শেষ হয় ১৮৫৮ খ্রিস্টাব্দে রানি ভিক্টোরিয়ার শাসনভার গ্রহণের মধ্য দিয়ে।



আসুন জেনে নিই

কোম্পানি আমলে গভর্নর ও গভর্নর জেনারেলদের তালিকা, কার্যকাল ও গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা

কার্যকাল	নাম	গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা
১৭৭৩-১৭৮৫	লর্ড ওয়ারেন হেস্টিংস্ -	এশিয়াটিক সোসাইটি/ মুদ্রাযন্ত্র স্থাপন/ মন্বন্তর
১৭৮৬-১৭৯৩	লর্ড কর্ণওয়ালিস্ -	চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত
১৭৯৩- ১৭৯৮	জন শোর -	রুশ নাট্যকার লিয়েবেদেফের আগমন
১৭৯৮- ১৮০৫	রিচার্ড ওয়েলেসলি -	ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের প্রতিষ্ঠা
১৮০৫ জুলাই-অক্টোবর — লর্ড কর্ণওয়ালিস্		

১৮০৫-১৮০৭ —	জর্জ হিলারিও বার্লো	
১৮০৭-১৮১৩ —	লর্ড মিন্টো -	প্রশাসনিক সংস্কার/ অমৃতসর চুক্তি
১৮১৩-১৮২৩ —	মারকিউইস্ অফ হেস্টিংস্ -	হিন্দু কলেজ প্রতিষ্ঠা/প্রথম সচিত্র ছাপা বই 'অন্নদামঙ্গল'
১৮২৩-১৮২৮ —	লর্ড আর্মহারস্ট -	ইয়াণ্ডাবু সন্ধি/সংস্কৃত কলেজ প্রতিষ্ঠা
১৮২৮-১৮৩৫ —	লর্ড উইলিয়াম বেণ্টিঙ্ক	(প্রথম গভর্নর জেনারেল) - সতীদাহ নিবারণ/জাতীয় গ্রন্থাগার
১৮৩৬- ১৮৪২ —	লর্ড অকল্যান্ড	
১৮৪২- ১৮৪৪ —	লর্ড অ্যালেনবরো	
১৮৪৪- ১৮৪৮ —	হেনরি হার্ডি	
১৪৮-১৮৫৬ —	মারকিউইস্ অফ ডালহৌসি - টেলিগ্রাফ/ রেল লাইন	
১৮৫৬-১৮৫৮ —	চার্লস্ ক্যানিং - সিপাহী বিদ্রোহ/ কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়/ বিধবা বিবাহ আইন প্রণয়ন	

৯.৪ নবজাগরণ

কোম্পানির আমলে অর্থাৎ ব্রিটিশ শাসনের প্রথম পর্বে কলকাতা ছিল রাজধানী। স্বাভাবিক ভাবেই তাই আধুনিক পাশ্চাত্য সংস্কৃতির প্রভাব প্রথম অনুভূত হয় বঙ্গদেশেই। এই প্রভাবের ফলে এখানে নবজাগরণের সূচনা হয় যা বাংলার রেনেসাঁস বলেও পরিচিত। সেজন্য কলকাতাকে নবজিজ্ঞাসার পীঠস্থান বলা হয়। উনিশ শতকে এই কলকাতাকে কেন্দ্র করেই পশ্চিমের জ্ঞান-বিজ্ঞান, যুক্তিবাদ, দর্শন, মানবতাবাদ, উদারনীতি ইত্যাদি বাঙালির মনোজগতে এক অভূতপূর্ব পরিবর্তন এনেছিল। এই পরিবর্তনই বঙ্গদেশে নবজাগরণের সূত্রপাত ঘটায়। এই নবজাগরণে বাংলার প্রাচ্যবাদী ও পাশ্চাত্যবাদী — দুই শ্রেণির অবদান ছিল। প্রাচ্যবাদীরা হিন্দুশাস্ত্রগুলোকে এবং পাশ্চাত্যবাদীরা ইংরেজি শিক্ষার গরিমাকে গুরুত্ব দিচ্ছিলেন। কিন্তু এই দুই শ্রেণির সমন্বয়ে তৈরি মিশ্র সংস্কৃতি জন্ম নিয়েছিল এবং এক উন্নত শ্রেণির জন্ম দিয়েছিল। এই শ্রেণিটিই বাংলার নবজাগরণের মুখ্য পৃষ্ঠপোষক।

৯.৪.১ নবজাগরণের সময়পর্ব

সুশোভন সরকারের সিদ্ধান্ত অনুসরণ করে বাংলায় নবজাগরণের কালকে পাঁচটি ভাগে বিভক্ত করা যায় —

ক. ১৮১৫ থেকে ১৮৩৩ খ্রিষ্টাব্দ — একে রামমোহনের পর্ব বলা যায়। ১৮১৫-তে রামমোহন স্থায়ীভাবে কলকাতায় এসে বসবাস করতে শুরু করেন এবং সমাজ-সংস্কারমূলক কাজকর্মে জড়িয়ে পড়েন।

খ. ১৮৩৩ থেকে ১৮৫৭ খ্রিষ্টাব্দ — একে ইয়ং বেঙ্গলের পর্ব বলা যায়। বঙ্গের বিভিন্ন অঞ্চলে শ্রমজীবী মানুষের প্রতিবাদ-বিদ্রোহের পাশাপাশি সাময়িক পত্রিকায় সংস্কার ও ব্রিটিশ সরকারের সমালোচনামূলক লেখা প্রকাশিত হয়।

গ. ১৮৫৭ থেকে ১৮৮৫ খ্রিষ্টাব্দ —একে ভারতের রাজনৈতিক চেতনা উদ্বোধনের পর্ব বলে উল্লেখ করা যায়। জাতীয় কংগ্রেসের প্রতিষ্ঠা পর্যন্ত এর ব্যাপ্তি।

ঘ. ১৮৮৫ থেকে ১৯০৫ খ্রিষ্টাব্দ — একে জাতীয় আন্দোলনের প্রথম পর্ব বলা যায়।

ঙ. ১৯০৫ থেকে ১৯১৯ খ্রিষ্টাব্দ — একে অসহযোগ আন্দোলনের পর্ব বলা যায়।

অনেকে ইতালিয় রেনেসাঁসের প্রেক্ষাপটে রেখে বঙ্গদেশে নবজাগরণ আন্দোলনের ধারণাকে স্বীকৃতি দিতে চাননি। তাঁদের মতে 'ইউরোপীয় মডেলের কোনো আধুনিক নবজাগরণ বাংলাদেশে অথবা বাঙালী সমাজে হয়নি।' (বাংলার নবজাগৃতি : ১৭৯) তবে এই ধরনের বক্তব্য যাঁরা রেখেছেন, তাঁরা কিন্তু বঙ্গীয় নবজাগরণকে একেবারে অস্বীকার না করে মেনে নিয়েছেন যে, "ঊনবিংশ শতাব্দীর কলিকাতা নিঃসন্দেহে বাংলার 'ফ্লোরেন্স', বাংলার সামাজিক ও সাংস্কৃতিক নবজাগরণের কেন্দ্র।" (বাংলার নবজাগৃতি : ৫০)। নবজাগৃতির প্রক্রিয়াকে মর্যাদা দিয়ে তাই নবজাগরণের কালকে তিনটি পর্যায়ভুক্ত করা হয়েছে — প্রথম পর্যায়ে নবচেতনার প্রবক্তারা ইউরোপীয় প্রভাবে আকৃষ্ট হয়ে ভারতীয় সংস্কৃতিকে নতুন ভাবে বিচার করতে শুরু করেন। এই পর্যায়ের উল্লেখযোগ্য ব্যক্তিত্ব রামমোহন ও বিদ্যাসাগর। দ্বিতীয় পর্যায়ে আছে ইউরোপীয় প্রভাবের বিরুদ্ধে প্রতিক্রিয়া। বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ও রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর এই পর্যায়ের অগ্রদূত। তৃতীয় পর্যায়ে ভারতীয় আধ্যাত্মিক শক্তিকে মূল উপাদান হিসাবে ব্যবহার করে শুরু হয়েছিল সৃষ্টি পদ্ধতি। বিবেকানন্দ এই পর্যায়ের প্রধান প্রবক্তা। অর্থাৎ রামমোহনে শুরু হয়ে বিবেকানন্দে শেষ হয়েছে বঙ্গীয় নবজাগরণের পর্ব — এটাই গরিষ্ঠ সংখ্যকের মত। তবে সূচনা ও সমাপ্তি বিন্দু মতবৈচিত্র্যর অভাব নেই। সেই অনুযায়ী বলা যায় 'সিপাহী বিদ্রোহ' এই নবজাগরণ পর্বের পূর্বভূমিকা, ১৭৮৪ খ্রিস্টাব্দে উইলিয়াম জোন্সের উদ্যোগে 'এশিয়াটিক সোসাইটি' স্থাপন এর সলতে পাকানোর পর্ব, ১৮১৫ খ্রিস্টাব্দে রামমোহনের উদ্যোগে কলকাতায় নবযুগের প্রকৃত সূচনা আর কুড়ি শতকে রবীন্দ্রনাথ ও তাঁর সমকালীন নানা পরিঘটনা হল বঙ্গীয় নবজাগরণের শেষ সীমা। অবশ্য অন্নদাশঙ্কর রায়ের মতো কেউ কেউ মনে করেন, রেনেসাঁস রবীন্দ্রোত্তর যুগেও শেষ হয়ে যায়নি। আর তা বঙ্গীয় রেনেসাঁসে সীমাবদ্ধ না থেকে ভারতীয় রেনেসাঁসে পরিণত হয়েছে। হিন্দি সাহিত্যের ভারতেন্দু হরিশ্চন্দ্র, অসমিয়া সাহিত্যের লক্ষ্মীনাথ বেজবরুয়া, ওড়িয়া সাহিত্যের ফকিরমেহন সেনাপতি ইত্যাদি সবাই এই রেনেসাঁসের নায়ক।



অগ্রগতি নির্ধারক প্রশ্ন

৩. বঙ্গীয় নবজাগরণের সূচনা ও সমাপ্তিকাল নিয়ে যে মত বৈচিত্র্য আছে তা পর্যালোচনা করুন। (১০০ শব্দের মধ্যে)

৯.৪.২ নবজাগরণের কারণ, বৈশিষ্ট্য ও প্রতিফলন

ব্রিটিশ প্রশাসকদের পৃষ্ঠপোষকতায় এশিয়াটিক সোসাইটির প্রতিষ্ঠা ও প্রাচ্যবিদ্যার চর্চা, খ্রিষ্টান মিশনারিদের ধর্মপ্রচার, ইংরেজি শিক্ষাবিস্তার, পাশ্চাত্য শিক্ষা-সংস্কৃতি-দর্শনের প্রসার, কুটির শিল্পের বদলে ঔদ্যোগিক শিল্পের প্রসার এবং সর্বোপরি ব্রিটিশ সরকারের মুনাফা লোভী ও পীড়নমূলক শাসননীতি নবজাগরণের কারণ হিসাবে চিহ্নিত।

বঙ্গীয় নবজাগরণের বৈশিষ্ট্য হিসাবে নিম্নলিখিত বিষয়গুলোকে চিহ্নিত করা যায় —

ইতিহাস সচেতনতা, ঐতিহ্যের পুনরুজ্জীবন, ধর্মান্দোলন, ব্যক্তিস্বাতন্ত্র এবং ব্যক্তির বহুবিদ্যা ও কাজে পারদর্শিতা, স্ববিরোধিতা, শিক্ষা সংস্কার, সমাজ সংস্কার, জাতীয়তাবোধের উন্মেষ, সাংস্কৃতিক জাগরণ, হিন্দু জাতীয়তাবাদের উত্থান ও অবশ্যই নগরকেন্দ্রিকতা।

বঙ্গদেশে নবজাগরণ মূলত তিন ধরনের সংস্কারধর্মী কর্মকাণ্ডের মধ্যে প্রতিফলিত হতে দেখা যায় — ধর্মসংস্কার, শিক্ষা সংস্কার ও সমাজ সংস্কার। এখানে সংবাদ-সাময়িকপত্রেরও একটি বড়ো ভূমিকা রয়েছে। কারণ এই সমস্ত সংস্কারমুখী কর্মকাণ্ডের প্রচারে সেদিনকার সংবাদ ও সাময়িকপত্রগুলো মুখ্য ভূমিকা নিয়েছিল। তাছাড়া বাংলা সাহিত্যে, সঙ্গীতচর্চা, নাট্যচর্চাতেও এর নানা প্রতিচ্ছবি সহজলভ্য।



অগ্রগতি নির্ধারক প্রশ্ন

৪. উনিশ শতকের ধর্মসংস্কার বিষয়ে আপনার মতামত বিশ্লেষণ করুন। (১০০ শব্দের মধ্যে)

৯.৪.৩ নবজাগরণ ও ধর্মসংস্কার

বঙ্গদেশে উনিশ শতকীয় ধর্মান্দোলনের অন্তত চারটি পক্ষ-প্রতিপক্ষ ছিল যাঁরা নবজাগরণের প্রক্রিয়াকে এগিয়ে নিয়ে যেতে সহায়ক হয়েছিলেন। এই চারটি পক্ষ হলেন রক্ষণশীল সম্প্রদায়, মিশনারি সম্প্রদায়, রামমোহন ও ব্রাহ্মসমাজ ও ডিরোজিও পন্থী ইয়ংবেঙ্গল।

রক্ষণশীলেরা নবাবি আমল থেকেই ন্যায়-স্মৃতি-সংহিতাচর্চা এবং সনাতন ধর্মীয় রীতিনীতিকে আঁকড়ে ধরেছিলেন। ইংরেজ আমলে প্রাচীন ধর্মীয় ঐতিহ্য ও সংস্কার, লোকাচার ইত্যাদিকে কঠোর ভাবে পালন করতেন। ধর্মরক্ষার ভার ছিল সমাজের অধিকারভোগী 'হঠাৎ-ধনী' সমাজ। এঁদের বেশিরভাগই মুখে হিন্দু আচার সর্বস্বতার কথা বললেও কাজে তার বিপরীতটাই করতেন। রক্ষণশীলদের সংগঠন ছিল 'ধর্মসভা' আর মুখপত্র ছিল সমাচার চন্দ্রিকা, সম্বাদ প্রভাকর, তিমিরনাশক ইত্যাদি। মুখ্য পৃষ্ঠপোষক ছিলেন রামকমল সেন, ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়, রাজা রাধাকান্ত দেবের মতো বেশ কিছু ধনাঢ্য ব্যক্তি। এঁদের মধ্যে অবশ্য স্ববিরোধিতাও ছিল, যা উনিশ শতকীয় নবজাগরণ আন্দোলনের অন্যতম বৈশিষ্ট্য।

বঙ্গদেশে কোম্পানি আমলের সূচনাপর্বে কোম্পানির কর্তা ব্যক্তিদের অন্যতম নীতি ছিল এদেশীয় ধর্মবিশ্বাস ও আচার-অনুষ্ঠানে হস্তক্ষেপ না করা। খ্রিষ্টান মিশনারি উইলিয়াম কেরি, মার্শম্যান বা ওয়ার্ডকে কাজকর্ম চালানোর জন্য কলকাতা নয় শ্রীরামপুরে মিশন স্থাপন করতে হয়। কিন্তু ওয়েলেসলির শাসনকালে এই অবস্থার পরিবর্তন হয়। ১৮০০ খ্রিস্টাব্দের ২৮ ডিসেম্বর বাঙালি ছুতোর কৃষ্ণ পাল সর্বপ্রথম ধর্মান্তরিত হন। এরপর ১৮০২ খ্রিস্টাব্দে কায়স্থ পীতাম্বর সিং খ্রিষ্টধর্ম গ্রহণ করেন। বয়স্কদের কাছে বাইবেল সম্পর্কিত বক্তৃতা, তরুণদের বাইবেল শিক্ষা, বাইবেলের সরল বাংলায় অনুবাদ — এই তিন প্রক্রিয়ায় মিশনারিরা ধর্মান্তরণ প্রক্রিয়া চালাতে শুরু করেন। নিম্নবর্ণের লোক, জাতিচ্যুত ও নিতান্ত দরিদ্ররাই খ্রিষ্টান হত। পরের দিকে কিছু কিছু উদারপন্থী সম্ভ্রান্ত বাঙালি এই ধর্ম গ্রহণ করেছিলেন। যেমন মহেশচন্দ্র ঘোষ, কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়, লালবিহারী দে প্রমুখ।

খ্রিষ্টান পাদ্রি এবং গোঁড়া হিন্দু শাস্ত্রকারদের বিরুদ্ধে মাথা তুলে দাঁড়িয়েছিলেন রাজা রামমোহন রায়। তাঁর প্রতিষ্ঠিত আত্মীয়সভায় এসেছিলেন বাঙালি জমিদার সহ অভিজাত ও বুদ্ধিজীবী শ্রেণির মানুষ। এখানে খ্রিষ্টান ত্রিতত্ত্ব, জাতিভেদ সমস্যা, বহুবিবাহ, বাল্যবিবাহ, সতীদাহ ইত্যাদি সমস্যা নিয়ে আলোচনা হত। 'পাদ্রি ও শিষ্য সম্বাদ', 'ভট্টাচার্য্যের সহিত বিচার', 'সুব্রহ্মণ্য শাস্ত্রীর সহিত বিচার' ইত্যাদি নানা পুস্তিকায় তিনি খ্রিষ্টান ও গোঁড়া হিন্দুদের মতের বিরোধিতা করেছিলেন। 'Brahmunical Magazine', 'সম্বাদ কৌমুদী', 'মীরাৎ-উল-আখবার' ইত্যাদি পত্রিকা ছিল তাঁর মতামত প্রচারের বাহক। বাদানুবাদের আবহে 'আত্মীয়সভা'র সঙ্কট দেখা দিলে রামমোহন 'ইউনিটেরিয়ান কমিটি' নামে একটি সভা স্থাপন করেন। ১৮২৮ খ্রিস্টাব্দে এই সভার নাম হয় 'ব্রাহ্মসমাজ'। রামমোহনের মৃত্যুর পর দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর ব্রাহ্মসমাজের দায়িত্ব নেন। প্রকাশিত হয় 'তত্ত্ববোধিনী' পত্রিকা। নানা সংস্কারমুখী কর্মকাণ্ডের ভেতর দিয়ে ব্রাহ্ম আন্দোলন এগিয়ে চলে।

ডিরোজিওপন্থী ইয়ংবেঙ্গল সম্প্রদায় ছিল ঘোর সংশয়বাদী, যুক্তিবাদী, খ্রিষ্টধর্মের প্রতি সহানুভূতিশীল কিন্তু উদাসীন। ডিরোজিওর ছাত্রদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য রসিককৃষ্ণ মল্লিক, দক্ষিণারঞ্জন মুখোপাধ্যায়, কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়, রামতনু লাহিড়ি প্রমুখ। রামমোহনপন্থীদের কার্যকলাপ যখন হিন্দুসমাজে আলোড়ন তুলেছে, সেইসময় ১৮২৬ খ্রিস্টাব্দে হিন্দু কলেজের শিক্ষক হিসাবে ডিরোজিওর নিযুক্তি এক নতুন যুগের সূচনা করে। পাশ্চাত্য জ্ঞান-বিজ্ঞানের আলোক প্রাপ্ত যুক্তিবাদী তরুণ বাঙালি শিষ্যরা প্রচলিত হিন্দুধর্ম ও তার নানা আচার-আচরণের বিরুদ্ধে মাথা তুলে দাঁড়িয়েছিলেন। এঁদের মুখপত্র ছিল 'জ্ঞানান্বেষণ' পত্রিকা। ধর্মান্তরণের জন্য সরকারি সাহায্য নেওয়ায় এখানে মিশনারিদের সমালোচনাও তাঁরা করেছিলেন। ডিরোজিওর মৃত্যুর পর ইয়ংবেঙ্গলিদের ধর্মীয় চিন্তাকে প্রভাবিত করেছিলেন ডেভিড হেয়ার। যে-কোনো ধরনের ধর্মীয় গোঁড়ামিকে এই ইয়ংবেঙ্গলরা প্রত্যাখ্যান করেছিলেন। পরবর্তী কালে হয়ত এঁদের অনেকেই খ্রিষ্টান বা সনাতন হিন্দু ধর্মের কাছে ফিরে গেছেন। কিন্তু যৌবনকালের যুক্তিবাদের প্রভাব বাংলার সমাজ জীবনে পড়েছিল।



অগ্রগতি নির্ধারক প্রশ্ন

৬. বঙ্গে স্ত্রীশিক্ষা বিস্তারে কয়েকজন সমাজপতির প্রচেষ্টাকে লিপিবদ্ধ করুন (১৫০ শব্দের মধ্যে)

৯.৪.৪ নবজাগরণ ও শিক্ষাসংস্কার

পাশ্চাত্য শিক্ষা বঙ্গদেশে প্রচলিত হবার আগেটোল, পাঠশালা, মাদ্রাসা, মক্তব প্রভৃতি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান বিভিন্ন শ্রেণি, বর্ণ ও ধর্মাবলম্বী বাঙালির শিক্ষার প্রয়োজন মেটাত। উনিশ শতকের শিক্ষাসংস্কার মূলত পাশ্চাত্য শিক্ষার প্রবর্তন ও প্রসারের আয়োজনে ব্রিটিশ আধিকারিক, যাজক ও বাঙালি ভদ্রলোকের অংশগ্রহণে সম্ভব হয়ে উঠেছিল। ১৮৩৫ খ্রিস্টাব্দে মেকলের প্রতিবেদন অনুসারী বেণ্টিঙ্কের শিক্ষানীতি ঘোষণা পর্যন্ত সরকারি শিক্ষানীতিতে 'ওরিয়েন্টালিস্ট'দের মতামতই প্রাধান্য পাচ্ছিল। এঁরা মনে করতেন, প্রাচ্যবিদ্যার চর্চাকে উপেক্ষা করে ইংরেজি ভাষার মাধ্যমে পাশ্চাত্য জ্ঞান-বিজ্ঞান চর্চা ফলপ্রসূ হবে না। ফলে কলকাতায় ১৮২৪-এ সংস্কৃত কলেজ স্থাপিত হয়েছিল। কিন্তু ইংরেজ প্রশাসকেরা চাইতেন এমন একটি শ্রেণি তৈরি করতে যাঁরা হবেন দেশীয় সমাজের স্বাভাবিক নেতা অথচ ব্রিটিশ শাসনের অনুগত। বাঙালি ভদ্রলোক সমাজপতিদের অধিকাংশ ইংরেজি শিক্ষানীতির সমর্থক ছিলেন। ফলে বাংলা প্রেসিডেন্সি হয়ে উঠেছিল পাশ্চাত্য শিক্ষার বা ঔপনিবেশিক শিক্ষানীতির মূল কেন্দ্র। ১৮৫০ খিষ্টাব্দের মধ্যেই কলকাতা শহরে বেসরকারি উদ্যোগে ষাটটির বেশি ইংরেজি স্কুল স্থাপিত হয়েছিল। অবশ্য মেকলের শিক্ষানীতি প্রকাশের আগেই বঙ্গদেশে কোথাও কোথাও ইংরেজি শিক্ষার আয়োজন চলছিল। যেমন, কলকাতার অযানড্রুজ্ প্রেসবেটোরিয়ান চার্চের ১৭৩১ খ্রিষ্টাব্দে অবৈতনিক ইংরেজি বিদ্যালয়, ১৮০০ খ্রিষ্টাব্দে ভবানীপুরে জগমোহন বসুর বিদ্যালয়, ডেভিড ড্রামণ্ডের ধর্মতলা আকাডেমি, শেরবোর্নের পাঠশালা ইত্যাদি। ১৮১৪ খ্রিষ্টাব্দে রবার্ট মে মেয়েদের জন্য বালিকা বিদ্যালয় স্থাপন করেছিলেন। এগুলোতে মূলত ইংরেজি শব্দের বাংলা রূপান্তর শেখানো হত। কিন্তু মেকলের শিক্ষানীতি অনুযায়ী স্কুলে স্কুলে সরকারি মদতে ইংরেজি শিক্ষা শুরু হল।

উনিশ শতকের প্রথমার্ধে রাজা রাধাকান্ত দেব একাধারে ইংরেজি উচ্চশিক্ষা, বাংলা শিক্ষা, স্ত্রীশিক্ষা, বৃত্তিমূলক শিক্ষা এবং সাধারণ পাঠশালার শিক্ষার প্রসারে চিন্তাভাবনা করেছিলেন। নানা কর্মতৎপরতা দেখা গিয়েছিল এই শিক্ষা প্রসার সম্বন্ধে। গভর্নর হেস্টিংস্-এর স্ত্রী মারশিওনেস্-এর আগ্রহে প্রতিষ্ঠিত হয় 'কলকাতা স্কুল বুক সোসাইটি'। রাধাকান্ত এর পরিচালন সমিতির অন্যতম সদস্য ছিলেন। তিনি আবার ইংরেজি শিক্ষার পীঠস্থান হিন্দু কলেজেরও পরিচালন সমিতির সদস্য ছিলেন। তাঁর সব বইই মূলত শিক্ষা বা ভাষা বিষয়ক। ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর বাঙালি ভদ্রলোকের বাংলা শিক্ষা বিষয়ে তাঁর কর্মপ্রচেষ্টাকে সীমাবদ্ধ রেখেছিলেন। বাংলা শিক্ষাকে ইংরেজি 'লিবারেল' শিক্ষার ধাঁচে গড়ে তোলার ক্ষেত্রে তাঁর অবদান অপরিসীম। ১৮৫৪ খ্রিস্টাব্দে

'উডস্ ডেসপ্যাচ' ইংরেজি ভাষায় উচ্চশিক্ষার সঙ্গে দেশীয় ভাষায় প্রাথমিক শিক্ষার গুরুত্বকে স্বীকৃতি দিয়েছিল। একই সঙ্গে তা ইংরেজি ও দেশীয় ভাষায় শিক্ষার ভারসাম্য বিধানের প্রয়োজন স্বীকার করে নিয়েছিল। তার ফলে বাংলা শিক্ষার আধুনিকীকরণের প্রয়াস গতি লাভ করে। অন্যদিকে কেশবচন্দ্র সেন জনশিক্ষার প্রয়োজনে 'সুলভ সমাচার' নামে এক পয়সা দাম দিয়ে সহজ ভাষায় একটি সাপ্তাহিক পত্রিকা প্রকাশ করেছিলেন এবং তার পাশাপাশি একটি সান্ধ্য বিদ্যালয় স্থাপন করেন। মূলত বয়স্কশিক্ষা বিস্তারের লক্ষ্যে তিনি একাজ করেছিলেন। স্ত্রীশিক্ষা বিষয়টি রাধাকান্ত দেবের চিন্তায় প্রাধান্য পেয়েছিল। তাঁরই উৎসাহে গৌরমোহন বিদ্যালঙ্কার 'স্ত্রীশিক্ষা বিধেয়ক' নামে পুস্তিকা লিখেছিলেন। ক্রমে স্ত্রীশিক্ষা বিষয়টি সমাজে গুরুত্ব পায়। এইভাবে নানামুখী প্রচেষ্টায় উনিশ শতকে ইংরেজি শিক্ষার পাশাপাশি দেশীয় শিক্ষানীতিতেও সংস্কারমূলক পদক্ষেপ নেওয়া হয়।

৯.৪.৫ নবজাগরণ ও সমাজসংস্কার

উনিশ শতকের সমাজ সংস্কার আন্দোলনের বেশিরভাগটাই ছিল নারীকেন্দ্রিক। এই কালের প্রায় সব সংস্কারকই সমাজে নারীর অবস্থান সম্পর্কে সচেতন ছিলেন। নারীজাতির কল্যাণ কামনায় তাঁরা জনমত তৈরি করেছেন বিভিন্ন পুস্তিকা প্রকাশ করে, সাময়িক পত্রে লিখে এবং নানা সংস্কারমুখী আন্দোলনে প্রত্যক্ষ ভাবে জড়িয়ে। তাঁরা সতীদাহ প্রথা বন্ধ করার সহায়ক হয়েছিলেন, কৌলীন্যপ্রথার বিরুদ্ধে জনমত গড়ে তুলেছিলেন, প্রচলিত কুসংস্কারগুলোকে উপেক্ষা করে মেয়েদের শিক্ষালাভের ব্যবস্থা করে দিয়েছিলেন, বহুবিবাহ রোধ ও বিধবাবিবাহ প্রচলনে সহায়কের ভূমিকা গ্রহণ করেছিলেন। এছাড়া সমাজের আরও অনেক কুসংস্কার বা দোষ দূরীকরণের চেষ্টা হয়েছিল। তারমধ্যে বাল্যবিবাহ রোধ ও মদ্যপান নিবারণ অন্যতম। সহমরণ বা সতীদাহ প্রথার সঙ্গে জড়িয়ে আছে রামমোহনের নাম। যদিও ১৮০৩ খ্রিষ্টাব্দ থেকে মিশনারিরা এর বিরুদ্ধে সোচ্চার হয়েছিলেন। বিধবাবিবাহ থেকে শুরু করে বাল্যবিবাহ পর্যন্ত বিভিন্ন আন্দোলনে বেশি আগ্রহী ছিলেন ইয়ংবেঙ্গলিরা। 'জ্ঞানান্বেষণ', 'বেঙ্গল স্পেকটেটর' প্রভৃতি পত্রিকায় তাঁরা এ-বিষয়ে মতামত প্রকাশ করে জনমত গড়ে তোলেন। ব্রিটিশ ইন্ডিয়ান সোসাইটি ১৮৪৫-এ বিষয়টিতে আগ্রহ প্রকাশ করেন। ইয়ংবেঙ্গলের কাজকে পরে এগিয়ে নিয়ে যান বিদ্যাসাগর।



আসুন জেনে নিই

উনিশ শতকের কয়েকটি সমাজ সংস্কারক সভা ও তাদের মুখপত্র

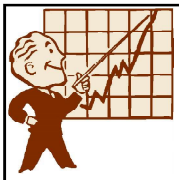
তত্ত্ববোধিনী সভা	— তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা	— ১৮৪৩
বঙভাষানুবাদক সমাজ	— বিবিধার্থ সংগ্রহ	— ১৮৫১
হিন্দুধর্মরক্ষিণী সভা	— হিন্দু হিতৈষিণী	— ১৮৬৫
শুভসাধিনী সভা	— শুভসাধিনী পত্রিকা	— ১৮৭১
বাল্যবিবাহ নিবারণী সভা	— বাল্যবিবাহ	— ১৮৭৩
টেম্পারেন্স সোসাইটি	— যুবক সুহৃদ	— ১৮৮৮
ছাত্রসভা সমিতি	— ছাত্রসখা	— ১৮৮৮

৯.৫ বঙ্গের বাবু কালচার

বঙ্গদেশে ইংরেজ শাসন চালু হবার পর সাধারণ দরিদ্র মানুষের পাশাপাশি প্রতাপশালী 'বাবু' নামে এক নতুন শ্রেণির উদ্ভব হয়। এঁরা নব্য ধনী সম্প্রদায়। এঁরা আলোচ্য বিষয় হয়ে উঠেছেন কিছু বিশেষ আচরণের জন্য। তাঁরা কুকুর-বিড়ালের বিয়েতে লাখ টাকা খরচ করতেন, ঘোড়ার গাড়ি চড়ে ভেঁপু বাজিয়ে স্নান করতে যেতেন, রাঁঢ় রাখতেন, রক্ষিতাদের দালানকোঠা তৈরি করে দিতেন, পায়রা ওড়াতেন, ভূত নামাতেন, বিদ্যাসুন্দরের আসর বসাতেন, বাইজিদের গান শুনতেন ইত্যাদি আরও হরেক রকম সৌখিনতা প্রকাশ করতেন। শিবনাথ শাস্ত্রী বাবুদের সম্বন্ধে লিখেছেন, 'বাবু মহাশয়েরা দিনে ঘুমাইয়া, ঘুড়ি উড়াইয়া, বুলবুলির লড়াই দেখিয়া, সেতার, এস্রাজ, বীণা প্রভৃতি বাজাইয়া, কবি, ফুল আখড়াই, হাফ আখড়াই, পাঁচালী প্রভৃতি শুনিয়া রাত্রিকালে বারাঙ্গনাদিগের গৃহে গৃহে গীতবাদ্য ও আমোদ-প্রমোদ করিয়া কাল কাটাইত।' কালীপ্রসন্ন সিংহের লেখা থেকে জানা যায়, এইসব বাবুরা রাতে বিবাহিত স্ত্রীর মুখ দেখতেন না। অনেক বাবু দিনে নিষ্ঠাভরে স্ত্রীর পাশে দাঁড়িয়ে বাড়িতে কালীপুজো করতেন আর রাতে মুসলমান উপপত্নীর সঙ্গে বাজি পোড়াতেন।

কলকাতায় বিখ্যাত আটজন বাবু ছিলেন বলে মনে করা হয়। এঁরা হলেন নীলমণি হালদার, রামতনু দত্ত, রাজা রাজকৃষ্ণ, দর্পনারায়ণ ঠাকুর, ছাতু (শান্তিরাম) সিংহ, রাজা সুখময় রায়, গোকুলচন্দ্র মিত্র, চোরবাগানের রামসুন্দর মিত্র। তবে আমরা বিভিন্ন লেখা থেকে জানতে পারি যে, আরও অনেকের নাম এই তালিকায় সন্নিবিষ্ট হয়নি। যেমন, দান-খয়রাতির জন্য বিখ্যাত প্রাণকৃষ্ণ হালদার, হেস্টিংসের মুন্সি রাজা নবকৃষ্ণ দেব, গোপীমোহন ঠাকুর — যিনি মাতৃশ্রাদ্ধে তিন লক্ষ টাকা খরচ করেছিলেন, হরনাথ মল্লিক আর জনহিতকর কাজের জন্য বিখ্যাত জোড়াসাঁকোর সিংহ পরিবারের কালীপ্রসন্ন সিংহ। ১৮৩৪ সালে ছাতুবাবুর মাঠে তাঁর সঙ্গে হরনাথ মল্লিকের বুলবুলির লড়াইয়ের গল্প কলকাতা শহরের লোকগাথায় জায়গা করে নিয়েছে। প্রদ্যুম্ন মল্লিক নামে এক 'বাবু' এক শনিবার গাড়ি বিক্রি করতেন আর পরের শনিবার দ্বিগুণ

দামে আরেকটি গাড়ি কিনতেন। শ্যামবাজারের দেওয়ান বাবু কৃষ্টরাম বসু ঘটা করে প্রতিমা নিরঞ্জনে যেতেন। তাঁর বাড়ি থেকে এক কিলোমিটার দূরে গঙ্গার ঘাটে যেতে কেউ যদি তাঁকে ভরা কলসি এনে দেখাত তিনি সেই লোকটিকে এক টাকা পার্বণী দিতেন, এভাবে প্রায় ছয়-সাত হাজার টাকা তিনি সেদিন খরচ করতেন। এই হুজুগগুলোই কলকাতার 'বাবু কালচার' হিসাবে পরিচিত।



অগ্রগতি নির্ধারক প্রশ্ন

৭. বাবু সমাজের হুজুগ নিয়ে যা জেনেছেন তা বর্ণনা করুন। (১৫০ শব্দের মধ্যে)

৯.৬ বঙ্গদেশে ইংরাজি শিক্ষার বিস্তার ও স্ত্রী শিক্ষা

১৮৩৫ খ্রিস্টাব্দে টমাস ব্যবিংটন মেকলের 'নোটস্' অনুসরণে লর্ড উইলিয়াম বেণ্টিঙ্ক ইংরেজি শিক্ষা আইন প্রচলন করেছিলেন, একথা আপনারা আগে জেনেছেন। এই আইন অনুযায়ী এমন কিছু প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলার কথা বলা হয়েছিল যারা ইংরেজি ভাষা সহ একটি পাশ্চাত্য দেশীয় পাঠক্রম চালু করবে। প্রশাসন এবং উচ্চতর আইন-আদালতের ভাষা হিসাবে ফারসির পরিবর্তে ইংরেজি ব্যবহার অনুমোদিত হয়েছিল। এর ফলে তখন থেকে ইংরেজি ভারতের অন্যতম সরকারি ভাষা হয়ে ওঠে। ইতিপূর্বে আপনারা 'নবজাগরণ ও শিক্ষাসংস্কার' (৯.৪.৪) অংশে এ-সম্পর্কে বিস্তারিত জেনেছেন। সেদিনকার সমাজপতি বা 'ওরিয়েন্টালিস্ট'দের মধ্যে কেউ কেউ ইংরেজিতে স্ত্রীশিক্ষা বিস্তারের সপক্ষেও মত প্রকাশ করেছিলেন এবং মেয়েদের বিদ্যালয় খুলে পাঠদান করতে শুরু করেছিলেন।

৯.৬.১ বঙ্গে স্ত্রীশিক্ষার আগের পরিবেশ

সাধারণ ভাবে স্ত্রীশিক্ষার ব্যাপারে উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধ পর্যন্ত বাঙালি সমাজ উদাসীন ছিলেন। কিছু ব্যতিক্রম ছাড়া হিন্দু বা মুসলমান মহিলারা গৃহপরিচর্যার বাইরে ধর্মগ্রন্থ বা শাস্ত্রপাঠ ইত্যাদি বিষয়ে সমাজের অনুমতি পেতেন না। অভিজাত পরিবারগুলোতে মেয়েদের পড়াশোনা ব্যাপারটা ছিল 'আদিখ্যেতা' এবং অপরাধমূলক কাজ। পুরুষ প্রাধান্য ও বাল্যবিবাহ ছিল এই মানসিকতা গড়ে ওঠার মূল কারণ। বাড়ির অন্দরমহলেই এমন কিছু অবধারণা গড়ে তোলা হয়েছিল যে, মেয়েরা লেখাপড়া শিখলে বিধবা বা অসতী হয়। এই অশিক্ষার জন্যই বিশেষত হিন্দু অভিজাত বা কুলীনসমাজে গৌরীদান, সতীদাহের মতো কুসংস্কারগুলো জায়গা করে নিয়েছিল। ফলে বঙ্গদেশে স্ত্রীশিক্ষার সদর্থক বিকাশে ইংরেজি শিক্ষা প্রচলনের পরও অনেকটা সময় পেরিয়ে যায়। মূলত মিশনারি সম্প্রদায়, ব্রাহ্মসমাজ ও ইয়ংবেঙ্গল সমাজের উদ্যোগেই বঙ্গে স্ত্রীশিক্ষা সম্ভবপর হয়ে উঠেছিল।

৯.৬.২ বঙ্গে স্ত্রীশিক্ষার সূচনা

উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে কিছু শুভবুদ্ধিসম্পন্ন মানুষ বঙ্গদেশে স্ত্রীশিক্ষার প্রয়োজনীয়তাকে উপলব্ধি করে এগিয়ে এলেন। রাজা রাধাকান্ত দেব, প্রসন্নকুমার ঠাকুর, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর প্রমুখের নাম এক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য। তবে স্ত্রীশিক্ষার ভাবনাটা প্রথম এসেছিল শতকের প্রথমার্ধে খ্রিষ্টান মিশনারিদের মধ্যে। ১৮১১ খ্রিষ্টাব্দে কেরি ও মার্শম্যানের উদ্যোগে শ্রীরামপুরে একটি বালিকা বিদ্যালয় স্থাপিত হয়েছিল। খ্রিষ্টধর্মে আকর্ষণ করাই ছিল এর মুখ্য উদ্দেশ্য। ১৮১৪ খ্রিস্টাব্দে রবার্ট মে মেয়েদের জন্য একটি স্কুল খুলেছিলেন। যদিও ছাত্রীর অভাবে তা কিছুদিনের মধ্যেই বন্ধ হয়ে যায়। ১৮১৯ খ্রিষ্টাব্দে ক্যালকাটা ব্যাপটিস্ট মিশন সোসাইটির নেতৃত্বে গড়ে ওঠে 'ক্যালকাটা ফিমেল জুভেনাইল সোসাইটি'। আনুষ্ঠানিক ভাবে এই প্রতিষ্ঠানটি বঙ্গে নারীশিক্ষার সূচনা করে। ১৮২২ খ্রিষ্টাব্দে রাধাকান্ত দেবের পরামর্শে গৌরমোহন 'স্ত্রীশিক্ষাবিধায়ক' প্রকাশ করেন। ১৮২৮ খ্রিষ্টাব্দে মিসেস মেরি অযান কুক 'ক্যালকাটা ফিমেল স্কুল' প্রতিষ্ঠা করেন। চার্চ মিশনারি সোসাইটির কাছ থেকে আর্থিক সাহায্য নিয়ে তিনি একাদিক্রমে কলকাতা ও তার পার্শ্ববর্তী অঞ্চলে মেয়েদের স্কুল স্থাপন করেন। কিছুদিনের মধ্যে এই স্কুলগুলোতে ২৭৭ জন ছাত্রী পড়া শুরু করে। লেডি আর্মহারস্টের উদ্যোগে প্রতিষ্ঠিত হয় 'লেডিজ সোসাইটি ফর নেটিভ ফিমেল এডুকেশন'। এই সোসাইটি কলকাতা ও মফস্বল অঞ্চলে ৩০টি বালিকা বিদ্যালয় পরিচালনার দায়িত্ব নিয়েছিল। ১৮৩৪ সালে আডাম সাহেব বঙ্গদেশের শিক্ষাব্যবস্থার ওপরে যে রিপোর্ট তৈরি করেন তাতে ৪৫০জন ছাত্রী শিক্ষাগ্রহণের উল্লেখ আছে। তবে এই ছাত্রীদের সিংহভাগ দরিদ্র শ্রেণির আর মিশনারি পরিচালিত বিদ্যালয়গুলোতে খ্রিষ্টধর্ম শিক্ষার ওপরই গুরুত্ব দেওয়া হত।



অগ্রগতি নির্ধারক প্রশ্ন

৫. বঙ্গে স্ত্রীশিক্ষার সূচনা সম্বন্ধে যা জানেন লিখুন। (১৫০ শব্দের মধ্যে)

৯.৬.৩ বঙ্গে স্ত্রীশিক্ষার প্রসার

মিশনারিদের একটা অংশ যখন এভাবে স্ত্রীশিক্ষার আড়ালে ধর্মপ্রচার করতে ব্যস্ত, তখন রাধাকান্ত দেবের উৎসাহে বঙ্গে স্ত্রীশিক্ষা নিয়ে সদর্থক চিন্তাভাবনা শুরু হয়। ডিরোজিওর ছাত্ররা 'পার্থেনন', 'এনকোয়েরার', 'জ্ঞানান্বেষণ' ইত্যাদি পত্রিকায় স্ত্রীশিক্ষার সমর্থনে কলম ধরেন। সফল না হলেও 'বেঙ্গল ব্রিটিশ ইন্ডিয়া সোসাইটি' ১৮৪৫-এ একটি বালিকা বিদ্যালয় করতে উদ্যোগী হয়েছিলেন। উত্তরপাড়ার জমিদার জয়কৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়ও এমন প্রচেষ্টা করেছিলেন। অবশেষে নবীনকৃষ্ণ মিত্র, প্যারীচরণ সরকারদের প্রচেষ্টায় ১৮৪৭ সালে বারাসাতে একটি বালিকা বিদ্যালয় স্থাপিত হয়। ১৮৪৯ সালে ড্রিঙ্কওয়াটার বেথুনের সহযোগিতায় এবং রামগোপাল

ঘোষ, দক্ষিণারঞ্জন মুখোপাধ্যায়, মদনমোহন তর্কালঙ্কারের মতো কয়েকজনের প্রচেষ্টায় শুরু হয় 'ক্যালকাটা ফিমেল স্কুল'। ২১ জন সম্ভ্রান্ত ঘরের মেয়েদের নিয়ে স্কুলের যাত্রা শুরু হয়। সমাজপতিদের মধ্যে রামগোপাল, দক্ষিণারঞ্জন, প্যারীচাঁদ মিত্র, দ্বারকানাথ গুপ্ত, হরিনারায়ণ দেব, হরকুমার বসু ইত্যাদি কয়েকজনের বাড়ির মেয়েরা এখানে পড়তে আসেন। রক্ষণশীল হিন্দু সমাজের মধ্যে তখন তীব্র বাদানুবাদ সৃষ্টি হয়েছিল এই স্ত্রীশিক্ষা নিয়ে। এই সময় বিদ্যাসাগরের আবির্ভাব হয়। তিনি ১৮৫৭-৫৮ সালে বর্ধমান, হুগলি, নদিয়া ও মেদিনীপুরের বিভিন্ন গ্রামে ৫০টির মতে বালিকা বিদ্যালয় স্থাপন করেন। ষাটের বছরগুলো থেকে গ্রাম-গড়ের মেয়েরাও স্ত্রীশিক্ষা বিস্তারে অংশ নিতে আরম্ভ করেন। ১৮৬৪-তে যশোরের এগারোটি গ্রামে মেয়েদের স্কুল স্থাপিত হয়। বাঁকুড়ার রাধিকাসুন্দরী ও রঙ্গদেবী, বর্ধমানের করুণাময়ী ও পাবনার বামাসুন্দরী দেবী স্ত্রীশিক্ষা প্রসারে মনপ্রাণ সমর্পণ করে দিয়েছিলেন। দ্বারকানাথ গঙ্গোপাধ্যায়, আনন্দমোহন বসু, শিবনাথ শাস্ত্রী প্রমুখের প্রচেষ্টায় ১৮৭৩-এ 'হিন্দু মহিলা বিদ্যালয়' স্থাপিত হয়। এইকালে বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষার সুযোগ পাওয়া নিয়ে সমাজপতিরা বাদানুবাদে জড়িয়ে পড়েছিলেন। বিরুদ্ধে ছিল 'তত্ত্ববোধিনী', 'পরিচারিকা', 'এডুকেশন গেজেট'-এর মতো পত্রিকার লেখকেরা আর সমর্থন জানিয়েছিলেন দ্বারকানাথ গঙ্গোপাধ্যায়ের 'অবলাবান্ধব', অক্ষয়চন্দ্র সরকারের 'সাধারণী' প্রভৃতি পত্রিকা। ১৮৭৮ সালে মেয়েরা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন পরীক্ষায় বসতে শুরু করেন।

প্রথম প্রথম স্ত্রীশিক্ষা বিস্তারের এইসব প্রচেষ্টা হিন্দু ও ব্রাহ্ম পরিবারের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল, মুসলমান সমাজের সংখ্যাগরিষ্ঠ ছিলেন এর বিরোধী। উনিশ শতকের ৬০-র দশক থেকে শিক্ষিত পরিবারের কোনো কোনো মেয়ে স্কুলে যেতে শুরু করেন। আশির দশক থেকে এই প্রবণতা বাড়ে। ১৮৯৪ সালে এস. ডব্লিউ হোসেন নামে এক উচ্চশিক্ষিত ব্যক্তি স্ত্রীশিক্ষার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করে নিজের বাড়িতে একটি মেয়েদের স্কুল খোলেন। এ-বিষয়ে তিনি 'মহামেডান অবজার্ভার' পত্রিকায় লেখালিখিও করেছিলেন।

তবে হিন্দু, ব্রাহ্ম বা মুসলমান সমাজ যা-ই হোক না কেন, উনিশ শতকে স্ত্রীশিক্ষার পক্ষে-বিপক্ষে প্রচুর বাদানুবাদ হয়েছিল। বিভিন্ন পত্রপত্রিকা সেইসমস্ত বাদানুবাদের সাক্ষী হয়ে আছে। রিফর্মার, ফ্রেন্ড অব ইন্ডিয়া, সম্বাদ প্রভাকর, সংবাদ সাধুরঞ্জন, সম্বাদ রসরাজ, সম্বাদ ভাস্কর, সংবাদ পূর্ণচন্দ্রোদয়, হিন্দু পেট্রিয়ট, বামাবোধিনী, সোমপ্রকাশ, এডুকেশন গেজেট, সুলভ সমাচার ইত্যাদি পত্রিকায় প্রকাশিত নানা নিবন্ধ ও চিঠিপত্রে এই বাদানুবাদের ইতিহাস রক্ষিত আছে।

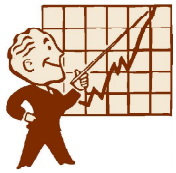
৯.৭ জাতীয় কংগ্রেস প্রতিষ্ঠা

ঔপনিবেশিক শাসন-শোষণ, রাজনৈতিক দাসত্ব, সামাজিক কুসংস্কারের বিরুদ্ধে আন্দোলন, পত্রপত্রিকায় মতামত প্রকাশ, রাজনৈতিক শিক্ষাবিস্তার ইত্যাদির মাধ্যমে বঙ্গদেশ তথা ভারতবর্ষে জাতীয়তাবোধের উন্মেষ হয়। সমাজনেতাদের মধ্যে অধিকারবোধ জেগে ওঠে। ইংরেজি ভাষায় প্রকাশিত 'অমৃতবাজার পত্রিকা', মারাঠি ভাষায় প্রকাশিত 'কেশরী', বাংলা ভাষার 'বন্দেমাতরম্', 'পার্থেনন', 'সম্বাদ প্রভাকর', 'হিন্দু পেট্রিয়ট', 'গ্রামবার্তা প্রকাশিকা' ইত্যাদি বিভিন্ন পত্রপত্রিকা

ভারতীয় জাতীয়তাবাদ গঠনের পর্যায়ে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করেছিল। জাতীয় কংগ্রেসের মতো প্রতিষ্ঠান গড়ে ওঠার আগে এইসব পত্রিকার মাধ্যমে চলছিল মানসিক প্রস্তুতি।

উনিশ শতকের মাঝামাঝি সময় থেকে ব্রিটিশ সরকারের কাছ থেকে নানা দাবিদাওয়া আদায়ের জন্য কিছু সভা সমিতি গড়ে উঠেছিল। এদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিল 'ব্রিটিশ ইন্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশন' (১৮৫১), 'বম্বে অ্যাসোসিয়েশন' (১৮৫২),'মাদ্রাজ ন্যাটিভ অ্যাসোসিয়েশন' (১৮৫২), 'ইন্ডিয়ান লিগ' (১৮৬০), 'পুনা সার্বজনিক সভা' (১৮৬৭)। এছাড়া ছিল বাংলার 'ল্যান্ডহোল্ডারস্ সোসাইটি' ও 'বেঙ্গল ব্রিটিশ অ্যাসোসিয়েশন'। এই ধরনের বিভিন্ন সভা লিটনের 'অস্ত্র আইন', সংবাদপত্রের কণ্ঠরোধ, ইংরেজের বহির্বাণিজ্যনীতি, কৃষক ও কুলি সমস্যা ইত্যাদি নানা বিষয়ে ব্রিটিশ সরকারের বিরোধিতা করে আসছিলেন। একটা সময় প্রয়োজন হয় ভূস্বামী গোষ্ঠী, ভারতীয় বণিক, শিক্ষিত মধ্যবিত্ত ইত্যাদি সবার মধ্যে সমন্বয়ের।

এই প্রেক্ষাপটে ১৮৮৫ খিষ্টাব্দের ২৮ ডিসেম্বর বোম্বাইর গোকুলদাস সংস্কৃত কলেজে উমেশচন্দ্র ব্যানার্জির সভাপতিত্বে একটি জাতীয় সভা অনুষ্ঠিত হয়। সেখানে উপস্থিত ছিলেন আলান অক্টাভিয়ান হিউম, দাদাভাই নওরোজি, সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, মনমোহন ঘোষ, মহাদেব গোবিন্দ রানাডে, রমেশচন্দ্র দত্ত, সুব্রামানিয়া আইয়ার প্রমুখ ৭২ জন সচেতন ব্যক্তিত্ব। ১৮৮৫ সালের মে মাসে হিউম ভাইসরয়ের কাছ থেকে একটি 'ভারতীয় জাতীয় ইউনিয়ন' তৈরির অনুমোদন পান, যা সরকারের সঙ্গে যুক্ত থাকবে এবং ভারতীয় জনমত প্রকাশের বাহক হিসাবে কাজ করবে। সেই হিসাবে হিউমের ব্যবস্থাপনায় ওই সভার আয়োজন করা হয়। সেদিনই ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস প্রতিষ্ঠা লাভ করে। হিউম এর সম্পাদক পদে আসীন হন। ১৮৮৫ থেকে ১৯০৫ সালের মধ্যে ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস বেশ কিছু দাবি উপস্থাপন করেছিল। এগুলোর মধ্যে আছে ভারতীয় জনগণের নাগরিক, প্রশাসনিক, সাংবিধানিক ও অর্থনৈতিক অধিকার। বাক্ ও সংবাদপত্রের স্বাধীনতা, সভা আয়োজনের অধিকার, সরকারে ভারতীয় প্রতিনিধিত্ব, আইন পরিষদের ক্ষমতা বৃদ্ধি ও নির্বাচিত ভারতীয় প্রতিনিধিদের অন্তর্ভুক্তি, অর্থনৈতিক বৈষম্য হ্রাস ইত্যাদি। ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনে এই জাতীয় কংগ্রেস গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করেছিল।



অগ্রগতি নির্ধারক প্রশ্ন

৮। জাতীয় কংগ্রেসের প্রতিষ্ঠা সম্বন্ধে একটি টীকা লিখুন (১৫০ শব্দের মধ্যে)



৯.৮ অধ্যায়টি পাঠ করে আমরা কি শিখলাম

এই অধ্যায়টি পড়ে আপনারা জানলেন—

- পলাশির যুদ্ধের পর নবাবি আমল শেষ হয়, শুরু হয় কোম্পানি আমল।

- প্রথম অবস্থায় দ্বৈত শাসন ব্যবস্থা চালু ছিল, ১৭৭২ সালে কোম্পানি শাসনভার নিজের হাতে নিয়ে নেন।
- কোম্পানি আমলে ফারসির বদলে ইংরেজি হয়ে ওঠে আইন-আদালত-শিক্ষার মূল বাহক।
- বঙ্গের নবজাগরণ বা রেনেসাঁস পাশ্চাত্য শিক্ষার সঙ্গে প্রত্যক্ষ যোগাযোগের ফল।
- বঙ্গীয় নবজাগরণের পীঠস্থান ছিল কলকাতা শহর।
- এশিয়াটিক সোসাইটির প্রতিষ্ঠা বা কলকাতায় রামমোহনের অবস্থান নবজাগরণের সূচনাকাল।
- উনিশ শতকে মিশনারি, ব্রাহ্মসমাজী, ইয়ংবেঙ্গলি এবং উচ্চশিক্ষিত হিন্দুরা সংস্কারধর্মী কাজ করেছেন।
- রক্ষণশীলতা, কুসংস্কারের হাত থেকে হিন্দুসমাজকে বাঁচাতে রামমোহন কলম ধরেছিলেন।
- মিশনারিরা বঙ্গদেশে ইংরেজি শিক্ষা তথা স্ত্রীশিক্ষা প্রসারে অগ্রণী ভূমিকা গ্রহণ করেছিলেন।
- রাধাকান্ত দেব, বিদ্যাসাগর, শিবনাথ শাস্ত্রী প্রমুখের প্রচেষ্টায় বঙ্গে স্ত্রীশিক্ষার প্রসার ঘটে।
- নব্য ধনীদের মধ্যে বাবু হবার প্রবণতা বাড়ে এবং নানারকম হুজুগে তাঁরা মেতে উঠেছিলেন।
- জাতীয়তাবাদের উন্মেষ পর্বে বঙ্গ তথা ভারতে বিভিন্ন সভাসমিতি ও জাতীয় কংগ্রেসের প্রতিষ্ঠা হয়।
- উনিশ শতকে বিভিন্ন পত্রপত্রিকা নানা সামাজিক আন্দোলনে সহায়কের ভূমিকা পালন করেছিল।



৯.৯ অতিরিক্ত পঠন

ঘোষ, বারিদবরণ (২০০৯); ব্রাহ্মসমাজের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস, কলকাতা :নিউ এজ পাবলিশার্স।

ঘোষ, বিনয় (২০১৭); বাংলার নবজাগৃতি, কলকাতা : প্রকাশ ভবন

ত্রিপাঠি, অমলেশ (১৯৯৬); ইতালীয় রেনেসাঁস বাঙালির সংস্কৃতি, কলকাতা: আনন্দ পাবলিশার্স।

বন্দোপাধ্যায়, অসিতকুমার (১৯৮৯); বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত, ষষ্ঠ খণ্ড: প্রথম পর্ব, কলকাতা : মডার্ন বুক এজেন্সী

বন্দোপাধ্যায়, শেখর (২০ ১০); পলাশি থেকে পার্টিশান, কলকাতা : ওরিয়েন্ট ব্লাকসোয়ান

বসু, স্বপন (২০১৪); উনিশ শতকে স্ত্রীশিক্ষা, কলকাতা : বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ

বসু, স্বপন (২০১৪); বাংলায় নবচেতনার ইতিহাস, কলকাতা : পুস্তক বিপণি

বসু, স্বপন (২০০৩); সংবাদ সাময়িকপত্রে উনিশ শতকের বাঙালি সমাজ, ২য় খণ্ড, প.ব.কলকাতা : বাংলা আকাদেমি

বসু. স্বপন ও অন্যান্য (সম্পা.) (২০০৩); উনিশ শতকের বাঙালি জীবন ও সংস্কৃতি, কলকাতা :পুস্তক বিপণি

ভট্টাচার্য, পিনাকী (২০০৩); গতকালের কলকাতা (পর্ব ১১) : কলকাতার বাবুবৃত্তান্ত, কলকাতা :সাম্প্রতিক

মুখোপাধ্যায়, শক্তিসাধন (২০০৫); ইতালীয় রেনেসাঁসের আলোকে বাংলার রেনেসাঁস, কলকাতা : প্রগ্রেসিভ পাবলিশার্স

রায়, অন্নদাশঙ্কর (২০০৪); বাংলার রেনেসাঁস, কলকাতা :বাণীশিল্প

সমাদ্দার, রণজিৎকুমার (২০০৯); ভারতের সশস্ত্র বিদ্রোহ :সমকালীন সমাজ ও বাংলা সাহিত্য, কলকাতা : জিজ্ঞাসা পাবলিশিং

সরকার, সুশোভন (১৯৯৭); বাংলার রেনেসাঁস, কলকাতা :দীপায়ন

শাস্ত্রী, শিবনাথ (১৯৮৩); রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ, কলকাতা :বিশ্ববাণী প্রকাশনী

৯.১০ অগ্রগতি নির্ধারক উত্তর-সংকেত

উত্তর লেখার জন্য

১। ৯.৩ পরিচ্ছেদের প্রথম অনুচ্ছেদটি দেখুন।

২। ৯.৩.১ অংশ অবলম্বনে উত্তর তৈরি করুন।

৩। ৯.৪.১ পরিচ্ছেদ অবলম্বনে উত্তর লিখুন।

৪। ৯.৪.২ পরিচ্ছেদ অবলম্বনে উত্তর লিখুন।

৫। ৯.৬.২ পরিচ্ছেদ অবলম্বনে উত্তর লিখুন।

৬। ৯.৬.৩ পরিচ্ছেদ অবলম্বনে উত্তর লিখুন।

৭। ৯.৫ পরিচ্ছেদ অবলম্বনে উত্তর লিখুন।

৮। ৯.৭ পরিচ্ছেদ অবলম্বনে উত্তর লিখুন।

৯. ১১ আদর্শ প্রশ্নাবলি

১. কোম্পানি আমলের ব্যাপ্তি সম্পর্কে একটি প্রতিবেদন প্রস্তুত করুন।

২. বঙ্গীয় নবজাগরণের সময়কাল পর্যালোচনা করুন।

৩. নবজাগরণের বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে যা জানেন, লিখুন।

৪. বঙ্গে স্ত্রীশিক্ষার বিভিন্ন পর্যায় বিশ্লেষণ করুন।

৫. কলকাতার বাবু কালচারের একটি রূপরেখা তৈরি করুন।

অধ্যায় ১০ : মধ্যবিত্ত সমাজের উদ্ভব ও বিকাশ : ব্রিটিশ পর্ব-২

বিন্যাস ক্রম

১০.১ জ্ঞাতব্য বিষয়
১০.২ পরিচিতি
১০.৩ মধ্যবিত্তের সংজ্ঞা ও ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট
১০.৪ বঙ্গীয় মধ্যবিত্ত সমাজের আবির্ভাব ও ক্রমবিকাশ
১০.৪.১ মধ্যবিত্ত সমাজ উত্থানের ক্ষেত্রে ইংরেজের ভূমিকা : চিরস্থায়ী বন্দোবস্তসহ বিভিন্ন ব্যবস্থার প্রভাব
১০.৪.২ মধ্যবিত্ত সমাজ উত্থানের ক্ষেত্রে ইংরেজের ভূমিকা : মধ্যবিত্ত বুদ্ধিজীবী সম্প্রদায়ের উন্মেষ
১০.৪.৩ স্বাধীন ভারতে বাঙালি মধ্যবিত্ত
১০.৫ বঙ্গীয় মধ্যবিত্ত সমাজের লক্ষণসমূহ
১০.৬ মেট্রোপলিটন সংস্কৃতি ও মধ্যবিত্তের সংকট
১০.৭ অধ্যায় সংক্ষেপ
১০.৮ অধ্যায়টি পাঠ করে আমরা কী শিখলাম
১০.৯ অতিরিক্ত পঠন
১০.১০ অগ্রগতি নির্ধারক উত্তর-সংকেত
১০.১১ আদর্শ প্রশ্নাবলি

১০.১ জ্ঞাতব্যবিষয়

এই অধ্যায় পাঠ করে শিক্ষার্থী—

- বঙ্গীয় মধ্যবিত্ত সমাজের সঙ্গে পরিচিত হবেন।
- মধ্যবিত্ত সমাজের বিশেষ উদ্ভবের ইতিহাস জানতে পারবেন।
- মধ্যবিত্ত সমাজের বিশেষ কিছু বৈশিষ্ট্য ও সংকট প্রসঙ্গে ধারণা গ্রহণ করতে পারবেন।

১০.২ পরিচিতি

বিশ্ব সংসারের শ্রেষ্ঠতম নির্মাণ যে মানুষ এই বিষয়ে কারও দ্বিমত থাকার কারণ নেই। আর এই মানব সমাজের সব থেকে বিস্ময়কর ঘটনা হল মধ্যবিত্ত সমাজের আবির্ভাব। তাই বাংলা তথা ভারতবর্ষত বটেই, সম্ভবত বর্তমান সমাজেরই এক অদ্ভুত সৃষ্টি এই মধ্যবিত্ত জনসমাজ। 'মধ্যবিত্ত' শব্দ বন্ধটির মধ্যে বিত্ত বা পুঁজির সম্পর্ক অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ হলেও এখানে 'বিত্ত' বহু-অর্থব্যঞ্জক। তাই, কোনো কোনো সমাজবিজ্ঞানী মধ্যবিত্তের পরিচয় দিতে গিয়ে

বলে থাকেন বিত্ত ও বিদ্যার মধ্যে যে মধ্য, সেই মূলত মধ্যবিত্ত। এই চিন্তন যে সর্বৈব ঠিক তা কিন্তু নয় কারণ বিদ্যা শব্দটি এখানে আক্ষরিক অর্থে হয়তো প্রযুক্ত নয়। আসলে মধ্য বিদ্যার নয়, এর ব্যাখ্যা এমন হওয়া উচিত মধ্যবিত্ত মানুষ যেমন মধ্য পুঁজির হবেন তেমনি বিদ্বানও হবেন। বিদ্বান বলতে এখানে অবশ্য শিক্ষাগত যোগ্যতার দিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে। 'বিদ্বান' আবার বিশেষ সংস্কৃতি চেতনা ও মানসিকতাকেই ব্যঞ্জিত করে।

আবার অন্য দিকে বাঙালি মধ্যবিত্তের কথা বলতে গেলে বলতে হবে যে মধ্যবিত্ত সমাজ উত্থান যদি হয় পৃথিবীর অদ্ভুত সৃষ্টি, তবে বাঙালি মধ্যবিত্ত সমাজ উত্থান হবে তারই অদ্ভুততর সংযোজন। কারণ সমগ্র বিশ্বে এর জুড়ি মেলা অসম্ভব। কিছু ঐতিহ্যগত বা কিছু ভৌগলিক-ঐতিহাসিক-সাংস্কৃতিক-অর্থনৈতিক-সামাজিক কারণ খুব স্পষ্টভাবেই এর পেছনে কাজ করেছে— যা বাঙালি মধ্যবিত্ত জনমানসকে অন্যান্য মধ্যবিত্ত জনমানসের শ্রেণিতে সারিবদ্ধ হতে দেয়নি। সে স্বমহিমায় 'একেমেব অদ্বিতীয়ম'। আসলে বাঙালি মধ্যবিত্তের পরিধি অনেক বৃহৎ এবং তার বৈচিত্র্যময় চরিত্রায়ন তাকে পৃথক দৃষ্টিতে দেখার ও বোঝার দাবি রাখে। সেই দাবি মেনেই আলোচ্য অধ্যায়ে উপস্থাপনা।

১০.৩ মধ্যবিত্তের সংজ্ঞা ও ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট

'মধ্যবিত্ত' শব্দটির সংসদ বাংলা অভিধান মতে যদি অর্থ দেখি তবে দেখব এর অর্থ হল 'আর্থিক দিক দিয়া মাঝামাঝি অবস্থা বিশিষ্ট অথচ শিক্ষিত'। এহেন এক সমাজ ব্যবস্থাকে নিয়ে প্রাথমিক চিন্তা চর্চা অবশ্যই ইউরোপে শুরু হয়। এর কারণ মধ্যবিত্ত শ্রেণির প্রাথমিক উৎপত্তি ইউরোপেই।

১০.৩.১ সংজ্ঞা ও পরিচয়

শিল্প বিপ্লবের ফলে পুরনো শাসনতন্ত্রের অবসান হয়। ১৯৭৮ খ্রিস্টাব্দের ফরাসি বিপ্লব ও ১৮৪৮ খ্রিস্টাব্দে গোটা ইউরোপে যে বিপ্লবের পরিস্থিতি তৈরি হয় তাতে জোর ধাক্কা খায় সামন্ততন্ত্র। যারা সামন্ততন্ত্রে একটি মধ্যম পর্যায়ে ক্ষমতা ভোগ করছিলেন তারাই এই সামাজিক বিপ্লবগুলোব নেতৃত্ব দেন। এ প্রসঙ্গে সর্বাগ্রে তাত্ত্বিক ব্যাখ্যা তুলে ধরেন মার্কস ও এঙ্গেলস। তাঁরা তাঁদের 'Adress of the Central Committee of the Communist League' — এ বৃহৎ বুর্জোয়া ও পেটিবুর্জোয়া শ্রেণির মধ্যে তফাত করেন। বুর্জোয়াদের লক্ষ্য ছিল সামন্ততন্ত্রকে সামগ্রিকভাবে উচ্ছেদ করা। কিন্তু পেটিবুর্জোয়া শ্রেণির লক্ষ্য ছিল শুধুমাত্র গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র স্থাপন করা। তাঁরা বিপ্লব চান না, তাঁরা কেবল পরিবর্তন চান যে পরিবর্তন এমন এক সমাজ তৈরি করবে যেখানে তারা সুখে-শান্তিতে থাকবেন। এঙ্গেলস তাঁর একটি গ্রন্থে এমন এক শ্রেণির কথা জানান যারা অভিজাততন্ত্র ও বুর্জোয়াদের মাঝামাঝি যেমন ক্ষুদ্র দোকানদার, শ্রমজীবী মানুষ, গ্রামাঞ্চলের চাষি। এদের সম্পর্কে বলতে গিয়ে এঙ্গেলস মধ্যবিত্ত শ্রেণির সংজ্ঞার কাছাকাছি পৌঁছান—

"The great mass of the nation, which neither belonged to the nobility nor to the bourgeoisie, consisted, in the towns, of the small trading or shopkeeping class and the working people, and in the country, of the peasantry. .....

Its intermediate position between the class of larger capitalists, traders and manufacturers, the bourgeoisie, properly so called, and the proletarian or industrial class, determins its character."

-যদিও পরবর্তীতে মধ্যবিত্ত শ্রেণি সম্পর্কেই পাশ্চাত্যেই ভিন্ন ভিন্ন মতের আত্মপ্রকাশ বিশেষ লক্ষণীয়। যেমন গোল্ড থরপ 'middle class'-কে 'service class' হিসাবে দেখেছেন, পরবর্তী মার্কসবাদীরা বাবু শ্রমিকদের "New working class" হিসাবে দেখেছেন। আবার অন্য এক ইউরোপীয় ধারণা অনুযায়ী মধ্যবিত্ত শ্রেণি হল—

"The category as an intermediate social class between the nobility and the peasantry of Europe."

ফলত এই সূত্র অনুযায়ী বলা যেতেই পারে ইউরোপীয় চিন্তানুযায়ী মধ্যবিত্ত সমাজ হল অভিজাত ও কৃষক শ্রেণির অর্ন্তবর্তী অংশ। আবার আমেরিকার মার্কসবাদী চিন্তাবিদ Louis C. Fraina একেবারে আধুনিক দৃষ্টিকোণ থেকে মধ্যবিত্তের সুন্দর একটি ব্যাখ্যা তুলে ধরেছেন, সেটি হল-

"The class of independent small interpreters, owners of productive proparty from which a livelihood is derived."

Fraina সম্পত্তিশালী কৃষককেও মধ্যবিত্তের শ্রেণিভুক্ত করেছেন, যদিও তিনি তাদের 'New middle class' বলতে চেয়েছেন। এই কারণে গর্ডন মার্শাল 'middle class' পরিভাষাকে 'the least satisfactory term' বলে আখ্যা দিয়েছেন।

এবার আমরা ভারতীয় দৃষ্টিকোণ থেকে মধ্যবিত্ত শ্রেণিকে সংজ্ঞায়িত করার চেষ্টা করবো। এটা মনে রাখতে হবে ভারতে মধ্যবিত্ত শ্রেণি আবির্ভাব ইংরেজ রাজতন্ত্রের প্রত্যক্ষ প্রভাবের ফলে। যদিও তাদের চরিত্র সম্পূর্ণ ভিন্ন, সমাজতাত্ত্বিক মিশ্রের কথায়-

"The Indian middle class which the British aimed at creating was to be a class of imitators, not the originators of new values and methods."

মিশ্রের মতে এই শিক্ষিত শ্রেণি নিজেদের ক্ষমতা ও প্রতিপত্তি সম্পর্কে বেশি সজাগ ছিল। অন্য দিকে চিব্বারের মতে মধ্যবিত্তকে সংজ্ঞায়িত করতে হলে তিনটি বিশেষ মাপকাঠিকে মাথায় রেখে আলোচনায় এগোতে হবে, সেগুলি হল আয়, বৃত্তি ও শিক্ষা। তাঁর কথায়-

"His position is explained in terms of the prestige ascribed to him by lower groups but denied by the upper."

এই মধ্যবিত্তের সংজ্ঞা থেকে তিনি নিম্নস্তরের কিছু শ্রেণি ও উচ্চস্তরের কিছু শ্রেণিকে বাদ দিয়েছেন। আবার অপরদিকে সমাজতাত্ত্বিক যোশীর চিন্তানুসরণে মধ্যবিত্ত সংজ্ঞার মূল হল আধুনিকতাকে গ্রহণ করে তা জনগণের মাধ্যে বিস্তৃতি ঘটানো, তাঁর কথায়—

"Modernity in India, as elsewhere, was built on existing foundations. The middle classes everywhere used older resources of power and privilege as well as new ideas about the organization of social and political relation as they constructed the modern."

আসলে যোশী মধ্যবিত্ত সমাজের মধ্যে গভীর বৈপরীত্য লক্ষ করেছেন। অন্যদিকে সমাজতাত্ত্বিক নরহরি কবিরাজ মনে করেন—

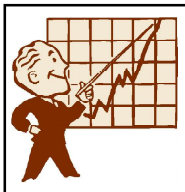
"ভারতের মধ্যবিত্ত শ্রেণি বলতে আজ যাদের বোঝায় তাদের জীবিকা সংযুক্ত রয়েছে শহরের শিল্প-জীবনের সঙ্গে, গ্রামের চাষি জীবনের সঙ্গে নয়। ইংরেজ আমলের যন্ত্র-সভ্যতার আওতায় বর্ধিত এই নতুন মধ্যবিত্ত শ্রেণির মধ্যে পড়ে ব্যাঙ্ক, ইনসিওরেন্স, সুদাগরী ও সরকারি অফিসের কেরানী, কলকারখানার দক্ষ মজুর (skilled workers), মোটর ও ইলেকট্রিক চালিত যানবাহনের চালক, স্কুল-কলেজের মাস্টার, অধিকাংশ ডাক্তার ও উকিল।"

আবার সমাজচিন্তক গোপাল হালদার জানান—

"ভূমি স্বত্বের উপর উপস্বত্ব আশ্রয় করে বাঙলাদেশের মধ্যবিত্ত শ্রেণি প্রথম দাঁড়িয়ে ওঠে। পরে সরকারি চাকুরিও হয় তার দ্বিতীয় আশ্রয়।" আসলে ইংরেজ তাদের শাসন গড়ে তুলতে বেশ কিছু অল্প শিক্ষিত, অর্ধ শিক্ষিত তথা শিক্ষিত ভারতীয়দের কেরানি বা কর্মী পদে যোগ করে যারাই পরবর্তীতে মধ্যবিত্ত শ্রেণি হিসাবে আত্মপ্রকাশ করে। এ প্রসঙ্গে নরহরি কবিরাজ জানান-

"অফিস ও কারখানাকে কেন্দ্র করে এই যে ইংরাজি ভাষায় অ, আ, ক, খ জানা এক অর্ধশিক্ষতের দল গড়ে উঠল এরাই হল নতুন মধ্যবিত্ত শ্রেণি।"

এইসকল সংজ্ঞা থেকে একটি দিক স্পষ্ট যে এই নব উদ্ভুত সমাজটি যেকোনো সমাজ ব্যবস্থার একটি ব্যতিক্রমী পরিচিতি রূপে ক্রমান্বয়ে উঠে এসে সমাজের অন্যতম পরিচায়ক হয়ে উঠেছে।



অগ্রগতি নির্ধারক প্রশ্ন

১. মধ্যবিত্ত সমাজের সংজ্ঞা ও পরিচিতি তুলে ধরুন। (১০০ শব্দের মধ্যে)

১০.৪ বঙ্গীয় মধ্যবিত্ত সমাজের আবির্ভাব ও ক্রমবিকাশ

উপর্যুক্ত সংজ্ঞাগুলো থেকে এই কথাটি স্পষ্ট যে বাঙালি মধ্যবিত্ত বিশ্ব মধ্যবিত্ত সমাজ চরিত্র থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন; এমন কি ভারতীয় মধ্যবিত্তের শিকড় থেকে জন্ম লাভ করেও এই মধ্যবিত্ত শ্রেণি আপন চারিত্রিক স্বাতন্ত্রতায় নিজেকে ব্যতিক্রমী বলে চিহ্নিত করতে সক্ষম। অনেক সমাজতাত্ত্বিকের মতে মোগল সাম্রাজ্যের শেষের দিকে অর্থাৎ অষ্টাদশ শতকের প্রথম দিকে একটি মধ্যবিত্ত শ্রেণির আবির্ভাব হয়।১৭৫৭ সালে ইংরেজ রাজশক্তির প্রতিষ্ঠা ভারতের আধুনিক সমাজ প্রতিষ্ঠার প্রথম পদক্ষেপ বলা যায়। এর পর ১৭৬৫ সালে বাংলা-বিহারে 'দেওয়ানী প্রথা' বলবৎ হবার পর কার্যত ইংরেজ এই প্রদেশের 'ডিক্টেটর' হিসাবে আত্মপ্রকাশ করে। ১৭৯৩ সালে বলবৎ হয় ভূমি রাজস্ব আদায়ের 'চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত'। এই ভূমি বন্দোবস্তই আধুনিক বাংলার সমাজের মূল ভিত্তি হয়ে ওঠে। এর সঙ্গেই সূচনা ঘটে মধ্যবিত্তের উত্থানের যুগ।

১০.৪.১ মধ্যবিত্ত সমাজ উত্থানের ক্ষেত্রে ইংরেজের ভূমিকা :

চিরস্থায়ী বন্দোবস্তসহ বিভিন্ন ব্যবস্থার প্রভাব : চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত হল একটি ভূমি-রাজস্ব ব্যবস্থা যা ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি ও জমিদারদের মধ্যে সম্পাদিত হয়েছিল। এই চুক্তির মাধ্যমে ভূমিকে আশ্রয় করে সংগৃহীত রাজস্ব বিশেষ পরিমাপে নির্ধারণ করা হয়েছিল। চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের লক্ষ্য ছিল ব্রিটিশ সরকারকে নির্দিষ্ট কর প্রদানের বিনিময়ে জমিদারদের বংশগত ভূমির অধিকার প্রদান করে রাজস্ব ব্যবস্থা স্থিতিশীল করা। এই চিরস্থায়ী ব্যবস্থা ঔপনিবেশিক ভারতের আর্থ-সামাজিক দৃশ্যপটে গভীর প্রভাব ফেলেছিল, যা বঙ্গীয় কৃষিজীবী সমাজের উপর সমূহ বিপদের ঘনঘটা নামিয়ে এনে ছিল। মনে রাখতে হবে বঙ্গ প্রদেশ ইংরেজের দখলে যাবার পর সমাজের সব কিছুই ভাঙনের মুখে পড়ে। পুর্নগঠন যা কিছু হয়, তা ইংরেজের আপন স্বার্থসিদ্ধির কারণে। চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত বলবৎ হবার পর জমির মালিকানা স্বত্বই হয়ে ওঠে ধন ঐশ্বর্যের পরিচায়ক। এ বিষয়ে অমলেশ ত্রিপাঠী জানিয়েছেন—

"Land became hence forth a safe and sacred form of investment, which invited capital from all classes."

পলাশীর যুদ্ধের পর মাৎস্যন্যায়ের কারণে সমাজে ভাসমান নগদ অর্থ—ধূর্ত, ক্রুঢ়, নিষ্ঠুর ব্যক্তিদের হাতে সঞ্চিত হতে শুরু করে। চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত এই প্রক্রিয়াকে যেন আরও ত্বরান্বিত করে তোলে। বিনিয়গের অন্য কোনো পথ খোলা না থাকায় এই শ্রেণির ব্যক্তিরা দ্রুত সঞ্চিত অর্থের বিনিময়ে জমির মালিক হয়ে ওঠে। জমিদারির প্রতি আকর্ষণহেতু উদ্ভূত নব্য জমিদার শ্রেণি তার শতেক অঙ্গ প্রত্যঙ্গ নিয়ে ইংরেজের সহকারী রূপে আবির্ভূত হয়। এক্ষেত্রে ইংরেজের উদ্দেশ্য ছিল বিপুল পরিমাণে খাজনা আদায় করা। এর ফলে একদা সম্পদশালী বঙ্গদেশ স্থায়ী দুর্ভিক্ষের দেশে পরিণত হয়। বর্বর লোলুপ ইংরেজ—বঙ্গ প্রদেশের

বাৎসরিক খাজনা স্থির করে ৩৪,০০,০০০ পাউণ্ড। এই বিপুল অর্থ আদায়ের জন্য যে কার্যকলাপের প্রয়োজন, তার জন্যই মধ্যবর্তী এক শ্রেণির কর্মচারী অপরিহার্য হয়ে পড়ে। সামাজিক মাৎস্যন্যায়ের সুযোগে বেশ কিছু সম্পদশালী চতুর ব্যক্তি জমিদারি ক্রয় করে ভুঁইফোঁর জমিদার হয়ে বসে। নতুন জমিদারদের এই সম্পদশালী হবার কারণ হিসাবে সমাজতাত্ত্বিকেরা জানান, এই নতুন জমিদার শ্রেণির "ধন সম্পদ সঞ্চিত হইয়াছিল উচ্চ চাকরি অথবা ব্যবসা কিংবা মহাজনী দ্বারা। ...তাহার লগ্নী করিবার মতো কিছু অর্থ সঞ্চয় করিয়াছিল এবং লগ্নীর জন্য ভূ-সম্পত্তির দিকেই তাহাদের দৃষ্টি নিবদ্ধ হইয়াছিল।" শহুরে দৃষ্টিভঙ্গীজাত এই শ্রেণির নব্য জমিদার কৃষির উন্নতির চেয়ে জমিকেন্দ্রিক নগদ অর্থ লুণ্ঠনের প্রতি কার্যকর হয়ে ওঠে। মূলত এই শ্রেণি এবং এদের অধস্তন খুদে জমিদার রাজস্ব আদায়কারী ব্যক্তিবর্গই বাংলার মধ্য শ্রেণির পূর্বপুরুষ।

চরস্থায়ী বন্দোবস্তের ভয়ঙ্কর কঠিন শর্ত পালন করতে সক্ষম না হওয়ায় অনেক পুরনো জমিদারি চিরস্থায়ী ব্যবস্থা প্রবর্তনের প্রথম দিকেই নিলামে উঠে যায়। এই সব জমিদারি হস্তান্তরিত হয় মূলত বেণিয়া, মুৎসুদ্দি, মহাজন ও ব্যবসায়ী শ্রণির কাছে। এই নতুন জমির মালিকানা পাওয়া এই দল ছিল মূলত নগরবাসী তাই তারা জমির খাজনা আদায় করার জন্য এক বিশেষ মধ্যস্বত্বভোগী দল প্রতিনিধিকে নিযুক্তি দেয়। ফলত চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের পর প্রায় আশি বছরের মধ্যে বাংলার প্রত্যেক জমিদারিতে মধ্যস্বত্ব ভোগীর সংখ্যা এত বৃদ্ধি পেয়েছিল যে, ১৮৭২-৭৩ সালের মধ্যে জমিদারের সংখ্যা দাঁড়িয়েছিল প্রায় দেড় লক্ষেরও বেশি। এই চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের ফলে উদ্ভূত মধ্যস্বত্বভোগীরাই ক্রমে মধ্যবিত্ত সমাজে বিকাশ লাভ করে।

১০.৪.২ মধ্যবিত্ত সমাজ উত্থানের ক্ষেত্রে ইংরেজের ভূমিকা : মধ্যবিত্ত বুদ্ধিজীবী সম্প্রদায়ের উন্মেষ

চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের অব্যবহিত কাল পরে বাংলায় এক নতুন বুদ্ধিজীবী সম্প্রদায়ের উন্মেষ ঘটে। চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের মতো এটাও ইংরেজের প্রয়োজনে সংঘটিত। এ প্রসঙ্গে নরহরি কবিরাজ জানান—

"ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর কর্মকর্তারা দেখল, সুষ্ঠুভাবে ব্যবসা চালাতে হলে ব্যবসার খাতিরে যে ভারতীয় সাম্রাজ্য গড়ে তুলেছে-তা রক্ষা করতে হলে তাদের প্রয়োজন, অগণিত কেরাণী ও নিপুণ কর্মী। অফিস ও কারখানাকে কেন্দ্র করে এই যে ইংরাজি ভাষায় অ,আ,ক,খ জানা এক অর্ধ শিক্ষতের দল গড়ে উঠল এরাই হল নতুন মধ্যবিত্ত শ্রেণি।"

তাই ইংরেজ প্রভুর প্রয়োজনের তাগিদে সুবিধালোভী মানুষেরা ধীরে ধীরে ব্রিটিশের প্রয়োজনীয় কেরানিতে পরিণত হতে শুরু করে। তবে এখানে একটি কথা বলা প্রয়োজন ইংরেজের আত্ম মুনাফার লোভই হোক তাতে যেমন বাংলা সেদিন এক দল কুর্ম অবতার বুদ্ধিজীবী পায়, ঠিক তেমনি রাজা রামমোহন রায়ের মতো স্বল্প সংখ্যক প্রকৃত বুদ্ধিজীবীকে লাভ করে। সে যা হোক এইভাবে চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের ফলে যে মধ্যস্বত্বভোগীদের উন্মেষ

তারাই ক্রমান্বয়ে ইংরেজের লেজুড় বৃত্তি করে একটি পূর্ণায়ত সমাজ ব্যবস্থাকে রূপায়িত করে যা আজ মধ্যবিত্ত সমাজ রূপে পরিচিত। যদিও পরবর্তীতে এই ইংরাজি শিক্ষিত মধ্যবিত্তই কিন্তু ইংরেজের অপশাসনের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ সংগঠিত করে।

১০.৪.৩ স্বাধীন ভারতে বাঙালি মধ্যবিত্ত

ইংরেজ আমলের শেষ দিকে বাঙালি মধ্যবিত্ত সরাসরি দুই ভাগে বিভক্ত হয়ে যায়, এক গ্রামীণ মধ্যবিত্ত দুই শহুরে মধ্যবিত্ত। তার পর সময়টা ১৯৪৭ সনের ১৫ আগস্ট। ভারতের হাতে অর্পিত স্বাধীনতার অধরা স্বপ্ন পুরণের চাবিকাঠি। কিন্তু ঠিক বিপরীতে এসময় পাঞ্জাব ও বাংলা সেদিন ভাতৃঘাতী দাঙ্গা রোগে ভুগছিল। আমরা জানি স্বাধীনতা দ্বি-খণ্ডিত বাংলা উপহার দিয়েছিল। আর সেই সূত্রে পশ্চিমবঙ্গ সেদিন প্রাপ্য হিসাবে পায় শরণার্থী সমস্যা। ফলত বাইরের এই প্রবল আঘাতে স্বাধীন ভারতবর্ষে বাংলার মধ্যবিত্তের অবস্থা আরো অবনতির পথে এগিয়ে যায়। পঞ্চাশ ও ষাটের দশকে বাংলার তিন মুখ্য সমস্যা খাদ্যভাব, বেকারত্ব ও মূল্যবৃদ্ধির বিরুদ্ধে সেদিনের বাঙালি মধ্যবিত্ত গর্জে ওঠে। এর প্রথম সারিতে এগিয়ে আসে মধ্যবিত্ত বাঙালি ঘরের ছাত্র-যুবারা। ঐতিহাসিক খাদ্য আন্দোলন নেতারা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করে। ষাটের দশকে খাদ্যসংকট, শিল্পসংকট, বেকারত্ব, মূল্যবৃদ্ধি প্রভৃতি কারণে মধ্যবিত্ত বাঙালি শোচনীয় অবনতির সম্মুখীন হয়। এই সময়ের মধ্যবিত্তের এই পরিস্থিতি বর্ণনা করতে গিয়ে সমাজতাত্ত্বিক বিনয় ঘোষ তাঁর 'কলকাতার সমাজ' শীর্ষক প্রবন্ধে লেখেন-

"যাঁরা ভদ্রলোক-শ্রেণীবাচ্য, তাঁরা ক্রমে নিম্নগামী হবার ফলে কিছুতেই তাঁদের ভদ্রলোকত্ব বজায় রাখতে পারছেন না।"

-যদিও এটাই ষাটের দশকে মধ্যবিত্তের শেষ কথা নয়; কারণ এসময় এই সমাজ ব্যবস্থায় বেশ কিছু বৈপরীত্ব দেখা যায়। কারণ এসময় থেকে মধ্যবিত্ত সমাজে ব্যক্তিকেন্দ্রিক, পণ্যভোগীদের সমাজ তৈরি হতে শুরু করে, বিনয় ঘোষ যাকে 'সুপার মার্কেটে'র সঙ্গে তুলনা করেছেন।

সত্তরের দশকের সব থেকে বড় ঘটনা নকশাল আন্দোলন। কিন্তু এতো বড় গণবিপ্লবে মধ্যবিত্তের ভূমিকা নিয়ে এই আন্দোলনের সুপ্রিমো চারু মজুমদার সন্দিহান ছিলেন। অর্থাৎ এসময় থেকে মধ্যবিত্ত নেতিবাচক অদর্শহীনতার পথে ধাবিত হতে শুরু করে। সমালোচকের কথায়-

"এ সময়ের যে নীতি ভ্রষ্টতা, আদর্শচ্যুতি, মূল্যবোধহীনতা আধ্যাত্মিক ও আত্মিক সততা থেকে স্খলন, সংশয়, হতাশা সামগ্রিক প্রকাশ ঘটে মধ্যবিত্ত সমাজ মনস্কতায়।"

এভাবেই নীতিহীন, স্বার্থবাদী আত্মকেন্দ্রিক চরিত্রই ধীরে ধীরে স্বাধীন ভারতবর্ষের বাঙালি মধ্যবিত্তের একমাত্র পরিচয় হয়ে ওঠে। এরপর ক্রমে কংগ্রেস থেকে যুক্তফ্রন্ট সরকার

থেকে বামফ্রন্ট সরকারের প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে বঙ্গীয় মধ্যবিত্ত সমাজ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

১০.৫ বঙ্গীয় মধ্যবিত্ত সমাজের লক্ষণসমূহ

বাংলা মধ্যবিত্তের আবির্ভাব ও ক্রমবিকাশের ইতিহাস জানার পর আমাদের জেনে নেওয়া প্রয়োজন বাঙালি মধ্যবিত্তের লক্ষণসমূহকে। মধ্যবিত্তের লক্ষণসমূহের মধ্যে একটি গুরুত্ব পূর্ণ দিক হল নিজেদের 'স্ট্যাটাস' রক্ষা করার অপরিসীম তাগিদ। এই 'স্ট্যাটাস' রক্ষার সব থেকে সহজ পথ হল যেনতেন প্রকারে চাকুরি লাভ। বঙ্গীয় মধ্যবিত্ত সমাজের সৃষ্টি লগ্ন থেকে এই ছিল মধ্যবিত্ত সমাজের মূল আকাঙ্ক্ষা। আসলে মধ্যবিত্ত সমাজ বিশ্বাস করে একই সামাজিক মর্যাদার মাণদণ্ড মেনে চলার প্রবণতাকে। আর এই সুত্রেই মধ্যবিত্ত জনমানসে যোগ হয় আয়ের ব্যবধান থাকা সত্ত্বেও একই অর্থনৈতিক অভ্যাস বজায় রাখা। অর্থাৎ আয়ের বিরাট পার্থক্য থাকলেও এদের উদযাপন বা আকাঙ্ক্ষার মাঝে খুব বেশি পার্থক্য পরিলক্ষিত হয় না।

'স্ট্যটাস রক্ষা' ও একই সামাজিক মানদণ্ড মেনে চলার প্রবণতা থেকে মধ্যবিত্ত মানসে বিকাশ লাভ করে আর এক বিশেষ বৈশিষ্ট্য, সেটি হল অমিতব্যয়িতা। আয়ের চেয়ে বেশি ব্যয় করার প্রবণতা মধ্যবিত্ত সমাজে একটি বহু লক্ষিত বৈশিষ্ট্য। এই অমিতব্যয়িতার সূত্রে মধ্যবিত্ত চরিত্রে বিকাশ লাভ করে অর্থগৃধ্নুতা। যদিও অর্থগৃধ্নুতা বিকাশের আরেকটি কারণ পূর্বের সেই স্ট্যাটাস রক্ষার প্রবণতাও। নিজের চাহিদা পূরণের জন্য এই অর্থগৃধ্নুতা মধ্যবিত্ত মনে জন্ম দেয় আরও তিনটি বিশেষ লক্ষণ; সেগুলি হল সুবিধালোভী মনোভাব, আত্মকেন্দ্রিকতা আর আদর্শচ্যুতি। এ বিষয়ে এস্থলে বীরেন্দ্র দত্তের সুন্দর একটি মন্তব্য প্রণিধানযোগ্য-

"শ্রম না দিয়ে ভোগ্যপণ্য ব্যবহার করে অর্থ জমিয়ে সেই অর্থ-ব্যবস্থায় তারা স্থির, সুখী, আত্মসর্বস্ব। তাই দুর্নীতি বিলাস ক্ষয়রোগের অসংখ্য জীবাণুর মত তাদের স্বভাবে ভদ্রতার অন্তরালে লালিত হয়।"

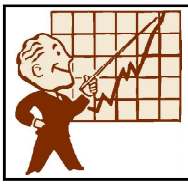
আত্মকেন্দ্রিকতার মূল স্বভাবহেতু যে সুবিধাবাদিতার আত্মপ্রকাশ, সে সুবিধাবাদিতা ব্যক্তি বিশেষের ক্ষেত্রে উপরওয়ালার নির্লজ্জ পদলেহনের রূপ নিলেও, গোষ্ঠীগতভাবে ছদ্মবেশ ধারণ করে অর্থনৈতিক দাবিদাওয়া সর্বস্ব রাজনৈতিক আন্দোলনের।

আমরা জানি বাঙালি মধ্যবিত্ত ধীরে ধীরে নাগরিক সমাজের অন্তরালে লালিত হয় বিশেষ ভাবে। তাই যে নাগরিক জীবনের অর্ধেকের বেশি পরিবারের একটি মাত্র থাকার ঘর এবং মাথা পিছু পঁচিশ-তিরিশ বর্গফুট শোবার ও বসবার জায়গা, তাছাড়া জল-কল-আলোর অভাব সেই মধ্যবিত্ত পরিবারের প্রধান বৈশিষ্ট্য হয়ে দাঁড়ায় আকর্ষণহীনতা। ঘরের টান নেই, ঘরে জায়গাও নেই শোয়ার-বসার বা নিভৃত কথা বলার। কাজেই রাস্তা ও চায়ের দোকানই হয়ে ওঠে ঘর। আর এই সূত্রেই তাদের মাঝে বিকাশ লাভ করে এক অপূরণীয় স্বপ্নবিলাস।

স্বপ্নের পালে ভর করে মধ্যবিত্ত বাঙালি পৌঁছে যেতে চায় সব পেয়েছির দেশে। বেকারত্ব বা কর্মহীনতা তাদের স্বপ্নের উড়ানের একমাত্র বাঁধা। আর এই কারণেই তারা জীবনের অসম প্রতিযোগিতায় নিঃসঙ্গ, একা। আর এই সূত্রে তাদের চরিত্রে বিকাশ লাভ করে ফাঁকি দিয়ে স্বর্গলাভের প্রবণতা। আর এইজন্যই বাঙালি মধ্যবিত্তের শর্টকাট-এর প্রতি খুব লোভ। আর এজন্যই তাদের চরিত্রে বিকাশ লাভ করে ধর্যহীনতা এবং অসাধুতা। নিজের অপ্রাপনীয়কে পাওয়ার আকাঙ্ক্ষায় মধ্যবিত্ত বাঙালি অসৎ উপায় এমনকি নিজের চরিত্রের ভাবমূর্তিকে বাজি রাখতেও পিছপা নয়। এর ফলে এদের চরিত্রে সম্পর্কের মেকি সত্ত্বা ধীরে ধীরে লালিত হয়। নিজের আকাঙ্ক্ষা পুরণ বা নিজের স্ট্যাটাস সুরক্ষার জন্য এদের চরিত্রে প্রবেশ করে আপোস রক্ষা করে চলার মানসিকতা।

মধ্যবিত্ত বাঙালি চরিত্রে জড়িয়ে থাকা আরেকটি লক্ষণ হল কুংস্কারের প্রতি আস্থা আবার এরই বিপরীতে এরা আধুনিকতায় বিশ্বাসী, এ এক আশ্চার্য বৈপরীত্য এক দেহে রাম ও রাবপ বাসের ন্যায়। আসলে মধ্যবিত্ত মানসে আধুনিকতা ও প্রগতিবাদ কেবল মুখোশ মাত্র, তার বদলে বাঙালি মধ্যবিত্ত অনেকাংশে প্রতিক্রিয়াশীল। বলার কথা প্রগতিবাদ ও প্রতিক্রিয়াশীল দুই বিপরীত অংশের শান্তিপূর্ণ সহবস্থান বাঙালি মধ্যবিত্ত মানসে সহজ লক্ষণীয়। বাঙালি মধ্যবিত্ত চরিত্রে আত্মনিন্দা আছে বরং আত্ম সমালোচনা নেই। তবে শুধু যে আত্ম সমালোচনার ক্ষেত্রে এই মন শিথিল তা কিন্তু নয়, বরং যেকোনো সমালোচনার ক্ষেত্রে এই মন অতিশয় দুর্বল। নিজের একটি ইমেজ রক্ষা করে চলার জন্য এরা সদা তৎপর। তাই যেকোনো সমস্যা বিশ্লেষণ করার জন্য যে বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গি প্রয়োজন তাই এই জনচরিত্রে অনুপস্থিত। যুক্তি অনুসরণ করার চেয়ে যান্ত্রিকভাবে আপ্ত বাক্যের উপর নির্ভর করায় এই মধ্যবিত্ত মানস সদা অভ্যস্ত।

তবে এতসব নেতিবাচক লক্ষণ সত্ত্বেও একথা স্বীকার করতেই হবে যে বাংলার সর্বাধিক বিকাশে এই মধ্যবিত্ত সমাজের দায়িত্ব কিন্তু কম নয়। কেননা সমগ্র বাঙালি মধ্যবিত্ত আদর্শচ্যুত একথা বলা হয়তো ঠিক নয় কারণ এক সময় এই মধ্যবিত্ত আদর্শবাদীও বটে। আর এই আদর্শবাদের মূল স্তম্ভ সাম্যবাদ। এই আদর্শবাদে কোনো স্বার্থপরতা নেই, নেই আত্মকেন্দ্রিকতার ছিটেফোটা। দিনের পর দিন স্বার্থহীনভাবে সমাজ হীতকারক কাজে আত্মনিয়োগ করেছিল বাঙালি মধ্যবিত্ত, তাই বাংলায় একটি প্রচলিত প্রবাদই রয়েছে 'ঘরের খেয়ে বনের মোষ তাড়ানো।' আসলে সামগ্রিকভাবে মধ্যবিত্ত লক্ষণ বলতে গেলে এ এক নেতিবাচক ও ইতিবাচক মানসিকতার আশ্চার্য মিশ্রণ। সময়ের বদলে সে যে মন নীতিভ্রষ্ট, তেমনি সেই সময়ের দাবি মেনেই সে স্বার্থত্যাগী। যদিও বিশ্বায়নের এই বিপ্লবে সেই স্বার্থত্যাগের সাধুপথ বেয়ে মধ্যবিত্ত জনমানস অনেকখানি এগিয়ে গেছে, যার ফলে হয়ত 'মধ্যবিত্ত মানসিকতা' আজ অনেকাংশেই নিন্দাসূচক বিশেষণে পরিণতে হয়েছে দিনে দিনে।



অগ্রগতি নির্ধারক প্রশ্ন

২. বঙ্গীয় মধ্যবিত্তের লক্ষণসমূহ আলোচনা করুন। (২০০ শব্দের মধ্যে)

১০.৬ মেট্রোপলিটন সংস্কৃতি ও মধ্যবিত্তের সংকট

মেট্রোপলিটন সংস্কৃতির কথা বলতে গেলে, প্রথমেই উল্লেখ করা প্রয়োজন বর্তমান মেট্রোপলিটন সংস্কৃতি-কর্পোরেট সংস্কৃতির প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ প্রভাব তথা মদতে লালিত। তবে মেট্রোপলিটন সংস্কৃতি মানেই খারাপ এই সরলীকৃত উপসংহারে খুব সহজে না পৌঁছন ভালো। অথচ মেট্রোপলিটন সংস্কৃতি যখন কর্পোরেট সংস্কৃতির মদত পুষ্ট তখন তা সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত করে মধ্যবিত্ত সংস্কৃতিকেই। তাই আবার দেখার বিষয় কীভাবে মেট্রোপলিটন সংস্কৃতি মধ্যবিত্ত সংকটের কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে।

যদি ক্ষেত্র সমীক্ষকের দৃষ্টিতে দেখা যায়, তবে আমরা দেখবো যে মধ্যবিত্তের অর্থনৈতিক সংকট দিনান্তে প্রবল থেকে প্রবলতর হয়েছে। এমন পরিস্থিতিতে মধ্যবিত্ত মানুষ যেকোনো প্রকারে অর্থের পিছনে ধাববান হয়েছে, কোনো কোনো ক্ষেত্রে তারা এজন্য নৈতিকতা বিসর্জনে এগিয়ে আসে। সারা জীবন তারা ধনবান হবার জন্য প্রাণপাত করে, তবু তার সংকট মুক্তি ঘটে না। ব্যতিক্রম আছে তবে তা নগণ্য। কর্পোরেট সংস্কৃতির অঙ্গুলিহেলনে বেড়ে চেলা মেট্রোপলিটন সংস্কৃতির সবচেয়ে বিষময় সৃষ্টি ব্যক্তিকেন্দ্রিকতা । মেট্রোপলিটন সংস্কৃতি আগেও ছিল, এখনও আছে তবে তা আগে মানুষকে এতটা আত্মস্বার্থে কুপমণ্ডুক করে তোলেনি। কর্পোরেট সংস্কৃতির অন্যতম অবদান ভোগবাদ। ভোগবাদ মানুষকে আরও লোভী তৈরি করে, অনৈতিক কাজ করতে উদ্বুদ্ধ করে, বিপথে পরিচালিত করে। তাই সমগ্র ভারতবর্ষসহ এখন পশ্চিমবঙ্গেও এই ভোগবাদী সংস্কৃতির বাড়বাড়ন্ত।

উত্তরাধিকার সূত্রে বাঙালির অন্তরে বেশ কিছু সংস্কার ছিল, এই সংস্কার মানেই কু-সংস্কার নয় বরং সেগুলি বাঙালির অন্তরাত্মার পরিচায়ক। কিন্তু মেট্রো পলিটন সংস্কৃতির বৃত্তে প্রবেশের সঙ্গে সঙ্গে মধ্যবিত্ত বাঙালি এই পবিত্র সংস্কার গুলো থেকে নিজেদের দল ছুট করেছে। অথচ এই সংস্কৃতি চেতনার উল্টো দিকে কোনো উন্নততর সংস্কৃতি গড়ে উঠেনি, অথচ পুরনো শুভ অভ্যাসাদি পরিত্যক্ত হয়েছে। ফলে এক চরম শূন্যতাবোধ বাঙালি মধ্যবিত্তকে গ্রাস করেছে। মধ্যবিত্তের বিকাশে এ এক অনন্য প্রতিবন্ধকতা। অন্যদিকে মেট্রোপলিটন সংস্কৃতির দূষিত বায়ু গায়ে লাগিয়ে ক্রমেই যৌথ পরিবারগুলো ভেঙে টুকরো টুকরো হয়ে গিয়েছে। সন্তানের শোয়ার ঘর একক 'বেডরুম' থিয়োরিতে হয়েছে আলাদা, ফলত নব প্রজন্মের চরিত্রে প্রবেশ করছে স্বার্থপরতা। সেই সঙ্গে নিজেকে সামগ্রিকভাবে প্রকাশ করতে না পাড়ার বেদনায় তাদের মনে জাগছে চরম হতাশা, যার ফলে মধ্যবিত্ত সমাজে হতাশা থেকে আত্মহত্যার প্রবণতা উদ্বেগজনক পরিস্থিতিতে পৌঁছেছে।

কর্পোরেট সংস্কৃতি সাম্রাজ্যবাদের অন্যতম অস্ত্র। সাম্রাজ্যবাদ নিজের স্বার্থে মেট্রোপলিটন সংস্কৃতির সঙ্গে গাঁটছড়া বেঁধেছিল এই ভারতীয় উপমহাদেশেও। আসলে নিজের শাসন ভিতকে দীর্ঘায়িত করার জন্য এখানের মধ্যবিত্তকে স্বার্থপরতার বিষমন্ত্রে সমাজ বিমুখ করে তুলতে হবে। আর ব্রিটিশের এই অভিসন্ধি পূর্ণের লক্ষ্যে মেট্রোপলিটন সংস্কৃতির বঙ্গে প্রচলন। অথচ ব্রিটিশ চলে যাওয়ার পরেও বঙ্গীয় মধ্যবিত্ত এই সংস্কৃতির ছত্রছায়ার বাইরে যেতে পারেনি। মধ্যবিত্ত সমাজে তাই পচন; অথচ একসময় এই মধ্যবিত্তই সমাজ সংস্কারে অগ্রণী ভূমিকা নিয়েছিল। মেট্রোপলিটন সংস্কৃতির পালনে তাই এখন মধ্যবিত্তের সাহিত্য, শিল্পে, গানে বেনোজলের মতো বর্জ্য প্রবেশ করেছে। সিনেমা, গানে বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই তাই কামগন্ধি যৌনতায় আকুল। গান কেবল উত্তেজনার পালে ভর করে শরীরে উন্মাদের তরঙ্গ ভরে দিতে চায়।

মেট্রোপলিটন সংস্কৃতির ইঁদুর দৌড় যাপনে পড়ে মধ্যবিত্তের এই যে সংকট তাও যেন মধ্যবিত্তের গাঁ সওয়া, সবাই জানে হয়তো এটা ঠিক নয়, এই বদল একটি শাশ্বত সংস্কৃতির মৃত্যু তবুও মধ্যবিত্তের গতিবিধি অনেকটা এই বেশ ভালো আছি গোছের। আসলে মেট্রোপলিটন সংস্কৃতি এতটাই শক্তশালী ও প্রলোভনীয় যে সে মধ্যবিত্তকে তাঁরই বানানো চক্রব্যুহে সম্পূর্ণ আটকে ফেলেছে। ভাবলে অবাক হতে হয় এক সময় সবচেয়ে প্রতিবাদী শ্রেণির এই পরিণতি, যে পরিণতিকে বেছে নিয়ে বঙ্গীয় মধ্যবিত্ত জনসমাজ স্বেচ্ছায় তার ঐতিহ্যগত পরম্পরা তথা কৃষ্টি থেকে নির্বাসন নিয়েছে।

১০.৭ অধ্যায় সংক্ষেপ

অতএব মধ্যবিত্তের এই চুলচেরা বিশ্লেষণের পর আমাদের বুঝতে অসুবিধে হবার কথা নয়, একটি বিশেষ সামাজিক অবস্থা থেকে বঙ্গীয় মধ্যবিত্ত সমাজের উত্থান ও তাদের ক্রমবর্ধমান বিবর্তনকে। যদিও মূলগতভাবে উঁচুলোকের দাবি আজও সমাজের অন্তরালে বাজে; তবে বর্তমানে মধ্যবিত্তই যেন হয়ে উঠেছে এই সমাজ ব্যবস্থার প্রধান মুখ। একটা কথা এখানে মনে রাখা উচিত মধ্যবিত্ত জীবনের মানচিত্রে এক রদবদলের কারণ হয়ে উঠেছিল দেশ ভাগ। অজস্র শরণার্থীর চাপ, ছিন্নমূল মানুষের দুর্বিষহ জীবন, জাতীয় জীবনে তুমুল জনসংখ্যা বিস্ফোরণ, মানুষের জীবন ও জীবিকার বহুমুখী সংকট দেশভাগ উত্তর বাংলাকে ভিতর থেকে বদলে দিয়েছে অনেকভাবে। একদিকে অন্ন-বস্ত্র-বাসস্থানের প্রবল সংকট, অন্যদিকে পেশার দুনিয়ায় তীব্র প্রতিযোগিতা সমগ্র পশ্চিমবঙ্গের চেহারাকে এক সময় বদলে দেয়। জবর দখল কলোনি আর অজস্র বস্তিতে এক অন্য ধারার জীবন শুরু হয়েছে। যে-কোনো উপায়ে জীবনে টিকে থাকার প্রশ্নে অনঢ় এথিক্স না-মানা জীবন, গুণ্ডামি-তোলাবাজি-বেশ্যাবৃত্তির দৌরাত্ম শুধু ঘটি-বাঙালের সাংস্কৃতিক পার্থক্যটুকুই প্রকট করেনি, প্রকট করেছে সামাজিক জীবনমানের পার্থক্যকেও। আসলে শেষ পর্যন্ত ছিন্নমূল জীবন, ক্যাম্পের অসহনীয় জীবনযাত্রা এক অবক্ষয়িত মনুষ্যত্বেরও জন্ম দিয়েছিল, জন্ম দিয়েছিল

এক বিনষ্ট ভবিষ্যৎ-পুরুষ। পরবর্তীতে অবক্ষয়িত যাপিত জীবনের একাংশ তাই আশ্রয় করেছে সন্ত্রাসকে। বৃদ্ধি পেয়েছে নবীন ও প্রবীণের মতাদর্শগত পার্থক্য।



১০.৮ অধ্যায়টি পাঠ করে আমরা কী শিখলাম

- মধ্যবিত্ত আধুনিক সমাজ ব্যবস্থার অন্যতম সমাজ অভিজ্ঞান এই বিষয়ে জানা সম্ভব হল।
- মেট্রোপলিটন সংস্কৃতির পরিচয় পাওয়া সম্ভব হল।
- মধ্যবিত্ত মানসকিতার সার্বিক পরিচয় পাওয়া সম্ভব হল।



১০.৯ অতিরিক্ত পঠন

আচার্য, অনিল (২০১৪); সত্তর দশক; কলকাতা : অনুষ্টুপ

কবিরাজ, নরহরি (১৯৪৬); মধ্যবিত্ত কোন পথে, কলকাতা : ঈগল পাবলিশার্স

ঘোষ, বিনয় (১৯৮৪); মেট্রোপলিটন মন : মধ্যবিত্ত বিদ্রোহ; কলকাতা : ওরিয়েন্ট ল্যাংম্যান

ঘোষ, বিনয় (১৪২৩); বাংলার নবজাগৃতি; কলকাতা : প্রকাশ ভবন

ঘোষ, বিনয় (২০০৯); বাংলা সামাজিক ইতিহাসের ধারা; কলকাতা : প্রকাশ ভবন

চক্রবর্তী, অমিতাভ (২০০৮); বাঙালী মনন সম্প্রীতি ও সাম্প্রদায়িকতা; কলকাতা : উবুদশ

চৌধুরী, সিদ্ধার্থরঞ্জন (২০১১); বাঙালি মধ্যবিত্ত মানস; কলকাতা : উবুদশ

দে, অমলেন্দু (১৯৭৪); বাঙালি বুদ্ধিজীবী ও বিচ্ছিন্নতাবাদ; কলকাতা : রত্না প্রকাশন

বন্দ্যোপাধ্যায়, সুমন (২০০৮); উনিশ শতকের কলকাতা ও সরস্বতীর ইতর সন্তান; কলকাতা : অনুষ্টুপ

রায়, অলক (১৯৮৯); বিশ শতক; কলকাতা : দে'জ পাবলিশিং

শাস্ত্রী, শিবনাথ (২০০৭); রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গ সমাজ, কলকাতা, নিউ এজ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড

Caudwell, Christopher (1990); Studies In A Dying Culture : London : PPH

Mishra, B.B (983); The Indian Middle Class :. Their Groth In Modern Times; Delhi : Oxford University Press

Pandey, Vinita (2009); Crisis of Urban Middle Class:, New Delhi : Rawat Publication

১০.১০ অগ্রগতি নির্ধারক উত্তর-সংকেত

১. 'মধ্যবিত্ত' শব্দটির সংসদ বাংলা অভিধান মতে যদি অর্থদেখি তবে দেখব এর অর্থ হল ..... এর কারণ মধ্যবিত্ত শ্রেণির প্রাথমিক উৎপত্তি ইউরোপেই.....এ ভাবে উত্তরটি গড়েতুলতে হবে। (দ্রষ্টব্য ১০.৩ অংশ)

২. বাংলা মধ্য বিত্তের আবির্ভাব ও ক্রম বিকাশের ইতিহাস জানার পর আমাদের জেনে নেওয়া.....'স্ট্যাটাস' রক্ষা করার অপরিসীম তাগিদ.....এভাবে উত্তর গড়ে তুলুন। (দ্রষ্টব্য ১০.৫ অংশ)

১০.১১ আদর্শ প্রশ্নাবলি

১. বঙ্গীয় মধ্যবিত্তের সংজ্ঞা ও স্বরূপ বিশ্লেষণ করুন।

২. বাংলার মধ্যবিত্ত মানসিকতা হিসাবে বাংলা মধ্যবিত্তের লক্ষণগুলো তুলে ধরুন।

৩. মেট্রোপলিটন সংস্কৃতি কী ? এই মেট্রোপলিটন সংস্কৃতি মধ্যবিত্ত সংকটের জন্য কী ভাবে দায়বদ্ধ আলোচনা করুন।

৪. বাংলার মধ্যবিত্তের আবির্ভাব ও ক্রমবিকাশের ইতিহাসটি সংক্ষেপে লিপিবদ্ধ করুন।

৫. মধ্যবিত্ত সমাজের সংক্ষিপ্ত পরিচয় তুলে ধরে, এই সমাজের ক্রমবিকাশের কারণ সম্বন্ধে একটি নাতিদীর্ঘ আলোচনা প্রস্তুত করুন।

৬. মধ্যবিত্তের সংক্ষিপ্ত পরিচয় তুলে ধরে এই সমাজের প্রধান প্রধান বৈশিষ্ট্যর প্রতি আলোকপাত করুন।

৭. মধ্যবিত্ত জনমানসের গতি-প্রকৃতি বিষয়ে সংক্ষেপে আলোচনা করুন।

৮. বঙ্গীয় মধ্যবিত্ত উন্মেষের পেছেনে ব্রিট্রিশের প্রচলন করা ভূমিরাজস্ব নীতির গুরুত্ব কতখানি আলোচনা করুন।

অধ্যায় ১১ : বাংলার সমাজ সংস্কৃতিতে বিভিন্ন জাতীয় আন্দোলনের প্রভাব : ব্রিটিশ পর্ব-৩

বিন্যাসক্রম

১১.১ জ্ঞাতব্য বিষয়

১১.২ উদ্দেশ্য

১১.৩ বঙ্গভঙ্গ-বিরোধী আন্দোলন

১১.৩.১ বঙ্গভঙ্গের বিভিন্ন প্রস্তাব

১১.৩.২ বঙ্গভঙ্গের পক্ষে কার্জনের যুক্তি

১১.৩.৩ বঙ্গভঙ্গ প্রণয়নে কার্জনের মূল উদ্দেশ্যসমূহ

১১.৩.৪ বঙ্গভঙ্গ ঘোষণা

১১.৩.৫ বঙ্গভঙ্গ-বিরোধী আন্দোলন

১১.৪ সভা-সমিতি

১১.৫ মহাত্মা গান্ধীর আগমন

১১.৬ বিভিন্ন জাতীয় আন্দোলন

১১.৭ বিভিন্ন ট্রেড ইউনিয়ান

১১.৮ দেশ ভাগ

১১.৮.১ ভারত বিভাগের কারণ

১১.৮.২ দেশ ভাগ পরিকল্পনা ও তার রূপায়ণ

১১.৮.৩ দেশ ভাগের ফলাফল

১১.৯ অধ্যায় সংক্ষেপ

১১.১০ অধ্যায়টি পাঠ করে আমরা কী শিখলাম

১১.১১ অতিরিক্ত পঠন

১১.১২ অগ্রগতি নির্ধারক উত্তর-সংকেত

১১.১৩ আদর্শ প্রশ্নাবলি

১১.১ জ্ঞাতব্য বিষয়

এই অধ্যায় পাঠ করে শিক্ষার্থী—

- ভারতীয় জাতীয়তাবাদ উন্মেষের মূল স্রোতের ইতিহাসের সঙ্গে পরিচিত হতে পারবেন।
- জাতীয়তাবাদী চিন্তা উন্মেষ, তার বিস্তার ও তার কর্তব্য পালনে বঙ্গের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা সম্পর্কে বিশেষ জ্ঞান অর্জন করতে পারবেন।
- গান্ধীজির ভারত আগমন ও বিভিন্ন জাতীয় আন্দোলনে তাঁর ভূমিকা বিষয়ে অবগত

হতে পারবেন।

১১.২ পরিচিতি

সাহিত্য সম্পর্কে মানুষের ধারণা নিয়ত পরিবর্তনশীল। এক সময় মনে করা হত যে, সাহিত্য বুঝি কেবল মাত্র অবসর যাপন এবং দেব-মহিমা প্রচারের খতিয়ান মাত্র। এখন এই দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন ঘটেছে। সাহিত্য বলতে এখন মানব সভ্যতার সামগ্রিক রূপকেই বোঝায়। কেবল মাত্র এককেন্দ্রিক নয় — ইতিহাস, সমাজ, ধর্ম, অর্থনীতি, সংস্কৃতি সবই এখন এর অঙ্গীভূত। এসবের সম্মিলিত প্রভাবই সাহিত্যের গতি-প্রকৃতি নিয়ন্ত্রণ করে। বিশেষত সাহিত্যের জগতে ইতিহাসের দায় গভীর ভাবে বর্তায়, কারণ সাহিত্য যেহেতু সমাজ বহির্ভূত কিছু নয় তাই তাতে ইতিহাসের দাবি হয়তো সর্বাগ্রে স্বীকৃত।

এবার আসা যাক ইতিহাসের কথায়। বিভিন্ন ঐতিহাসিক বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন উদ্দেশ্য ও বিভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে ইতিহাসের ব্যাখ্যা করেছেন। ইংরেজ শাসনাধীনে ইংরেজ ঐতিহাসিকদের হাতেই আধুনিক ভারতীয় ইতিহাস-চর্চার সূচনা। ইংরেজ ঐতিহাসিকরা সাম্রাজ্যবাদী দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে ভারত ইতিহাসের ব্যাখ্যা করতেন। তাঁদের লক্ষ্য ছিল ইংরেজ শাসনের সুদৃঢ়করণ। পরে এল জাতীয়তাবাদী দৃষ্টিভঙ্গি। ভারতীয় ঐতিহাসিকরা প্রাচীন ভারতের ইতিহাস, আকবর, শিবাজি, সিরাজউদ্দৌলা প্রভৃতিকে অন্যভাবে চিত্রিত করতে শুরু করলেন-আকবর, প্রতাপাদিত্য, শিবাজি, সিরাজ 'জাতীয়বীর'-এ পরিণত হলেন। সাম্প্রতিক কালে ভারত ইতিহাসের মার্কসবাদী ব্যাখ্যা, ইতিহাসে নিম্নবর্গের ভূমিকা (Subaltern studies) প্রভৃতি নানা দৃষ্টিকোণ থেকে ইতিহাস রচনার চেষ্টা চলছে। আর এই সামগ্রিক চিত্ররূপে বারংবার চোখ কেড়েছে ভারতীয়ের জাতীয়তাবাদী চেতনা। বিশেষত বাংলার জাতীয়তাবাদী চেতনায় যে বর্ণময় অভিজ্ঞতা তা ইতিহাস কখনোই বর্ণনা করতে কুণ্ঠাবোধ করেনি। নিম্নে আরেকবার তাই সেই ইতিহাসেরই সংক্ষিপ্ত রূপায়ণ তুলে ধরা হলো।

১১.৩ বঙ্গভঙ্গ-বিরোধী আন্দোলন

বাংলার জাতীয় আন্দোলনের বিষয়টিকে এক সময় শাসক প্রভু ব্রিটিশ ভালো চোখে দেখেনি। বাংলা সর্বস্তরে স্বদেশ চেতনার উন্মাদনা দেখে বাংলাকে দুর্বল করতে সরকার বাংলাকে দ্বিখণ্ডিত করে দিতে চায়। তবে মনে রাখতে হবে লর্ড কার্জন বঙ্গ ভঙ্গ পরিকল্পনার উদ্ভাবক ছিলেন না। তাঁর শাসনকালের বহু পূর্ব থেকেই একাধিকবার বঙ্গভঙ্গের প্রস্তাব উত্থাপিত হয়। সেগুলি হলো—

১১.৩.১ বঙ্গভঙ্গের বিভিন্ন প্রস্তাব

(১) ১৮৫৪ খ্রিস্টাব্দে বাংলা, বিহার, উড়িষ্যা ও আসাম-এর শাসনভার একজন লেফটেন্যান্ট গভর্নরের উপর অর্পিত হয়।

(২) ১৮৭৪ খ্রিস্টাব্দে আসামকে বাংলাদেশ থেকে বিচ্ছিন্ন করে একটি পৃথক প্রদেশে পরিণত

করা হয়। এসময় গোয়ালপাড়া, কাছাড় ও শ্রীহট্ট এই তিনটি বাংলা ভাষা-ভাষী জেলাকে আসামের সঙ্গে জুড়ে দেওয়া হয়।

(৩) ১৮৯৬ খ্রিস্টাব্দে আসামের চিফ কমিশনার উইলিয়াম ওয়ার্ড বাণিজ্যিক ও অর্থনৈতিক প্রয়োজনীয়তার কথা বলে সমগ্র চট্টগ্রাম বিভাগ এবং ঢাকা ও ময়মনসিংহ জেলাদ্বয়কে আসামের সঙ্গে যুক্ত করার প্রস্তাবদেন, কিন্তু প্রবল গণবিক্ষোভের ফলে এই প্রস্তাব বাতিল হয়ে যায়।

(৪) ১৯০৩ খ্রিস্টাব্দে বাংলার লেফটেন্যান্ট গভার্নর অ্যান্ড্রু ফ্রেজার আবার নতুন করে এক বঙ্গভঙ্গের প্রস্তাব দেন।

(৫) শেষপর্যন্ত ভারত সরকারের স্বরাষ্ট্র সচিব হাবার্ট রিজলি স্থির করেন যে, সমগ্র চট্টগ্রাম বিভাগ এবং ঢাকা ও ময়মনসিংহ জেলাকে আসামের সঙ্গে যুক্ত করা হবে। এই পরিকল্পনা 'রিজলি পরিকল্পনা' নামে খ্যাত। এই পরিকল্পনা প্রকাশিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে দেশময় প্রতিবাদের ঝড় ওঠে-এমন কী ইউরোপীয়দের মুখপত্র 'ইংলিশম্যান' পত্রিকা'এবং ইউরোপীয় বণিক সংঘগুলিও এর বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানায়। শেষ পর্যন্ত সরকার বাধ্য হয়ে এই পরিকল্পনা রদ করে এবং গোপনে বঙ্গভঙ্গের একটি নতুন পরিকল্পনা তৈরি করতে থাকে।

(৬) নতুন পরিকল্পনা অনুসারে স্থির হয় যে ঢাকা বিভাগ, চট্টগ্রাম বিভাগ, রাজশাহী বিভাগ, পার্বত্য ত্রিপুরা, মালদহ জেলা এবং দার্জিলিং- অর্থাৎ উত্তরবঙ্গ ও পূর্ববঙ্গকে আসামের সঙ্গে যুক্ত করে 'পূর্ববঙ্গ ও আসাম' নামে একটি নতুন প্রদেশ গঠিত হবে এর রাজধানী হবে ঢাকা এবং শাসনভার থাকবে একজন লেফটেন্যান্ট গভর্নরের হাতে। অপরদিকে পশ্চিমবঙ্গ, বিহার ও উড়িষ্যা নিয়ে গঠিত হবে মূল বাংলা প্রদেশ এবং তার রাজধানী হবে কলকাতা।

১১.৩.২ বঙ্গভঙ্গের পক্ষে কার্জনের যুক্তি

- মাত্র একজন গভর্নরের পক্ষে বাংলা-বিহার-উড়িষ্যা নিয়ে গঠিত একটি প্রদেশের শাসনভার বহন করা সম্ভব নয়।
- সুদূর কলকাতা থেকে দুর্গম পূর্ববাংলাকে ভালো ভাবে শাসন করা সম্ভব হচ্ছে না।
- কলকাতা-কেন্দ্রিক পশ্চিমবঙ্গের জন্য পূর্ববঙ্গ, আসাম ও উড়িষ্যার উন্নতি বাধাপ্রাপ্ত হচ্ছে। মুসলিম-প্রধান পূর্ববঙ্গ হিন্দুদের প্রভাব থেকে মুক্ত হলে চাকরি ও উচ্চ শিক্ষার ক্ষেত্রে মুসলিম সম্প্রদায়ের অনেক সুবিধা হবে।
- স্বতন্ত্র প্রদেশ হিসেবে গঠিত হলেও আসাম অবহেলিত ছিল। কোনো দক্ষ কর্মচারী সেখানে যেতে চাইত না। তাই আসাম পূর্ববঙ্গের সঙ্গে যুক্ত হলে সেখানে একটি দক্ষ প্রশাসনিক ব্যবস্থা গড়ে উঠবে।
- স্বরাষ্ট্র সচিব রিজলি যুক্তি দেখান যে, আসাম পূর্ববঙ্গের সঙ্গে যুক্ত হলে আসামের চা, তেল, কয়লা প্রভৃতি চট্টগ্রাম বন্দর দিয়ে কম খরচে বাইরে রপ্তানি করা যাবে। সুতরাং সরকারি মতে শাসনতান্ত্রিক সুবিধা, অবহেলিত আসাম প্রদেশের উন্নতি এবং ক্ষয়িষ্ণু মুসলিম ও উড়িয়া সংস্কৃতির পুনরুজ্জীবনের জন্য বঙ্গভঙ্গ অপরিহার্য।

বলা বাহুল্য, বঙ্গবঙ্গভঙ্গের জন্য লর্ড কার্জন শাসনতান্ত্রিক সুবিধার কথা বললেও তা গ্রহণযোগ্য ছিল না। আয়তনই যদি মূল সমস্যা হত, তাহলে জাতীয় কংগ্রেসের প্রস্তাব গ্রহণ করে বাংলা থেকে উড়িষ্যা ও বিহারকে পৃথক করে বাংলা ভাষা-ভাষী মানুষদের এক সঙ্গে রাখা যেত। প্রকৃতপক্ষে কার্জনের মূল উদ্দেশ্য একেবারেই আলাদা।

১০.৩.৩ বঙ্গভঙ্গ প্রণয়নে কার্জনের মূল উদ্দেশ্যসমূহ

ভারতীয় রাজনৈতিক আন্দোলনের মধ্যমণি বাঙালিকে দুর্বল করে জাতীয় আন্দোলনকে দুর্বলতর করে দেওয়া ছিল বঙ্গভঙ্গের প্রধান উদ্দেশ্য।

১৯০৩ খ্রিস্টাব্দে লর্ড কার্জন বঙ্গভঙ্গ সম্পর্কে বাংলার গভর্নর ফ্রেজারকে লেখেন, "পূর্ববঙ্গের জেলাগুলির বাঙালিরা রাজদ্রোহাত্মক আন্দোলনকে উৎসাহ দেয়। অতএব তাদের বাকি প্রদেশ থেকে পৃথক করার প্রস্তাবের সপক্ষে এর চেয়ে দামি কোনো যুক্তি থাকতে পারেনা।"

কেবল মাত্র এই নয়-বাংলাকে দু'টুকরো করার মাধ্যমে লর্ড কার্জন হিন্দু ও মুসলিম সম্প্রদায়ের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি করে ভারতীয় জাতীয়তাবাদকে দুর্বল করতে সচেষ্ট হন। তিনি মনে করেছিলেন যে, এই ভেদ নীতির সাহায্যে তিনি মুসলিম সম্প্রদায়কে ব্রিটিশ সরকারের সমর্থকে পরিণত করতে সক্ষম হবেন।

বঙ্গভঙ্গের ব্যাপারে কার্জন আসামের চা-বাগিচাগুলির ইংরেজ মালিকদের স্বার্থ রক্ষার কথাও চিন্তা করেছিলেন। এইসব চা-বাগিচার ইংরেজ মালিকরা তাঁকে বোঝান যে, পূর্ববঙ্গ ও আসামকে নিয়ে একটি নতুন প্রদেশ গঠন করে এবং যদি আসামকে রেলপথে চট্টগ্রাম বন্দরের সঙ্গে যুক্ত করা হয় তাহলে আসাম থেকে কলকাতা বন্দরে চা আনার খরচ অনেক কমে যাবে। বলা বাহুল্য, তিনি ব্রিটিশ পুঁজি সম্পর্কেও সচেতন ছিলেন।

১০.৩.৪ বঙ্গভঙ্গ ঘোষণা

১৯০৫ খ্রিস্টাব্দের মে মাস থেকে বঙ্গভঙ্গর এই নতুন পরিকল্পনা কিছু কিছু সংবাদপত্রে প্রকাশিত হতে থাকলে বাঙালি জাতি এর বিরুদ্ধে প্রতিবাদে সোচ্চার হয়ে ওঠে। বাঙালির সমবেত প্রতিবাদকে উপেক্ষা করে ১৯০৫ খ্রিস্টাব্দের ১৯ শে জুলাই সরকারি ভাবে বঙ্গভঙ্গের পরিকল্পনা ঘোষিত হয় এবং বলা হয় যে, আগামী ১৬ ই অক্টোবর থেকে বঙ্গভঙ্গ কার্যকরী হবে। এর প্রতিবাদে সারা বাংলায়-পরে সারা ভারতে এক প্রবল আন্দোলন গড়ে ওঠে, যা স্বদেশি আন্দোলন নামে পরিচিত।

১১. ৩.৫ বঙ্গভঙ্গ-বিরোধী আন্দোলন

লর্ড কার্জন বলেছিলেন যে, বঙ্গভঙ্গ একটি স্থায়ী ঘটনা ("The Partition of Bengal is a settled fact.")-এর কোনও নড় চড় হবে না। বাংলা তথা ভারতের তদানীন্তন ও বিসংবাদী নেতা সুরেন্দ্রনাথ কার্জনকে 'চ্যালেঞ্জ' জানিয়ে বলেন, 'আমি এই স্থায়ী ঘটনা অস্থায়ী করে দেব' (" I will un-settle the settled fact.") জাতীয়তাবাদীদের কাছে বঙ্গভঙ্গ ছিল একটি

বিরাট 'চ্যালেঞ্জ'-স্বরূপ। বাংলা এই 'চ্যালেঞ্জ'-এর মোকাবিলা করতে বিন্দুমাত্র দ্বিধা করেনি। বাংলার বিক্ষুব্ধ জনসাধারণকে বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনে নেতৃত্ব দিতে অগ্রসর হন বাংলার মুকুটহীন রাজা সুরেন্দ্রনাথ।

১১.৩.৫.১ সংবাদপত্রে বিক্ষোভ :

১৯০৫ খ্রিস্টাব্দে ১৬ ই জুলাই কৃষ্ণকুমার মিত্রের 'সঞ্জীবনী' পত্রিকায় বঙ্গভঙ্গের বিরুদ্ধে 'বঙ্গের সর্বনাশ' শিরোনামায় এক সম্পাদকীয় প্রকাশিত হয়। সুরেন্দ্রনাথ তাঁর 'বেঙ্গলি' পত্রিকায় বঙ্গভঙ্গকে 'ভয়ঙ্কর জাতীয় দুর্দৈব' বলে অভিহিত করেছেন। বাংলার অন্যান্য পত্রিকাগুলি, এমনকী ভারত ও ভারতের বাইরে ইংরেজ-সম্পাদিত পত্রিকাগুলি, যথা—ইংলিশম্যান, স্টেটসম্যান, পাইওনিয়ার, ক্যাপিটাল, লন্ডন ডেইলি, টাইমস বঙ্গভঙ্গের বিরুদ্ধে মত প্রকাশ করে।

১১.৩.৫.২ বয়কট :

সরকারের বঙ্গভঙ্গ পরিকল্পনাকে কেন্দ্র করে বাঙালি জাতি সরকারের বিরুদ্ধে সর্বপ্রথম একটি কার্যকরী ও প্রতিরোধ-ব্যবস্থা গড়ে তোলে। ১৯০৫ খ্রিস্টাব্দের ১৩ই জুলাই কৃষ্ণকুমার মিত্র সম্পাদিত 'সঞ্জীবনী' পত্রিকায় সর্বপ্রথম সরকারের বিরদ্ধে এক সামগ্রিক বয়কটের কথা ঘোষণা করা হয়। ২০শে জুলাই এই পত্রিকাতে বয়কটের একটি 'প্রতিজ্ঞাপত্র' প্রকাশিত হয়। ১৭ই জুলাই 'অমৃতবাজার পত্রিকা'-য় প্রকাশিত একটি চিঠিতে বিলিতি দ্রব্য-বিশেষ করে ম্যাঞ্চেস্টার ক্লথ বয়কটের আহ্বান জানানো হয়, কারণ এর ফলে বিলেতের প্রভুদের টনক নড়বে এবং তাঁরা ভারতের প্রকৃত অবস্থা সম্পর্কে সচেতন হবেন। 'বয়কট' মন্ত্র প্রচারে সুরেন্দ্রনাথ, মতিলাল ঘোষ এবং কালীপ্রসন্ন কাব্য বিশারদ আন্দোলনের প্রথম পর্বে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা গ্রহণ করেন। ১৬ই জুলাই খুলনা জেলার বাগের হাট শহরে এক বিরাট জন সভায় বয়কটের প্রস্তাব গৃহীত হয়। ২১শে জুলাই দিনাজপুরের মহারাজার সভাপতিত্বে দিনাজপুরে অনুষ্ঠিত একসভায় বয়কটের এগারোটি প্রস্তাব গৃহীত হয়। এই সকল প্রস্তাবে বলা হয় যে সমস্ত অবৈতনিক ম্যাজিসট্রেট, জেলাবোর্ড, পৌরসভা ও পঞ্চায়েতের সদস্যরা পদত্যাগ করবেন এবং আগামী এক বছরকাল জাতীয়শোক পালিত হবে। পরে কলকাতা, ঢাকা, বীরভূম, নারায়ণগঞ্জ, টাঙ্গাইল, ময়মনসিংহ সহ সমগ্র বাংলা ও ভারতের অন্যান্য স্থানে ও অনুরূপ বয়কটের প্রস্তাব গৃহীত হয়।

১১.৩.৫.৩ রাখিবন্ধন ও অরন্ধনকর্মসূচি :

১৬ই অক্টোবর ৩০শে আশ্বিন বঙ্গভঙ্গ কার্যকরী হয়। সেদিন সারা দেশে হরতাল পালিত হয়। কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ সেদিন দেশবাসীদের নিয়ে 'রাখিবন্ধন'-এর পরিকল্পনা বাস্তবায়ন করেন। সেদিন তাঁর নেতৃত্বে নগ্নপদে এক বিরাট মিছিল গঙ্গাস্নানে যায় এবং স্নানের পর জাতি-ধর্ম নির্বিশেষে একে অন্যের হাতে 'রাখি' বেঁধে দেয়। 'রাখি' ঐক্যের প্রতীক, ভ্রাতৃত্বের প্রতীক, উভয় বঙ্গের মিলনের প্রতীক। রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী-র প্রস্তাব ক্রমে সেদিন সারাদেশে 'অরন্ধন'

পালিত হয় এবং বাংলার মা-বোনেরা সেদিন 'বঙ্গ লক্ষ্মীর ব্রত' গ্রহণ করেন। ওই দিন অপরাহ্নে সার্কুলার রোডে ৫০হাজার লোকের উপস্থিতিতে অসুস্থ আনন্দ মোহন বসু সভাপতিত্বে উভয় বাংলার ঐক্যের প্রতীক 'মিলনমন্দির' বা 'ফেডারেশন হল'-এর ভিত্তি স্থাপিত হয়। ওই দিন সন্ধ্যায় বাগবাজারে পশুপতি বসু-র গৃহে অনুষ্ঠিত একসভায় 'জাতীয় ধন ভাণ্ডার'-এর জন্য মাত্র এক ঘণ্টায় ৭০ হাজার টাকা সংগৃহীত হয়।

১১.৩.৫.৪ বঙ্গভঙ্গ-বিরোধী আন্দোলনে বাংলা সাহিত্য-সংস্কৃতি সমাজের ভূমিকা :

স্বদেশি আন্দোলনকে কেন্দ্র করে দেশের সাহিত্য ও শিল্প চর্চা নতুন রূপ ধারণ করে। রজনীকান্ত সেন দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর, অতুলপ্রসাদ সেন, কালীপ্রসন্ন কাব্য বিশারদ, ক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যা বিনোদ, গিরিশচন্দ্র ঘোষ, অক্ষয়কুমার মৈত্রেয় প্রমুখ কবি, নাট্যকার, গীতিকার ও প্রাবন্ধিক দের জাতীয়তাবাদী সৃষ্টিতে এক নব উন্মাদনা দেখা দেয়। ভগিনী নিবেদিতার প্রেরণায় অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর, নন্দলাল বসু, অসিত হালদার প্রমুখের শিল্পচেতনা ও শিল্পকার্যে স্বদেশি প্রভাব প্রত্যক্ষ হয়। বিজ্ঞান চর্চা ও শিক্ষা ক্ষেত্রেও এক যুগান্তর দেখা দেয়। রজনীকান্ত সেন এ সময় লেখেন—

"মায়ের দেওয়া মোট কাপড় মাথায় তুলে নেরে ভাই;
দীন-দুঃখিনী মা যে তোদের তার বেশী আর সাধ্য নাই।"

-এভাবে সেদিন বয়কটকে সমর্থন জানিয়ে বাংলার শিল্প-সাহিত্য-সংস্কৃতি সমাজ নিজেদের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিলেন।



অগ্রগতি নির্ধারক প্রশ্ন

১. ভারতের বঙ্গভঙ্গ বিরোধী আন্দোলনের প্রকৃতি চিত্রটি নিজের ভাষায় বর্ণনা করুন। (১৫০ শব্দের মধ্যে)

১১.৪ সভা-সমিতি

জাতীয় জাগরণের উষালগ্নে মধ্যবিত্ত ভারতবাসী উপলব্ধি করে যে একক ব্যক্তিগত প্রয়াস নয়-ইংরেজ সরকারের বিরুদ্ধে দেশীয় স্বার্থরক্ষা এবং সরকারি অনাচারের বিরুদ্ধে জনমত গঠনের এক মাত্র উপায় হল সংঘ বদ্ধ রাজনৈতিক আন্দোলন। এই উপলব্ধি থেকেই উনিশ শতকে ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে বেশ কিছু রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানের উন্মেষ লক্ষ করা যায়। এইকারণে ঐতিহাসিক ড° অনিল শীল ঊনবিংশ শতাব্দীকে 'সমিতির যুগ' ('Age of Association') বলে অভিহিত করেছেন। নিম্নে বঙ্গের বেশ কিছু সভা সমিতি বিষয়ে আলোচনা করা হল।

বঙ্গ ভাষা প্রকাশিকা সভা

১৮৩৬ খ্রিস্টাব্দে জমিদার কালীনাথ রায়চৌধুরী, দ্বারকানাথ ঠাকুর, প্রসন্নকুমার ঠাকুর এবং রামমোহনের শিষ্যদের উদ্যোগে 'বঙ্গ ভাষা প্রকাশিকা সভা' প্রতিষ্ঠিত হয়। নামের দিক

থেকে রাজনৈতিক সংগঠন মনে না হলেও ব্যবহারে এটিই কিন্তু ভারতবাসীদের কাছে সর্বপ্রথম কোনো রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান।

জমিদার সভা

রাধাকান্ত দেব, দ্বারকানাথ ঠাকুর ও প্রসন্নকুমার ঠাকুরের উদ্যোগে ১৮৩৮ খ্রিস্টাব্দে 'জমিদার সভা' প্রতিষ্ঠিত হয়। এই প্রতিষ্ঠানের সকল কার্যনির্বাহ সদস্য জমিদার হলেও সভাটির মূল উদ্দেশ্য ছিল জাতি, ধর্ম নির্বিশেষে দাবির কথা প্রচার এবং চর্চা ও আদায়ের চেষ্টা করা।

বেঙ্গল ব্রিটিশ-ইন্ডিয়া সোসাইটি

দ্বারকানাথ ঠাকুরের প্রচেষ্টায় ইংল্যান্ড থেকে আগত বিখ্যাত বাগ্মী জর্জ টমসনের উদ্যোগে বঙ্গের যুব মানসকে উদ্বুদ্ধ করতে ১৮৪৩ খ্রিস্টাব্দে 'বেঙ্গল ব্রিটিশ-ইন্ডিয়া সোসাইটি' প্রতিষ্ঠা করা হয়।

ব্রিটিশ-ইন্ডিয়ান অয়াসোসিয়েশন

১৮৫১ খ্রিস্টাব্দে বাংলার শিক্ষিত বৌদ্ধিক সমাজ এক বৃহত্তর সংগঠনের প্রয়োজন অনুভব করলে জমিদার সভা ও বেঙ্গল ব্রিটিশ-ইন্ডিয়া সোসাইটি একত্রিত হয়ে 'ব্রিটিশ-ইন্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশন' নামে এক বৃহত্তর সংগঠন গড়ে তোলেন। যার প্রথম সভাপতি ছিলেন রাধাকান্ত দেব। ব্রিটিশ-ইন্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশনের আদলে ক্রমান্বয়ে বোম্বাইয়ে দাদা ভাই নওরাজির উদ্যোগে 'বোম্বাই অ্যাসোসিয়েশন' ১৮৫২, পুনায় 'ডেকান অ্যাসোসিয়েশন' (১৮৫২) এবং মাদ্রাজে 'মাদ্রাজ নেটিভ অ্যাসোসিয়েশন' (১৮৫২) গড়ে ওঠে।

ইন্ডিয়ান লিগ

বাংলার শিশিরকুমার ঘোষ, হেমন্তকুমার ঘোষ ও কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়ের উদ্যোগে ভারতীয় জনসাধারণের মধ্যে জাতীয়তাবাদ ও রাজনৈতিক সচেতনতা বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে 'ইন্ডিয়ান লিগ' প্রতিষ্ঠিত হয়।

ইন্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশন

আনন্দমোহন বসু, শিবনাথ শাস্ত্রী, দ্বারকানাথ গঙ্গোপাধ্যায় ও সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের উদ্যোগে কলকাতার অ্যালবার্ট হলের ১৮৭৬ খ্রিস্টাব্দে বিশাল জনতা সমাবেশে 'ইন্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশন' বা 'ভারতসভা'-র প্রতিষ্ঠা হয়। দেশে শক্তিশালী জনমত গড়ে তোলার উদ্দেশ্যে এই সভার প্রতিষ্ঠা।

অনুশীলন সমিতি

ঋষি বঙ্কিমচন্দ্রের 'অনুশীলন তত্ত্ব'-র আদর্শে ব্যারিস্টার প্রমথনাথ মিত্রের সভাপতিত্বে বাংলায় প্রথম বিপ্লবী সংঘ অনুশীলন সমিতির প্রতিষ্ঠা হয়। লাঠিখেলা ও শরীর চর্চার মধ্যে দিয়ে স্বদেশের জন্য উৎসর্গকৃত ক্ষাত্র শক্তি উন্মেষই এই সমিতি মূল উদ্দেশ্য ছিল।

যুগান্তর দল

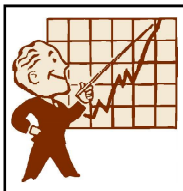
ঋষি অরবিন্দের ভাই বারীন্দ্রনাথ ঘোষ ও বিবেকা নন্দের ভাই ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত সহ অনেকে উদ্যোগে মুরারি পুকুর রোডের অরবিন্দ ঘোষের পৈত্রিক বাড়িতে ১৯০৭ খ্রিস্টাব্দে যুগান্তর দলের প্রধান কার্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়। যদিও এই সভার উন্মেষ 'যুগান্তর' পত্রিকার সশস্ত্র আন্দোলনে স্বাধীনতা আদায়ের স্বাধীন চিন্তা থেকেই।

এছাড়াও পরবর্তীতে বাংলার জাতীয়তাবাদী চিন্তা উন্মেষে আরও অনেক সভা ও সমিতি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছিল।

১১৫ মহাত্মা গান্ধীর আগমন

১৯১৫ খ্রিস্টাব্দে ছেচল্লিশ বৎসর বয়সে বিজয়ী বীর রূপে গান্ধীজি দক্ষিণ আফ্রিকা থেকে ভারতে ফিরে আসেন। ভারতেএ সেই সঙ্গে সঙ্গে তিনি রাজনৈতিক রঙ্গমঞ্চে অবতীর্ণ হননি তাঁর রাজনৈতিক গুরু গোপালকৃষ্ণ গোখলে-র পরামর্শে এই সময় ভারতের বিভিন্ন অঞ্চল ভ্রমণ করে তিনি ভারতীয় সমাজ, জনজীবন ও রাজনীতি সম্পর্কে প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা অর্জন করতে সচেষ্ট হন। ১৯১৫ খ্রিস্টাব্দে তিনি আহমেদাবাদে সবরমতী আশ্রম প্রতিষ্ঠিত করে তাঁর অনুগামী এবং বন্ধুদের সত্য, স্বাবলম্বন, গ্রাম উন্নয়ন ও অহিংসার বাস্তব প্রয়োগ সম্পর্কে শিক্ষাদান করতে শুরু করেন। তিনি যখন ভারতে ফিরে আসেন, তখন প্রথম বিশ্বযুদ্ধ চলছিল। ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের অংশ হিসাবে ভারতও যুদ্ধে জড়িয়ে পড়ে। ইংরেজের ন্যায় বিচার, সমুন্নত সভ্যতা ও সংস্কৃতির প্রতি গান্ধীজি তখন বিশেষ শ্রদ্ধাশীল ছিলেন এবং ইংল্যান্ডের সঙ্গে ভারতের যোগাযোগকে তিনি ভারতের পক্ষে মঙ্গলকর বলে মনে করতেন। এইকারণে যুদ্ধকালীন অবস্থায় তিনি কেবল বিনা শর্তে সরকারকে নানা ভাবে সাহায্য করতে থাকেন। তিনি মনে করতেন যে, যুদ্ধের সময় দায়িত্বশীল ব্রিটিশ সরকারকে সরকার গঠনের দাবি জানিয়ে তাদের ব্যতিব্যস্ত করা উচিত নয়। এই মূল্যবান কাজের জন্য সরকারে তাঁকে 'কাইজার-ই-হিন্দ' স্বর্ণপদক উপহার দেয়। সর্বভারতীয় রাজনীতিতে আবির্ভূত হওয়ার পূর্বে ১৯১৭-১৯১৮ খ্রিস্টাব্দে তিনি তিনটি আঞ্চলিক সংগ্রাম-এ অবতীর্ণ হন এবং এর ফলে তিনি ভারতব্যাপী খ্যাতি অর্জন করেন। নীলকর সাহেবদের অকথ্য অত্যাচারে বিহারের চম্পারণ জেলার নিঃসম্বল চাষিদের দুর্দশা চরমে উঠেছিল। ১৯ ১৭ খ্রিস্টাব্দে কোনোও সর্বভারতীয় নেতার সঙ্গে যোগাযোগ না করে ব্রজকিশোর প্রসাদ, রাজেন্দ্র প্রসাদ, মজহরুল হক, আচার্য কৃপালনি ও মহাদেব দেশাই-এর মতো কয়েকজন তরুণ জাতীয়তাবাদী উঠতি নেতাকে সঙ্গে নিয়ে গান্ধীজি চম্পারণে উপস্থিত হন এবং কৃষকদের দুর্দশা ও নীলকরদের অত্যাচার সম্পর্কে অনুসন্ধান করে সত্যাগ্রহে অংশ নেন। শেষ পর্যন্ত নীল চাষিদের অবস্থা সম্পর্কে অনুসন্ধানের জন্য সরকার একটি তদন্ত কমিটি নিয়োগ করে এবং এর ফলে 'চম্পারণ কৃষিবিল' পাস করে। এভাবে চম্পারণে শতবর্ষ ব্যাপী অত্যাচারের অবসান ঘটানো হয়। এভাবে তিনি গুজরাটের খেড়া জেলায় অনিয়ন্ত্রিত রাজস্ব আদায়ের বিরুদ্ধে সত্যাগ্রহ ও আমাদাবাদে শ্রমিকদের মুজুরি বৃদ্ধির দাবিতে ধর্মঘট পালন করেন। ধীরে ধীরে এভাবেই

গান্ধীজি জাতীয় আন্দোলনের প্রধান মুখ হয়ে যান। ১৯১৯ খ্রিস্টাব্দ ভারতের জাতীয় রাজনীতির একটি গুরুত্বপূর্ণ বছর কারণ এই বছর তিনি কংগ্রেস তথা ভারতের মুক্তি আন্দোলনের নেতৃত্ব গ্রহণ করেন এবং ক্রমান্বয়ে তিনি কংগ্রেসের প্রধান রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব হবার পাশাপাশি অসহযোগ আন্দোলন, আইন অমান্য আন্দোলন ও ভারত ছাড়ো আন্দোলনের মতো গুরুত্বপূর্ণ সব আন্দোলনে নেতৃত্ব দেন।



অগ্রগতি নির্ধারক প্রশ্ন

২. মহাত্মা গান্ধীর আগমন ও জাতীয় রাজনীতিতে তাঁর অংশ গ্রহণের বিষয়টি আলোকপাত করুন। (২০০ শব্দের মধ্যে)

১১.৬ বিভিন্ন জাতীয় আন্দোলন

ভারতের জাতীয় আন্দোলন প্রধানত দুটি ভিন্ন ধারায় গতি পায় এক (সশস্ত্র বিপ্লবী আন্দোলন, দুই অহিংস আন্দোলন।) সশস্ত্র বিপ্লবী আন্দোলন দানা বাধে ভারতের সে সকল বীর সন্তানদের কেন্দ্র করে যারা আপন জীবনের মূল্য স্বাধীনতা আদায় করে নিতে চেয়েছিলেন। মনে রাখার বিষয় ১৮৮৫ থেকে ১৯০৫ পর্যন্ত জাতীয় কংগ্রেসের নেতৃত্ব নরমপন্থীদের হাতে করায়ত্ত ছিল। নরমপন্থীদের 'রাজনৈতিক ভিক্ষা বৃত্তি'তে এক বিশেষ জাতীয় চিন্তা বিক্ষুব্ধ হয়ে ওঠে। এসময় যেমন মহারাষ্ট্রের বালগঙ্গাধর তিলক সোচ্চার হয়ে ওঠেন ঠিক তেমনি বাংলা থেকে অরবিন্দ ঘোষ 'ইন্দুপ্রকাশ' পত্রিকায় এই রাজনৈতিক দুর্বলতার তীব্র প্রতিবাদ জানান। মূলত ভারতীয় ভাবধারায় যে 'বীরভোগ্য বসুন্ধরা' এই চিন্তনে বিশ্বাসী এক দল বিপ্লবী আন্দোলনকেই স্বাধীনতা অর্জনের একমাত্র পথ বলে মনে করেন। বাংলায় এসময় গড়ে ওঠা অনুশীলন সমিতি বা যুগান্তর দলের মতো সংঘগুলো এই ভাবধারাকেই পুষ্টি দেয়। তাই অচিরেই ক্ষুদিরাম বসু, ভগৎ সিং, আজাদ, বিনয়-বাদল-দীনেশ, চিত্তরঞ্জন দাশ, মাস্টার দা সূর্য সেন, বাঘা যতীন এমন কি পরবর্তীতে সুভাষ বসুর মতো নেতারাও একই ধারায় ভারতীয় জাতীয় আন্দোলনকে সম্প্রসারিত করতে চান।

এর ঠিক উল্টো দিকে এক অহিংস জাতীয় আন্দোলন ও তৎকালীন ভারতে সংগঠিত হতে থাকে। এই সময় রাওলাট আইন বিরোধী আন্দোলন, জালিয়ানওয়ালাবাগে হত্যাকাণ্ডের প্রতিবাদী আন্দোলন, খিলাফৎ আন্দোলন, অসহযোগ আন্দোলন, আইন অমান্য আন্দোলন ও লবণ সত্যাগ্রহ এবং সর্বোপরি ভারতছাড়ো আন্দোলন ভারতীয় জাতীয় আন্দোলনে পরিধিকে বিস্তৃত করে।

১১.৭ বিভিন্ন ট্রেড ইউনিয়ন

১৮১৮ থেকে ১৯২০ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে সারা দেশে অসংখ্য ট্রেড ইউনিয়ান গড়ে ওঠে,

যাদের মূল উদ্দেশ্যই ছিল শ্রমিক স্বার্থ বজায় রেখে শ্রমিক আন্দোলনকে গতি দেওয়া। সাম্রাজ্যবাদী প্রাধান্যের বিরুদ্ধে শ্রমিক শ্রেণির স্বার্থ রক্ষার উদ্দেশ্যে ১৯২০ খ্রিস্টাব্দে 'নিখিল ভারত ট্রেড ইউনিয়ান কংগ্রেস' (A.I.T.U.C) প্রতিষ্ঠিত হয়, লালা লাজপত রায়ের সভাপতিত্বে বোম্বাইয়ে গড়ে ওঠা এই সংগঠনে ভারতের প্রায় পাঁচ লক্ষ শ্রমিকের সদস্য পদ অঙ্গীকার বদ্ধ ছিল।

ভারতীয় শ্রমিক আন্দোলনে বরাবরই কমিউনিস্ট পার্টির ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ ছিল। ভারতে কমিউনিস্ট পার্টি কার্যকর হবার পর ১৯২৬ খ্রিস্টাব্দে বাংলা, বোম্বাই, পাঞ্জাবে 'শ্রমিক ও কৃষক পার্টি' প্রতিষ্ঠিত করেতারা সক্রিয় ভাবে শ্রমিক ও কৃষক আন্দোলনে অবতীর্ণ হয়। এই দলের প্রধান সংগঠকদের মধ্যে ছিলেন মুজাফ্ফর আহমেদ, শ্রীপাদ অমৃতডাঙ্গে, পি.সি. যোশী প্রমূখেরা। ১৯২৮ খ্রিস্টাব্দে বোম্বাইয়ের বস্ত্র শিল্পের ছাঁটাই শ্রমিকদের নিয়ে প্রতিষ্ঠিত হয় গেরিলা সংগ্রামের চিন্তায় বিশ্বাসী শ্রমিক সংগঠন 'গিরনি কামগার ইউনিয়ন'। ডাঙে, মিরাজকর, জোগলেকর প্রমূখ কমিউনিস্ট নেতারা এই সংগঠনের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন।

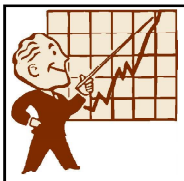
১৯২৯ খ্রিস্টাব্দে বাংলার লাডলো জুট মিলের শ্রমিক ছাটাইকে কেন্দ্র করে ড° প্রভাবতী দাশগুপ্তার নেতৃত্বে প্রতিষ্ঠিত হয় 'বেঙ্গল জুট ওয়ার্কার্স ইউনিয়ন।'

১৯২৯ খ্রিস্টাব্দে 'নিখিল ভারত ট্রেড ইউনিয়ান কংগ্রেস' সদস্যদের মতানৈক্য দেখা দিলে এন.এম. যোশী, দেওয়ান চমনলাল, ভি.ভি. গিরি প্রমূখদের নেতৃত্বে গড়ে ওঠে 'ইন্ডিয়ান ট্রেড ইউনিয়ন ফেডারেশন' নামে নতুন এক সংগঠন।

১৯৩১ খ্রিস্টাব্দে সশস্ত্র রাজনৈতিক ভূমিকার প্রশ্নে 'নিখিল ভারত ট্রেড ইউনিয়ান কংগ্রেস' পুনরায় দু-টুকরো হয়ে বামপন্থীদের নেতৃত্বে গড়ে ওঠে 'রেড ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেস।'

১৯৩৩ খ্রিস্টাব্দে বিভিন্ন রেল শ্রমিক সংগঠন মিলিত ভাবে গড়ে তোলেন 'ন্যাশনাল ফেডারেশন অফ লেবার।'

১৯৩৩ এই 'ইন্ডিয়ান ট্রেড ইউনিয়ন ফেডারেশন' ও সদ্যজাত 'ন্যাশনাল ফেডারেশন অফ লেবার' একত্রিত হয়ে 'ন্যাশনাল ট্রেড ইউনিয়ন ফেডারেশন' গঠন করে।



অগ্রগতি নির্ধারক প্রশ্ন

১। বাংলার বিভিন্ন ট্রেড ইউনিয়নের সংক্ষিপ্ত পরিচয় তুলে ধরুন। (২০০ শব্দের মধ্যে)

১১.৮ দেশভাগ ১৯৪৭ সালে ভারত ভাগ ভারতের ইতিহাসের সবচেয়ে. গুরুত্বপূর্ণ ঘটনাগুলির মধ্যে একটি। কতজন মারা গিয়েছিল বা তাদের ঘরবাড়ি হারিয়ে ছিল তার সঠিক হিসাব না থাকা সত্ত্বেও, অনুমান করা হয় যে সম্ভবত ২ কোটি মানুষ এই ভাগে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল। ১৯৪৭ সালে ভারত ভাগ ব্রিটিশ ভারতকে দুটি পৃথক দেশে বিভক্ত করে। এগুলি ছিল ভারত ইউনিয়ন এবং পাকিস্তানের অধিরাজ্য।

১১.৮.১ ভারত বিভাগের কারণ

১৯০৫ সালে লর্ড কার্জন বেঙ্গল প্রেসিডেন্সি ভেঙে মুসলিম-প্রধান পূর্ব বাংলা ও আসাম এবং হিন্দু-প্রধান বাংলায় বিভক্ত করেন। ধারণা করা হয়েছিল যে এই সিদ্ধান্ত জাতীয়তাবাদী রাজনীতিতে ব্যাপক প্রভাব ফেলবে। বাংলার হিন্দু শাসক শ্রেণী তীব্র প্রতিবাদ সংগঠিত করেছিল। রাজনৈতিক সহিংসতা এবং ব্রিটিশ পণ্য বর্জন ছিল প্রতিবাদের প্রধান রূপ এবং অস্থিরতা বৃদ্ধির জন্য বাংলা বাক্যাংশ বন্দেমাতরম, যার অর্থ 'মায়ের প্রতি শ্রদ্ধা', ব্যবহার করা হয়েছিল। এই দেশভাগের বিশেষ কিছু কারণ ছিল, সেগুলি হলো—

লখনউ চুক্তি (১৯১৪—১৯১৮)
মন্টাগু-চেমসফোর্ড সংস্কার (১৯১৯)
দ্বিজাতিতত্ত্ব প্রস্তাব (১৯২০)
মুসলিম স্বদেশে প্রাদেশিক নির্বাচন ও তার ফলাফল (১৯৩০- ১৯৩৮)
আগস্টাঅফার, ক্রিপস মিশন (১৯৪০— ১৯৪২)
ভারতছাড়ো প্রস্তাব (১৯৪২)
ভারতীয় প্রাদেশিক নির্বাচন (১৯৪৬)
ক্যাবিনেট মিশন (১৯৪৬)
প্রত্যক্ষ কর্মদিবস (১৯৪৬)

১১.৮.২ দেশভাগ পরিকল্পনা ও তার রূপায়ণ

ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী অ্যাটলি কর্তৃক নিযুক্ত লর্ড লুই মাউন্ট ব্যাটেন ১৯৪৮ সালের জুনের মধ্যে ভারতের স্বাধীনতার তত্ত্বাবধান করেন। তিনি প্রথমে একটি ঐক্যবদ্ধ ভারত চেয়েছিলেন কিন্তু অবশেষে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হন যে দেশভাগ অনিবার্য। মাউন্টব্যাটেন জিন্নাহকে স্বাধীনতার শপথ বাক্য পাঠ করান, যার ফলে পাকিস্তান গঠিত হয় এবং সেই সঙ্গে ভারতও স্বাধীন হয়।

১১.৮.৩ দেশ ভাগের ফলাফল

১৯৪৭ সালে ভারত বিভাগের পরিণতি বা প্রভাবগুলি নিম্নরূপ:

১. অভিবাসন এবং সহিংসতা

দেশ ভাগের পর, ভারত থেকে পাকিস্তানে ও পাকিস্থান থেকে ভারতে ব্যাপক ভাবে অভিবাসন শুরু হয়, এই প্রত্যাশায় যে ধর্মীয় সংখ্যালঘুরা তাদের নিজ রাজ্যেই থেকে যাবে।

২. অনুপ্রবেশ

সংখ্যালঘুদের উপর ধর্মীয় উস্কানিমূলক অত্যাচার নেমে এলে এই অনুপ্রবেশের মাত্র বাড়ে। ঐতিহাসিক তথ্য অনুসারে পাকিস্থান বিশেষত পূর্ব পাকিস্থান থেকে এই অনুপ্রবেশ বহুলাংশে বেশি।

৩. দেশ ভাগ দ্বারা প্রভাবিত এলাকা

বাংলা: পশ্চিমবঙ্গ এবং পূর্ব বাংলা বিভক্ত হওয়ার পর, বাংলা অবশেষে বাংলাদেশে পরিণত হয়। পূর্ব বাংলার হিন্দুদের উপর আক্রমণ করা হয়, যার ফলে একটি বিশাল শরণার্থী সংকট দেখা দেয়।

পাঞ্জাব : ভারত বিভাগের সময় পাঞ্জাব পাকিস্তান অধিরাজ্য এবং ভারত অধিরাজ্যে বিভক্ত হয়, হিন্দু ও শিখ পূর্ব পাঞ্জাব রাজ্য ভারতের অংশে এবং মুসলিম পশ্চিম পাঞ্জাব প্রদেশ পাকিস্তানের অংশে পরিণত হয়। ফলস্বরূপ লক্ষ লক্ষ মানুষ বাস্তুচ্যুত হয়।

জম্মু ও কাশ্মীর : ১৯৪৭ সালে জম্মু ও কাশ্মীর রাজ্যে দেশ ভাগের অভিসম্পাত নেমে আসে বর্ণহিন্দু পরিবারের উপর এই সংকট প্রবল আকার ধারণ কর।

এছাড়াও দিল্লী, গুজরাট, পার্বত্য চট্টগ্রামসহ নানা অঞ্চলে দেশ ভাগ সরাসরি প্রভাবিত করে।

১১.৯ অধ্যায় সংক্ষেপ

উনিশ শতকের শেষ ও বিশ শতকের সূচনায় তৎকালীন ভারতবর্ষে রাজনৈতিক ও বৌদ্ধিক চিন্তাধারায় বাঙালি ছিল অগ্রগণ্য। জাতীয় কংগ্রেসের নেতৃত্বও ছিল বাঙালির হাতে। এক কথায় বাঙালিই তখন সমগ্র ভারতে মুক্তি পথের দীশারি হয়ে উঠেছিল। বাঙালির এই প্রগতিশীল জাতীয় মনোভাবে ভারতের ব্রিটিশ সরকার আতঙ্কিত হয়। তাদের মতে, বাংলা ছিল 'অশান্তির উৎস'। রাজনৈতিক চেতনা সম্পন্ন বাঙালিকে দুর্বল করে সমগ্র ভারতে জাতীয়তাবাদী আন্দোলন ধ্বংস করার উদ্দেশ্যে বাংলাদেশকে দ্বিখণ্ডিত করার প্রস্তাব কার্যকরী করা হয়। এর বিরুদ্ধেই সর্বাগ্রে গর্জে ওঠা বাঙালিই পরবর্তীতে ভারতের জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের বিশেষ আশ্রয় হয়ে ওঠে।



১১.১০ অধ্যায়টি পাঠ করে আমরা কী শিখলাম

- আমরা ভারতীয় জাতীয়তাবাদ উদ্ভবের ইতিহাসটি প্রত্যক্ষভাবে জানতে পারলাম।
- ভারতে মহাত্মাগান্ধীর আগমন ও ক্রমান্বয়ে তাঁর জাতীয় নেতা হয়ে ওঠার চিত্রটি পরিষ্কার ভাবে বুঝতে পারা গেল।
- সর্বোপরি ভারতীয় জাতীয় আন্দোলনে বাঙালির বিশেষত বাংলার বিভিন্ন সভা সমিতি ও বিভিন্ন সংগঠন সম্পর্কে একটি স্বচ্ছ ধারণা গড়ে তোলা সম্ভব হলো।



১১.১১ অতিরিক্ত পঠন

গঙ্গোপাধ্যায়, সৌম্যেন্দ্র (১৩৬৭বঙ্গাব্দ); স্বদেশী আন্দোলন ও বাংলা সাহিত্য; কলকাতা : বসুধারা প্রকাশনী

চন্দ্র, বিপিন (১৯৬০); আধুনিক ভারত : ঔপনিবেশিকতাবাদ ও জাতীয়তাবাদ; কলকাতা : পাল পাবলিশার্স

দাশ গুপ্ত, শ্রীঅমরপ্রসাদ (১৯৬০); আধুনিক ভারত পরিচয়; কলকাতা : ইণ্ডিয়ান বুক কনসার্ন

মুখোপাধ্যায়, হরিসাধন ও মুখোপাধ্যায়, উমা (১৩৬৮ বঙ্গাব্দ); স্বদেশী আন্দোলন ও বাংলার নবযুগ; কলকাতা : সরস্বতী লাইব্রেরী

সরকার, সুমিত (১৯৬০); আধুনিক ভারত; কলকাতা : কে.পি. বাগচী অ্যান্ড কোম্পানী



১১.১২ অগ্রগতি নির্ধারক উত্তর-সংকেত

১। বাংলার জাতীয় আন্দোলনের বিষয়টিকে এক সময় শাসক প্রভু ব্রিটিশ ভালো চোখে দেখেনি। .....তবে মনে রাখতে হবে লর্ড কার্জন বঙ্গভঙ্গ পরিকল্পনার উদ্ভাবক ছিলেন না। এভাবে উত্তর নির্মাণ করতে হবে। (দ্রষ্টব্য১১.৩ অংশ)

২। ১৯১৫ খ্রিস্টাব্দে ছেচল্লিশ বৎসর বয়সে বিজয়ী বীর রূপে গান্ধীজি দক্ষিণ আফ্রিকা থেকে ভারতে ফিরে আসেন। ..... তিনি ভারতীয় সমাজ, জনজীবন ও রাজনীতি সম্পর্কে প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা অর্জন করতে সচেষ্ট হন। প্রভাবে উত্তরটি গড়ে তুলুন। (দ্রষ্টব্য১১.৫ অংশ)

৩। ১৮১৮ থেকে১৯২০ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে সারাদেশে অসংখ্য ট্রেড ইউনিয়ান গড়ে ওঠে .....সাম্রাজ্যবাদী প্রাধান্যের বিরুদ্ধে শ্রমিক শ্রেণির স্বার্থ রক্ষার উদ্দেশ্যে ১৯২০খ্রিস্টাব্দে 'নিখিল ভারত ট্রেডইউনিয়ান কংগ্রেস' (A.I.T.U.C) প্রতিষ্ঠিত হয়.....এভাবে উত্তরটি গড়ে তুলুন। (দ্রষ্টব্য১১.৭ অংশ)



১১. ১৩ আদর্শ প্রশ্নাবলি

১। বাংলায় যে বঙ্গভঙ্গ বিরোধী আন্দোলন গড়ে উঠে ছিল কারণসহ তার প্রভাব ব্যাখ্যা করুন।

২। ভারতের জাতীয় আন্দোলনে মহাত্মা গান্ধীর আগমন কতটা গুরুত্বপূর্ণ বুঝিয়ে বলুন।

৩। বাংলার সামাজিক স্বার্থ রক্ষা ও জাতীয়তাবাদ উন্মেষে যে সকল সভা সমিতি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিয়েছিল তাদের সংক্ষিপ্ত পরিচয় তুলে ধরুন।

৪। বাংলার শ্রমিক আন্দোলনে ট্রেডইউনিয়নের ভূমিকা কতখানি ট্রেডইউনিয়নের পরিচয় দিয়ে বিষয়টি পরিষ্কার করুন।

৫। দেশ ভাগের কারণ ব্যাখ্যা করে এর ভয়াবহ ফলাফলের বিষয়ে বিশদে আলোচনা করুন।

অধ্যায় ১২ : স্বাধীনতা উত্তর বঙ্গীয় সমাজ ও সংস্কৃতি-১

বিন্যাসক্রম

১২.১ জ্ঞাতব্য বিষয়
১২.২ পরিচিতি
১২.৩ স্বাধীন ভারতবর্ষে কংগ্রেসের স্বরূপ ও অবস্থান
১২.৪ যুক্তফ্রন্ট সরকার থেকে বাম ফ্রন্ট সরকারের উত্থান
১২.৫ বাংলা দেশের গণবিক্ষোভ
১২.৫.১ গণ অভ্যুত্থানের পটভূমি
১২.৫.২ গণ বিক্ষোভের পরিণতি
১২.৬ অনুপ্রবেশ ও উদ্বাস্তু সমস্যা
১২.৭ অধ্যায় সংক্ষেপ
১২.৮ অধ্যায়টি পাঠ করে আমরা কী শিখলাম
১২.৯ অতিরিক্ত পঠন
১২.১০ অগ্রগতি নির্ধারক উত্তর-সংকেত
১২.১১ আদর্শ প্রশ্নাবলি

১২.১ জ্ঞাতব্য বিষয়

এই অধ্যায় পাঠ করে শিক্ষার্থী-

- স্বাধীনতা উত্তর জাতীয় কংগ্রেসের অবস্থান সম্পর্কে জানতে পারবেন।
- ভাষাকে কেন্দ্র করে বাংলাদেশে যে গণ বিক্ষোভ সে সম্পর্কে জ্ঞান অর্জন করতে পারবেন।
- বাংলাদেশে পাকিস্থান শাসনের বর্বরতায় ভারত সহ পশ্চিমবঙ্গে যে অনুপ্রবেশ তা বুঝতে সক্ষম হবেন।
- পশ্চিম বঙ্গের যে উদ্বাস্তু সমস্যা ও তার ফলশ্রুতি সে সম্পর্কে ওয়াকিবহাল হবেন।

১২.২ পরিচিতি

কেবল মাত্র স্বাধীনতা অর্জন কখনোই একটি জাতির একমাত্র লক্ষ্য হতে পারে না। আর্থ-সামাজিক ক্ষেত্রে গণতন্ত্রের প্রতিষ্ঠাই প্রতিটি জাতির মূল লক্ষ্য এবং সেই লক্ষ্য উপনীত হওয়ার জন্য প্রয়োজন বহিঃশত্রুর নিয়ন্ত্রণমুক্ত পূর্ণ স্বাধীনতা। ভারতীয় গণ-পরিষদের লক্ষ্য ছিল স্বাধীন ভারতের সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক কাঠামোর রূপরেখা অঙ্কন করা। এই লক্ষ্য-নির্ধারণে সংবিধান রচয়িতা গণ গান্ধীজির চিন্তাধারা এবং পাশ্চাত্যের উদার

নৈতিক মতবাদ দ্বারা প্রভাবিত হয়ে ছিলেন। জওহরলাল নেহরু বলেন যে, গণ-পরিষদের প্রধান কাজ হবে একটি নতুন সংবিধান প্রণয়ের মাধ্যমে ভারতকে স্বাধীন করা, ক্ষুধার্ত মানুষের মুখে দু'মুঠো অন্ন, বস্ত্রহীনকে বস্ত্র এবং প্রতিটি ভারতবাসীকে তার যোগ্যতা অনুযায়ী আত্ম বিকাশের সর্বাধিক সুযোগ প্রদান করা। ড° রাজেন্দ্র প্রসাদ বলেন যে, দুঃখ-দারিদ্র্যদের অবসান ঘটানো, বৈষম্য ও শোষণের বিলোপ সাধন এবং সুন্দর জীবন যাত্রার উপযোগী পরিবেশ সৃষ্টি করাই হবে গণ-পরিষদের লক্ষ্য। ড° সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণান বলেন যে, একটি সামাজিক-অর্থনৈতিক বিপ্লব সাধনই গণ-পরিষদের মূল লক্ষ্য।

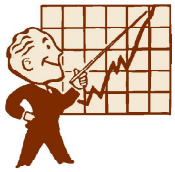
১২.৩ স্বাধীন ভারতবর্ষে কংগ্রেসের স্বরূপ ও অবস্থান

১৯৪৭ সালের আগস্টে ভারত স্বাধীনতা লাভের পর, সার্বজনীন প্রাপ্তবয়স্ক ভোটাধিকারের ভিত্তিতে সত্যিকারের প্রতিনিধিত্বশীল সরকার নির্বাচন করার জন্য সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠানের প্রয়োজন ছিল। এই সময় অর্থাৎ ১৯৪৭ সালে, কংগ্রেসের সভাপতিত্ব জীবরাম কৃপালানির কাছে চলে যায়, যিনি একজন প্রবীণ গান্ধীবাদী এবং নেহেরু এবং প্যাটেল উভয়ের সহযোগী ছিলেন। এসময় নেহেরু এবং তার সমাজতান্ত্রিক শাখার মধ্যে একটি টানাপোড়েন শুরু হয় এবং প্যাটেল এবং কংগ্রেস ঐতিহ্যবাদীদের মধ্যের ৯৫০-এ প্রতিযোগিতা শুরু হয়। নেহেরু পুরুষোত্তম দাস ট্যাণ্ডনের প্রার্থী পদের বিরোধিতা করার জন্য কংগ্রেসের অভ্যন্তরে নিজের প্রভাব বিস্তারে সচেষ্ট হন। নেহেরু খোলাখুলি ভাবে ট্যাণ্ডনের বিরোধিতা ও কৃপালানিকে সমর্থন করেছিলেন, কিন্তু এই একই প্রশ্নে তিনি প্যাটেলের প্রতিযোগ্য সৌজন্য বজায় রাখেননি।

প্যাটেলের নিরঙ্কুশ সমর্থনে বিশেষ করে 'প্যাটেলের নিজরাজ্য গুজরাটে, যেখানে প্যাটেলের কাজের কারণে, কৃপালানি একটি ভোট পাননি' ট্যাণ্ডন একটি বড় প্রতিদ্বন্দ্বিতায় জয়ী হন এবং নেহেরু পদত্যাগ করার হুমকি দেন। যদিও প্যাটেলের বোঝানোর পর নেহেরু পদত্যাগ করেননি। যাইহোক, ১৯৫০ সালে প্যাটেলের মৃত্যুর সাথে, কংগ্রেসের পূর্ণ ক্ষমতা স্থায়ী ভাবে নেহরুর পক্ষে চলে যায়। কৃপালানি, সি. রাজাগোপালাচারী এবং ট্যাণ্ডন প্রান্তিক হয়ে পড়েন এবং কংগ্রেস পাটির নির্বাচনী ভাগ্য শুধুমাত্র নেহরুর নেতৃত্ব এবং জনপ্রিয়তার উপর নির্ভর করে। ১৯৫২ সালের নির্বাচনে জয়লাভ করে, কংগ্রেস ভারতের প্রধান রাজনৈতিক দলে পরিণত হয়। এর পর ১৯৫২ থেকে ১৯৬৪ সালে তার মৃত্যুর আগ পর্যন্ত, জওহরলাল নেহেরু ছিলেন কংগ্রেস দলের প্রধান নেতা। কংগ্রেস ১৯৫১-৫২, ১৯৫৭, এবং ১৯৬২ সালের সাধারণ নির্বাচনে বিপুল জয়ে ক্ষমতা লাভ করে। কে. কামরাজ নেহরুর জীবনের শেষ বছরে ১৯৬৩ সালে সর্বভারতীয় কংগ্রেস কমিটির সভাপতি হন। তার আগে, তিনি নয় বছর মাদ্রাজ রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী ছিলেন। ১৯৬৩ সালে ১৯৬২ এর ভারত-চীনযুদ্ধে পরাজয়ের পর কংগ্রেস জনপ্রিয়তা হারায়। ১৯৬৪ সালে, নেহরু মৃত্যুবরণ করেন, যা দলের

ভবিষ্যত নিয়ে প্রশ্ন উত্থাপন করে। নেহেরুর মৃত্যুর পর, গুলজারিলাল নন্দাকে ২৭ মে ১৯৬৪-এ অন্তর্বর্তীকালীন প্রধানমন্ত্রী হিসেবে নিযুক্ত করা হয়। নেহরুর স্থলাভিষিক্ত হওয়ার প্রতিযোগিতায়, মোরারজি দেশাই এবং লালবাহাদুর শাস্ত্রীর মধ্যে অগ্রাধিকার ছিল, এ নিয়ে মতানৈক্য শুরু হয়। অবশেষে, শাস্ত্রীকে পরবর্তী সংসদীয় নেতা নির্বাচিত করা হয় এই ভাবে তিনি প্রধানমন্ত্রী হন।

১৯৬৫ সালের ভারত-পাকিস্তান যুদ্ধে জয় লাভের পর শাস্ত্রী একজন জাতীয় নায়ক হয়ে ওঠেন। শাস্ত্রীর মৃত্যুর পর, কংগ্রেস ইন্দিরা গান্ধীকে মোরারজি দেশাইয়ের পরে নেতা হিসাবে নির্বাচিত হয়। এ সময় পার্টির ভবিষ্যত নিয়ে কংগ্রেসের শীর্ষ নেতৃত্বের মধ্যে মত পার্থক্যের ফলে উড়িষ্যা জন কংগ্রেস, বাংলা কংগ্রেস, উৎকল কংগ্রেস এবং ভারতীয় ক্রান্তিদলের মতো বেশ কয়েকটি বিচ্ছিন্ন দল গঠন করা হয়েছিল। এই সময় অর্থাৎ ১৯৬৭ সালের পশ্চিম বাংলার বিধানসভা নির্বাচনে নিরবিচ্ছিন্ন ক্ষমতায় থাকা কংগ্রেস দলের পতন ঘটে।



অগ্রগতি নির্ধারক প্রশ্ন

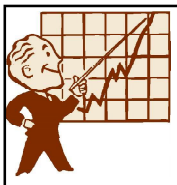
১. স্বাধীনতা অব্যবহিত পরবর্তীকালে কংগ্রেসের আভ্যন্তরীণ রদ বদলের ইতিহাসটি ব্যাখ্যা করুন। (১৫০ শব্দের মধ্যে)

১২.৪ যুক্ত ফ্রন্ট সরকার থেকে বাম ফ্রন্ট সরকারের উত্থান

সারা দেশের সাথে সাথে পশ্চিমবঙ্গে সি পি আই 'এম' পার্টিকার্যকর হবার পর সম চিন্তা ভাবনাকারী পার্টির সাথে নিয়ে পথচলা শুরু হয়। এর ফল শ্রুতিতে ১৯৬৭ সাল নাগাদ পশ্চিমবঙ্গে প্রথম যুক্ত ফ্রন্ট সরকার তৈরি হয়, পরে ১৯৬৯ সালে দ্বিতীয় যুক্তফ্রন্ট সরকার। দুই ক্ষেত্রেই সি পি আই 'এম' উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করেছিল, এই দুই সরকার গঠনের সময়েই বাংলা কংগ্রেসের অজয় মুখার্জিকে মুখ্যমন্ত্রী হিসাবে নির্বাচন করে জ্যোতি বসু উপমুখ্যমন্ত্রীর দায়িত্ব পালন করেছিলেন। জনগণের স্বার্থ রক্ষা করার ক্ষেত্রে গণ আন্দোলনের নিরবিচ্ছিন্ন ধারা এবং যুক্তফ্রন্টের অভিজ্ঞতা থেকে রাজ্যের মানুষ বুঝে নেন তাদের প্রকৃত নেতৃত্ব বামপন্থী রাজনৈতিক আন্দোলন। এসময় কিছুটা অপ্রত্যাশিত ভাবে রাজ্যে প্রথমে রাষ্ট্রপতি শাসনজারী হয়, এবং ১৯৭২ সালে নির্বাচনের নামে প্রহসন নির্মাণ করা হয়। এ সত্ত্বেও সেই নির্বাচনে বাম পন্থীদের প্রার্থীরা জয়লাভ করেছিলেন, যদিও এই নির্বাচনকে মান্যতা না দেওয়ার সিদ্ধান্ত হওয়ায় পরের পাঁচবছর বিভিন্ন আসনে জয়ী বামপন্থীদের মধ্যে অনেকেই বিধান সভার কাজে অংশগ্রহণ করেননি। এসময় ব্যাপক উদ্বাস্তু সমস্যা ও টাল মাটাল রাজনৈতিক পরিমণ্ডল, সর্বোপরি কংগ্রেসের প্রতি অবিশ্বাস জনমানসে নবগণতন্ত্রের জন্য আকুতি তৈরি হয়েছিল।

এর কয়েক বছর পরে ১৯৭৫ সালে ইন্দিরা গান্ধীর নির্দেশে দেশ জুড়ে জরুরী অবস্থা করা হয়। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, নজরুল ইসলাম, সুকান্ত ভট্টাচার্যের কবিতাকে ও সংবাদ পত্রে সেন্সর করা হত, যা কিছুতে জনগণ উদ্বুদ্ধ হতে পারেন, উৎসাহিত হতে পারেন সেই সব কিছুকে কলমের খোঁচায় বাতিল করার আগ্রাসী মনোভাব শুরু হয়। সভা সমিতির অধিকার কেড়ে নেওয়া হয়। ব্যাপক হারে গ্রেফতার করা হয়। এর ফলে গণতন্ত্র পুনরুদ্ধারের লড়াই শুরু হয়। রাজনীতি থেকে প্রায় সরে যাওয়া জয়প্রকাশ নারায়ণ আবার এক বার উঠে এলেন জনগণের মাঝে। এমন দম বন্ধ করা পরিবেশের বিরুদ্ধে সর্বস্তরে মানুষের মধ্যে লড়াইয়ের মেজাজ তৈরি হয়ে গিয়েছিল।

জরুরী অবস্থা প্রত্যাহার হওয়ার পরে লোকসভা নির্বাচন হয়। নির্বাচনে কংগ্রেসের ভরা ডুবি হয় এবং দেশের ক্ষমতায় বসে জনতাপার্টির সরকার। এই নির্বাচনের আগে কমিউনিস্ট পার্টির মধ্যে থেকে জ্যোতিবসু এবং প্রমোদ দাশগুপ্ত উদ্যোগ নেন অন্যান্য দলগুলির সাথে আলোচনা শুরু করার বিষয়ে। সেই সময়ে যৌথ লড়াইয়ের আহ্বানের ধারা বেয়েই গড়ে উঠল বামফ্রন্ট। লোকসভা নির্বাচনে জনতা পার্টির সাথে বামফ্রন্টের বোঝাপড়া সফল হয় এবং নির্বাচনে অভাবনীয় সাফল্য আসে। এর পরেই কেন্দ্রীয় সরকার সিদ্ধান্ত নেয় বিধানসভা নির্বাচন আয়োজন করার। সেই নির্বাচনে বামফ্রন্ট এবং জনতা পার্টির মধ্যে আসন সম্পর্কিত সমঝোতা পর পর তিনবার আলোচনা হওয়ার পরেও ব্যর্থ হলে প্রমোদ দাশগুপ্ত সাংবাদিক সম্মেলন করে জানিয়ে দেন আসন্ন বিধানসভা নির্বাচনে বামফ্রন্ট একাই প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবে। এর পরবর্তীতে নির্বাচনে বামফ্রন্ট অভূত পূর্ব সাফল্য লাভ করে এবং রাজ্যে প্রথম বারের জন্য প্রতিষ্ঠিত হল বামফ্রন্ট সরকার — রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী হলেন জ্যোতিবসু। রাইটার্স থেকে ঘোষণা করা হল এই সরকার কেবল মাত্র মহাকরণ থেকে সরকার পরিচালনার কাজ করবে না, ক্ষমতাকে কেন্দ্রিত করে মানুষের কাছে পৌঁছান হবে। পরে বহু যুগ ধরে চলা ইউনিয়ন বোর্ডের নামে স্বৈরতান্ত্রিক ব্যবস্থাকে নাকচ করে ত্রিস্তর পঞ্চায়েত গঠন করা হল। প্রান্তিক মানুষ জন ক্ষমতার কেন্দ্রে উঠে এলেন — তাদের নেতৃত্ব দিলেন বামপন্থীরা।



অগ্রগতি নির্ধারক প্রশ্ন

২. তৎকালীন বঙ্গে বামফ্রন্ট সরকারের ক্ষমতায়নের কাহিনি বর্ণনা করুন। (২০০ শব্দের মধ্যে)

১২.৫ বাংলাদেশের গণবিক্ষোভ

ঊনসত্তরের গণঅভ্যুত্থান বা গণআন্দোলন বাংলাদেশের ইতিহাসে একটি গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়। এই আন্দোলনের মধ্যদিয়ে পাকিস্তানের কথিত লৌহ মানব ফিল্ডমার্শাল আইয়ুব খানের স্বৈরাচারী শাসনের অবসান ঘটে। জনসাধারণের চেতনা বৃদ্ধির ফলে মিলিটারী,

পুলিশ ও আমলার প্রতিপত্তি ও মর্যাদা মুক্তি যুদ্ধকে বহুলাংশে হ্রাস পায়। আন্দোলনের তীব্রতার মুখে সরকার আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা প্রত্যাহার করে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের মুক্তিসহ অন্যান্য রাজনৈতিক নেতাদের মুক্তি দিতে বাধ্য হয়েছিল। উল্লেখ্য যে ১৯৫২ সালের মহান ভাষা আন্দোলনের মধ্য দিয়ে বাঙালি জাতীয়তাবাদের যে ক্রমবিকাশ শুরু হয়েছিল ১৯৬৯ সালে প্রচণ্ড গতিবেগ লাভ করে। ১৯৭১সালের মুক্তি যুদ্ধকে অবশ্যম্ভাবী করে তুলেছিল ১৯৬৯-এর গণঅভ্যুত্থান। গণতান্ত্রিক আন্দোলনের ইতিহাসের ১৯৬৯ র গণঅভ্যুত্থান হচ্ছে একটি বিরাট মাইল ফলক।

১২.৫.১ গণ অভ্যুত্থানের পটভূমি

১৯৬৮ সালের শেষভাগে আইয়ুব খানের স্বৈরাচারী শাসনের বিরুদ্ধে আন্দোলন তীব্ররূপ ধারণ করে। ৭ ডিসেম্বর মাওলানা আব্দুল হামিদ খান ভাসানীর আহবানে পুলিশী নির্যাতনের প্রতিবাদে প্রদেশব্যাপী এক অভূতপূর্ব হরতাল পালিত হয়। ১৪ ডিসেম্বর ভাসানী ন্যাপের পক্ষ থেকে ঘেরাও আন্দোলন কর্মসূচি ঘোষণা করা হয় এবং ২৯ ডিসেম্বর ঘেরাও আন্দোলনের সূচনা করা হয়। এভাবে একের পর এক কর্মসূচির সুবাদে আন্দোলন দানা বেঁধে ওঠে। সারা দেশের মানুষ যখন আন্দোলনমুখী তখন অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে ১৯৬৯ সালে ১৪ জানুয়ারি ডাক সুকার্যালয়ে ছাত্র সংগ্রাম কমিটি ১১দফা কর্মসূচি ঘোষণা করেন। আলোড়ন সৃষ্টিকারী ১১দফা কর্মসূচি আন্দোলনে নতুন গতিবেগের সঞ্চার করে। ছাত্র সংগ্রাম পরিষদের ১১দফা কর্মসূচি ঘোষিত হবার পরপরই ৮ জানুয়ারি সাতটি রাজনৈতিক দলের সমন্বয়ে 'ডাক' (Democratic Action Committee) কমিটি গঠন করা হয়। সকল আইন কানুন বাতিল,

শেখমুজিবের মুক্তিসহ সকল রাজ বন্দীদের মুক্তি দাবি সম্বলিত ৮দফা কর্মসূচি ঘোষণা করে এই কমিটি। ১৯৬৯ সালের ১৭ জানুয়ারি ঢাকা শহরে দু'টি পৃথক জনসভা অনুষ্ঠিত হয়। একটি বায়তুল মোকাররমে ডাক-এর আহবানে, অন্যটি বটতলায় ছাত্রদের আহবানে। সরকার ঢাকা শহরে ১৪৪ ধারা জারি করেন। বায়তুল মোকাররমে জনতা-পুলিশ সংঘর্ষ ঘটে। ছাত্র সমাজ ১৪৪ধারা উপেক্ষা করে রাস্তায় নেমে পড়লে ছাত্রদের সাথে পুলিশের সংঘর্ষ বাঁধে। বহু ছাত্রকে গ্রেফতার করা হয়। পরবর্তী দিনও বিশ্ববিদ্যালয় অঙ্গনে ছাত্র পুলিশ সংঘর্ষ হয়।

পুলিশী নির্যাতনের বিরুদ্ধে ২০জানুয়ারি বটতলায় ছাত্র সভার আয়োজন ও প্রতিবাদ মিছিলের কর্মসূচি নেওয়া হয়। সভার পর হাজার হাজার ছাত্রের মিছিল রাস্তায় নামলে শতশত পুলিশ আরই.পি.আর. বাহিনী তাদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে। ১১দফা আদায়ের মিছিলে পুলিশের গুলিতে ছাত্র নেতা নিপীড়নের বিরুদ্ধে আসা দুজ্জামান নিহত হন। তাদের মৃত্যুতে গণজাগরণের বিস্ফোরণ ঘটে। এতদিনের গণআন্দোলন বিক্ষোভে ফেটে গণঅভ্যুত্থানের স্তরে উন্নীত হয়। জনসাধারণ স্বতঃস্ফূর্তভাবে অনেক স্থানে আইয়ুবের নামফলক নামিয়ে ফেলে। এভাবে আইয়ুব গেট হয়ে যায় 'আসাদগেট'।

ছাত্রনেতা আসাদের মৃত্যুর প্রতিবাদে ছাত্র সংগ্রামপরিষদ দেশ ব্যাপী সাধারণ হরতাল

ও শোকদিবস পালনের কর্মসূচি গ্রহণ করে। ২৪ জানুয়ারি ঢাকা শহরে সর্বাত্বক হরতাল পালন করা হয়। ওই দিন হরতাল মোকাবিলার জন্যে নামানো হয় সেনাবাহিনী। বিক্ষুব্ধ জনতার উপর পুলিশের গুলিতে নবকুমার স্কুলের ছাত্র মতিয়ুর রহমান নিহত হওয়ার ফলে সেদিনের প্রতিবাদ বিদ্রোহ এবং জনতার রোষের আগুনে পুড়ে ছাই হয়েছিল দৈনিক পাকিস্তান ও মনিং নিউজ পত্রিকার অফিস। বিপ্লবী জনতা আইন অমান্য আন্দোলন শুরু করে। ১৫ ফেব্রুয়ারি আগরতলা মামলার আসামী সার্জেন্ট জহুরুল হককে বন্দী অবস্থায় ঢাকা ক্যান্টনমেন্টে হত্যা করা হয়। ফলে পরিস্থিতির আরও অবনতি ঘটে। ১৮ ফেব্রুয়ারি রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়য়ের শিক্ষক ড. শামসুজ্জোহাকে নৃশংসভাবে হত্যাকরে সৈনিকরা। ড. জোহার মৃত্যু ১৯৬৯-এর গণঅভ্যুত্থানকে চরম পর্যায়ে উন্নীত করে। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনার জন্যে সেনাবাহিনীকে তলব করা হয় এবং সান্ধ্য আইন জারী করা হয়। সেদিন সান্ধ্যআইন উপেক্ষা করে হাজার হাজার মানুষ রাজপথে নেমে আসায় ঢাকার রাজপথে রক্তের স্রোত বয়ে গিয়েছিল।

গণঅভ্যুত্থানের ফলে ২০ ফেব্রুয়ারি পূর্ব বাংলা থেকে সান্ধ্য আইন তুলে নেওয়া হয়। ২২ ফেব্রুয়ারি আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা প্রত্যাহার করে শেখমুজিবসহ সকল রাজবন্দীদের মুক্তি দেওয়া হয়। বাঙালি জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের মুখে আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা ছিন্নভিন্ন হয়ে গেল এবং শেখমুজিব একটি জনপ্রিয় নামে পরিণত হলেন। ২৩ ফেব্রুয়ারির মনারেস কোর্স ময়দানে, ছাত্র সংগ্রাম পরিষদের পক্ষথেকে শেখমুজিবকে 'বঙ্গবন্ধু' উপাধিতে ভূষিত করা হয়।

১২.৫.২ গণবিক্ষোভের পরিণতি

বাংলাদেশের গণবিক্ষোভে ১৯৭০ সালের নির্বাচন গুরুত্বপূর্ণ। এই নির্বাচনে শেখমুজিবের নেতৃত্বাধীন আওয়ামী লীগ সংখ্যাগরিষ্ঠিতা পেলে ভুট্টর সঙ্গে বিরোধ প্রকট হয়। ১৯৭১ সালের ৭ই মার্চ শেখমুজিবের বিখ্যাত ভাষণ বাংলাদেশের গণঅভ্যুত্থানকে ত্বরান্বিত করে। ফলত ১৯৭১ সালের ২৫ মার্চ নিরাপরাধ বাঙালিদের উপর পাক্-বাহিনী আকস্মিক হামলা ও নির্বিচার হত্যা কাণ্ড চালায়। এর ই ফলশ্রুতিতে পাকিস্থান বাহিনীর হাতে পাকরাও হবার পূর্বে ২৬ শে মার্চ শেখ মুজিবর বাংলাদেশকে স্বাধীন বলে ঘোষণা করেন। এর পর ভারতে সরাসরি অংশ গ্রহণে সুদীর্ঘ নয় মাস ব্যাপী রক্তক্ষয়ী সংগ্রামের পর ১৯৭১ সালের ১৬ ডিসেম্বর বাংলাদেশ একটি স্বাধীন রাষ্ট্র হিসাবে আত্মপ্রকাশ করে।

একটি গণঅভ্যুত্থান যেমন একটি দেশের ভাগ্য বদলে দিল তেমনি সেই বিক্ষোভের আঁচ ভারতে বিশেষ ভাবে অনুভূত হল। তৎকালীন পূর্ব-পাকিস্থানের এই ভয়া বয় পরিণতিতে ভারতে অনুপ্রেবেশকারীদের ঢল নামে। বিশেষত বাংলাদেশের ধর্মীয় সংখ্যালঘু সম্প্রদায় নিজেদের সর্বস্ব হারিয়ে কেবল আত্মাও সম্ভ্রম রক্ষার তাগিদে ভারতে পাড়ি জমায়। তাই বাংলাদেশের এই গণবিক্ষোভে উল্টো দিকে যে ভয়ঙ্কর পরিণতি তার শরিক ভারত তথা পশ্চিম বাংলা নিজে।

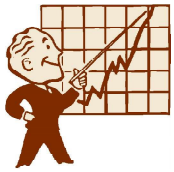
১২.৬ অনুপ্রবেশ ও উদ্বাস্তু সমস্যা

বাংলাদেশকে কেন্দ্র করে পশ্চিমবঙ্গের এই অনুপ্রবেশ ও উদ্বাস্তু সমস্যা নতুন কিছু নয়, মূলত ১৯৪৭ সালের স্বাধীনতা অর্জনের পর থেকে এই অনুপ্রবেশ ও উদ্বাস্তু সমস্যায় পশ্চিম বাংলা বারংবার জরাজীর্ণ হয়েছে। দেশ ভাগের অনুপ্রবেশ সমস্যাকে সামাল দিতে দিতে ১৯৫০ সালের গোড়ার দিক থেকেই খবর এসেছিল যে, পূর্ববাংলার অন্তর্গত বাগের হাট অঞ্চলে মুসলমানদের হাতে সংখ্যালঘু হিন্দুরা অত্যাচারিত হচ্ছে এবং হিন্দু সম্প্রদায়ের মানুষেরা খুনও হয়েছে। আর এই অত্যাচারের ঘটনার চরমরূপ শুরু হল ফেব্রুয়ারির প্রথম সপ্তাহ থেকেই। বিশেষ করে খুলনা, ফরিদপুর, যশোর জেলার নম শূদ্র মানুষের উপর অত্যাচারের ফলে সেই অঞ্চলের অসংখ্য নারী, পুরুষ ও শিশুদের একটি বিশাল অংশের বনগাঁ সীমান্ত দিয়ে পশ্চিম বাংলায় চলে আসছিল। প্রথম দিকে পাকিস্থানের শাসক এই ঘটনা অস্বীকার করলেও পশ্চিমবঙ্গের তৎকালীন মুখ্যমন্ত্রী বিধানচন্দ্র রায়ের এই বিষয়ে কঠোর মনোভাবাপন্ন প্রতিক্রিয়ার ফলে পূর্ব পাকিস্থানের মুখ্যমন্ত্রী এই ঘটনার কথা স্বীকার করেন। এই প্রকার একটি পরিস্থিতিতে পূর্ববঙ্গে হিন্দুসংখ্যালঘুদের ওপর এই বীভৎস অত্যাচারের ঘটনা দ্রুত চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ল। এই পরিস্থিতিতে সবচাইতে ভয়াবহ দাঙ্গা সংগঠিত হয়েছিল বরি শালে। এই প্রসঙ্গে একটি ঘটনা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য, একদিন সন্ধেবেলা বিধানচন্দ্র রায়ের কাছে খবর এল যে, খুলনা থেকে বরিশাল যাবার একটি ট্রেনের কয়েকটি কামরায় শুধুমাত্র রক্তের দাগ, ছেড়া শাড়ির অংশ ভাঙা শাঁখ ও চুড়ি বিচ্ছন্ন ভাবে ছড়ানো। আর এই ঘটনা থেকেই বিধানচন্দ্র রায় বুঝে গিয়েছিলেন ওপার বাংলার মানুষ কি বীভৎস অবস্থার মধ্যদিয়ে সেখানে অবস্থান করছে। এমতাবস্থায় বিধানচন্দ্র রায় কেন্দ্রের মুখাপেক্ষী হয়ে না থেকে, পূর্ববঙ্গের সংখ্যালঘু হিন্দুদের উদ্ধারে নিজেই উদ্যোগী হলেন।

দেখতে দেখতে পূর্ববাংলা থেকে আগত সংখ্যালঘু মানুষের সংখ্যা ব্যাপক হারে বাড়তে লাগল। এই সমস্ত মানুষগুলির দেশ ত্যাগ এতটাই জরুরী হয়ে উঠল যে, তাঁরা যে পথটি সামনে পাচ্ছিল তাকে ধরেই অগ্রসর হচ্ছিল। রেল পথছিলই, যারা সীমান্তের কাছাকাছি অঞ্চলে বসবাস করত তারা পায়ে হেঁটে চলে আসছিল। আসলে এই বিশাল সংখ্যক মানুষের কাছে পশ্চিমবঙ্গে আসার তিনটি পথই (জল, স্থল, আকাশ) এমন অবস্থার মধ্যে পাওয়া সহজ ছিলনা। পূর্ব-বাংলার এমন অনেক অঞ্চল ছিল, যেখানে যাতায়াতেব কোনো ব্যবস্থাই ছিল না। এ ক্ষেত্রে পূর্ববঙ্গের বা খেরগড় ও ফরিদপুর জেলার দক্ষিণাংশের কথা উল্লেখ করা যেতে পারে।

এর পর ঊনসত্তুরের গণঅভ্যুত্থানের সময় পুনরায় ভারত তথা পশ্চিমবঙ্গ উদ্বাস্তু সমস্যার সন্মুখীন হয়। এর ফলে বারংবার পশ্চিমবঙ্গের অর্থনীতি বিপন্ন হয়ে ওঠে সেই সঙ্গে ৪৬-৪৭, ৫০ ও ৭১-এর উদ্বাস্তু সমস্যার ফলে কলকাতা সহ বিভিন্ন শহরে জবর দখল কলোনী স্থাপিত হয়, বস্তি এলাকা শোচনীয় ভাবে নিম্নগামী হয়। আত্মীয়তার পরিচয়ে গ্রামে

গ্রামে অবাধে বাংলাদেশের নাগরিকের নতুন বসতি স্থাপিত হয়। এর ফলে যেমন কর্মসংস্থানে টান পড়ে ঠিক তেমনি নাগরিক যাপন মান তলানীতে ঠেকে। পরবর্তীতে পশ্চিমবঙ্গ সরকার উদ্বাস্তু পুনর্বাসন আইন বলবৎ করলেও এই সমস্যা বহু সুদূরপ্রসারী দাগ রেখে যায় বঙ্গীয় সামাজিক জীবনে। এখানে উল্লেখযোগ্য উদ্বাস্তু সমস্যার দায়ে যে বাঙালি তাকে বল পশ্চিমবঙ্গেই সীমাবদ্ধ নয় এছাড়া ও আসাম ও ত্রিপুরায় এই উদ্বাস্তু কেন্দ্রিক সমস্যা এবং সেইসঙ্গে উদ্বাস্তুদের পরিচয়গত সম্মান হরণের এই কাহিনি চিরন্তন।



অগ্রগতি নির্ধারক প্রশ্ন

৩. উদ্বাস্তু সমস্যা কাকে বলে? ১৯৫০ সালের ভারতবর্ষ এই সমস্যা সন্মুখীন হবার কারণ ব্যাখ্যা করুন। (২০০ শব্দের মধ্যে)

১২.৭ অধ্যায় সংক্ষেপ

দেশ ভাগ নিয়ে একাধিক গবেষণা, কর্ম, সাহিত্য, সিনেমা তৈরী হয়েছে, যা দেশভাগের স্মৃতিকে উস্কে দেয়। পাঞ্জাব ভাগ নিয়ে ভীষ্ম সাহানি, সাদাত হাসান মান্টো, খুশওয়ান্তসিং প্রমুখ সাহিত্যিকদের কলমে একাধিক রচনা পাওয়া যায়। তেমনি দেশ তথা বাংলা ভাগের কথা, বাংলার উদ্বাস্তু সমস্যার কথাও রাজু সরকারের ভূমিকা নিয়ে বাংলাসাহিত্য বিভিন্ন রচনায় উঠে এসেছে, অতীন বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'নীলকণ্ঠ পাখির খোঁজে', হাসান আজিজুলহকের 'আগুন পাখি', কপিল কৃষ্ণ ঠাকুরের 'উজানতলীর উপকথা', প্রফুল্ল রায়ের 'কেয়া পাতার নৌকা' প্রভৃতি গ্রন্থে। দেশভাগের কথা উঠে এসেছে গবেষণামূলক গ্রন্থ চন্দনকুমার কুণ্ডু লিখিত 'ছেচল্লিশের দাঙ্গাও দেশভাগ বাংলা উপন্যাসের দর্পণে', এছাড়াও ঋত্বিক ঘটকের চলচ্চিত্র সুবর্ণরেখা, মেঘেঢাকা তারা, উৎপল দত্তের নাটক তিতাস একটি নদীর নাম প্রমুখতে উদ্বাস্তু জীবনের যন্ত্রণাকে তুলে ধরা হয়েছে। পশ্চিমবঙ্গে উদ্বাস্তু সমস্যার সমাধান হয়েছে একথা কেউ বলতে পারবে না। আজও উদ্বাস্তুরা তাদের দাবিদাওয়া ও না পাওয়ার ব্যাথাও দেশভাগের বেদনাময় স্মৃতি বহন করে চলেছে। উদ্বাস্তুরা বেঁচে আছে বস্তুত এক দ্বিতীয় জীবনের সত্তা নিয়ে, অতীতের স্মৃতির সাথে প্রতিমুহূর্তে সংগ্রাম করে। পশ্চিমবঙ্গে ও তাদের লড়াই থেমে থাকেনি। মাথা গোঁজার ঠাঁই, অন্নের সংস্থান করতে গিয়ে তাদের অনেক মূল্য চোকাতে হয়েছে। তাছাড়া একটি মনস্তাত্ত্বিক দিকও রয়েছে যেখানে একদিকে রয়েছে দেশ এর মাটির হারাবার দুঃখ ও অন্যদিকে রয়েছে পশ্চিমবঙ্গের স্থায়ী বাসিন্দাদের উদাসীন মানসিকতার প্রকাশ। তবে এইসব নিয়েই উদ্বাস্তুরা নিজেদের জীবন যুদ্ধে এগিয়ে চলেছে। তবে মনে রাখতে হবে বামপন্থী রাজনীতি সংগ্রামী মানসিকতার প্রসারে উদ্বাস্তুদের উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রয়েছে।



১২.৮ অধ্যায়টি পাঠ করে আমরা কী শিখলাম

- স্বাধীনতা উত্তর জাতীয় কংগ্রেসের আভ্যন্তরীণ গঠন বিশেষ জানা সম্ভব হলো।
- বাংলাদেশের গণঅভ্যুত্থানের কারণ ও ফলাফল বিষয়ে জানতে পারা গেল।
- স্বাধীনতা উত্তর ভারতবর্ষের অন্যতম গভীর সমস্যা অনুপ্রবেশ ও উদ্বাস্তু সমস্যার চেহারা, পশ্চিমবঙ্গে এই সমস্যার সরাসরি ফলাফল সম্পর্কে সচেতন হওয়া সম্ভব হল।



১২.৯ অতিরিক্ত পঠন

গঙ্গোপাধ্যায়, সৌম্যেন্দ্র (১৩৬৭বঙ্গাব্দ); স্বদেশী আন্দোলন ও বাংলাসাহিত্য; কলকাতা : বসুধারা প্রকাশনী

চন্দ্র, বিপিন (১৯৬০); আধুনিক ভারত : ঔপনিবেশিকতাবাদ ও জাতীয়তাবাদ; কলকাতা : পাল পাবলিশার্স

দাশগুপ্ত, শ্রীঅমরপ্রসাদ (১৯৬০); আধুনিক ভারত পরিচয়; কলকাতা : ইণ্ডিয়ান বুক কনসার্ন

বন্দ্যোপাধ্যায়, হিরন্ময় (১৯৭০); উদ্বাস্তু; কলকাতা : শিশু সাহিত্য সংসদ প্রাইভেট লিমিটেড

মুখোপাধ্যায়, হরি সাধন ও মুখোপাধ্যায়, উমা (১৩৬৮বঙ্গাব্দ); স্বদেশী আন্দোলন ও বাংলার নবযুগ; কলকাতা : সরস্বতী লাইব্রেরী

সরকার, সুমিত (১৯৬০); আধুনিক ভারত; কলকাতা : কেপি বাগচী অ্যান্ড কোম্পানী

সেন, মনিকুন্তলা (১৯৮২); সেদিনের কথা; কলকাতা : নবপত্র প্রকাশন



১২.১০ অগ্রগতি নির্ধারক উত্তর-সংকেত

১। ১৯৪৭ সালের আগস্টে ভারত স্বাধীনতা লাভের পর..... এসময় নেহেরু এবং তার সমাজতান্ত্রিক শাখার মধ্যে একটি টানাপোড়েন শুরু হয়..... এভাবে উত্তরটি গঠন করতে হবে। (দ্রষ্টব্য১২.৩ অংশ)

২। সারাদেশের সাথে সাথে পশ্চিমবঙ্গে সিপিআই (এম) পার্টি কার্যকর হবার পর সম চিন্তা ভাবনা কারী পার্টির সাথে নিয়ে পথচলা শুরু হয়..... জ্যোতিবসু উপ-মুখ্যমন্ত্রীর দায়িত্ব পালন করেছিলেন ..... এভাবে উত্তরটি গড়ে তুলুন। (দ্রষ্টব্য ১২.৪ অংশ)

৩। বাংলাদেশকে কেন্দ্র করে পশ্চিমবঙ্গের এই অনুপ্রবেশ ও উদ্বাস্তু সমস্যা নতুন কিছু নয়..... দেশভাগের অনুপ্রবেশ সমস্যাকে সামাল দিতে দিতে..... উত্তরটি এভাবে নির্মাণ করুন। (দ্রষ্টব্য ১২.৬ অংশ)



১২.১১ আদর্শ প্রশ্নাবলি

১। জাতীয় আন্দোলনে অংশগ্রহণকারী জাতীয় কংগ্রেসের স্বাধীনা উত্তর অবস্থা ব্যাখ্যা করুন।

২। বাংলাদেশের গণঅভ্যুত্থান কী ও কেন বুঝিয়ে বলুন।

৩। বাংলাদেশের গণঅভ্যুত্থানের ফলাফল নিজের ভাষায় বর্ণনা করুন।

৪। বাংলার আর্থ-সামাজিক প্রেক্ষাপটে বাংলাদেশের গণঅভ্যুত্থানের ভূমিকা কী আলোচনা করুন।

৫। পশ্চিমবঙ্গে সংগঠিত উদ্বাস্তু সমস্যা ও তার ফলাফল বিষয়ে নাতিদীর্ঘ আলোচনা প্রস্তুত করুন।

৬। বাংলায় যুক্তফ্রন্ট সরকারের পথ বেয়ে বামফ্রন্ট সরকারের উত্থানের ইতিহাসটি লিপিবদ্ধ করুন।

অধ্যায় ১৩ : স্বাধীনতা উত্তর বঙ্গীয় সমাজ সংস্কৃতি-২

বিন্যাস ক্রম

১৩.১.০ জ্ঞাতব্য বিষয়
১৩.২.০ পরিচিতি
১৩.৩.০ ভাষা আন্দোলন
১৩.৩.১ বাংলাদেশের ভাষা আন্দোলন
১৩.৩.২ বরাক উপত্যকার ভাষা আন্দোলন
১৩.৪ নক্‌শাল আন্দোলন
১৩.৫ হাংরি আন্দোলন
১৩.৬ অধ্যায় সংক্ষেপ
১৩.৭ অধ্যায়টি পাঠ করে আমরা কী শিখলাম
১৩.৮ অতিরিক্ত পঠন
১৩.৯ অগ্রগতি নির্ধারক উত্তর-সংকেত
১৩.১০ আদর্শ প্রশ্নাবলি

১৩.১ জ্ঞাতব্য বিষয়

শিক্ষার্থী এই অধ্যায় পাঠ করে—

১। এই অধ্যায়ে স্বাধীনতা পরবর্তী বাংলার সমাজ সংস্কৃতিতে যে তিনটি আন্দোলন বিরাট ভূমিকা ফেলেছিল সে বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে। আন্দোলন কী, আন্দোলনের রূপরেখা কী করে প্রস্তুত হয়, সমাজ ও সংস্কৃতিতে আন্দোলনের প্রভাব কতটা তা বিস্তারিত ভাবে জানতে পারবেন।

২। শিক্ষার্থীরা এই অধ্যায় থেকে ভাষা আন্দোলন সম্পর্কে অভিহিত হবেন।

৩। নক্‌শাল আন্দোলন এবং হাংরি আন্দোলন সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে পারবেন।

১৩.২ পরিচিতি

মানুষ হলো সব থেকে উন্নত জীব, এমনটাই মনে করা হয়। এর পেছনে রয়েছে মানুষের যুক্তিবাদী জটিল মস্তিষ্ক। যার সাহায্যে মানুষ সেই আদিতম সময় থেকে এই কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার যুগে এসে পৌঁছেছে। এই চলার পথে মানুষকে অনেক প্রতিকূলতা, অনেক লড়াই, অনেক উত্থান পতনের মধ্যে দিয়ে এগোতে হয়েছে। তার চলার পথে এক গুরুত্বপূর্ণ বিষয় আন্দোলন।

আন্দোলন বলতে সমাজের একটি সংগঠিত প্রচেষ্টাকে বোঝানো হয়, যেখানে নির্দিষ্ট

সামাজিক, রাজনৈতিক বা সাংস্কৃতিক লক্ষ্য অর্জনের জন্য মানুষ একত্রিত হয়। সামাজিক আন্দোলনগুলো সাধারণত তাদের লক্ষ্যের ভিত্তিতে বিভিন্ন শ্রেণিতে বিভক্ত হয়, যেমন— সংস্কারমূলক আন্দোলন (Reform Movements): নির্দিষ্ট আইন বা সামাজিক নিয়ম পরিবর্তনের চেষ্টা করে। উদারপন্থী বা মৌলিক পরিবর্তনের আন্দোলন (Radical Movements): প্রচলিত মূল্যবোধ ও কাঠামোর আমূল পরিবর্তন চায়। উদ্ভাবনী আন্দোলন (Innovation Movements): নতুন সামাজিক নিয়ম বা মূল্যবোধ প্রবর্তন করতে চায়। রক্ষণশীল আন্দোলন (Conservative Movements) : বিদ্যমান সামাজিক নিয়ম ও মূল্যবোধ রক্ষার চেষ্টা করে। আমাদের আলোচ্য তিন প্রকার আন্দোলন— ক. ভাষা আন্দোলন খ. নকশাল আন্দোলন গ. হাংরি আন্দোলন

১৩.৩ ভাষা আন্দোলন

ভাষা আন্দোলন সম্পর্কে জানতে গেলে আমাদের প্রথমেই জানতে হবে ভাষা কী। ভাষা হলো এমন একটি মাধ্যমে যার সাহায্যে মানুষ একে অপরের সাথে যোগাযোগ করে, মনের ভাব প্রকাশ করে, আদান-প্রদান করে। পৃথিবীর প্রতিটি প্রান্তের মানুষ তাঁদের নিজস্ব ভাষায় কথা বলে থাকেন। ভাষা কী শুধুই ভাব প্রকাশ বা যোগাযোগ বা কোনো বিষয় আদান প্রদানের মাধ্যম? তা নয়; ভাষা একটি জাতির, একটি বৃহত্তর গোষ্ঠীর ইতিহাস, সংস্কৃতিকে বহন করে। তাই ভাষার গুরুত্ব অনেক।

আমাদের মাতৃভাষা বাংলা। এই ভাষা নিয়ে অক্ষয়চন্দ্র সরকার বলেছেন, "আমাদের বাঙ্গালা ভাষাতে বাজি খেলানো যায়, তুবড়ি ফোটান যায়, ফুল ফোটান যায়, ফোয়ারা ছোটা ন যায়... আমাদের মাতৃভাষা সর্বাঙ্গে রঙ্গময়ী।" এই বাংলা ভাষার জন্যই আজ সারা বিশ্বে পালিত হয়, 'আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস'।

১৩.৩.১ : বাংলাদেশের ভাষা আন্দোলন

বাংলাদেশের ভাষা আন্দোলন ছিল ১৯৪০-এর শেষ ও ১৯৫০-এর শুরুর দশকে একটি গুরুত্বপূর্ণ রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক সংগ্রাম। এটি পাকিস্তান সরকারের সেই সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে একটি প্রতিবাদ ছিল, যেখানে উর্দুকে পাকিস্তানের একমাত্র রাষ্ট্রভাষা করার চেষ্টা করা হয়েছিল, যদিও বাংলাভাষী জনগোষ্ঠী সংখ্যাগরিষ্ঠ ছিল। ১৯৫২ সালের ২১শে ফেব্রুয়ারি ঢাকায় কয়েকজন ছাত্র ও কর্মী শহীদ হন, যা ভাষা আন্দোলনের চূড়ান্তরূপ নেয়। এই দিনটি এখন আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস হিসেবে পালিত হয়, যা বিশ্বব্যাপী ভাষাগত অধিকারের জন্য দেওয়া আত্মত্যাগকে সম্মান জানায়।

১৯৪৭ সালে ভারত বিভক্ত হওয়ার পর পাকিস্তান দুটি ভৌগোলিক ভাবে বিচ্ছিন্ন অংশ নিয়ে গঠিত হয়েছিল: পূর্ব পাকিস্তান (বর্তমান বাংলাদেশ) এবং পশ্চিম পাকিস্তান (বর্তমান পাকিস্তান)। যদিও পাকিস্তানের বেশিরভাগ জনগণ পূর্ব পাকিস্তানে বাস করত এবং বাংলায়

কথা বলত, পশ্চিম পাকিস্তানের শাসকগোষ্ঠী উর্দুকে এক মাত্র রাষ্ট্রভাষা করতে চেয়েছিল। এতে পূর্ব পাকিস্তানে ব্যাপক প্রতিবাদ ছড়িয়ে পড়ে, বিশেষ করে ঢাকায়। পূর্ব পাকিস্তানের জনগণ দাবি জানায় যে সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষের মাতৃভাষা বাংলা রাষ্ট্রভাষা হিসেবে স্বীকৃতি পাক। আন্দোলন ক্রমেই তীব্র হয়ে ওঠে, যেখানে ছাত্র, বুদ্ধিজীবী এবং সাধারণ মানুষ সরকার বিরোধী আন্দোলনে অংশ নেয়। আন্দোলন ব্যাপক ভাবে ছড়িয়ে পড়ে ১৯৫২ সালের ২১ শে ফেব্রুয়ারি। এদিন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্ররা এবং অন্যান্য আন্দোলনকারী সরকার কর্তৃক উর্দু চাপিয়ে দেওয়ার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ ও মিছিলের আয়োজন করে। সরকার ১৪৪ ধারা জারি করে জনসমাবেশ নিষিদ্ধ করে ছিল, কিন্তু আন্দোলনকারীরা এই নিষেধাজ্ঞা অমান্য করে। পুলিশের গুলিতে কয়েকজন ছাত্র শহীদ হন, তাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য: সালাম, রফিক, বরকত, জব্বার, শফিউর প্রমুখ। তাঁদের আত্মত্যাগ ২১ শে ফেব্রুয়ারিকে প্রতিরোধ ও ঐক্যের প্রতীকে পরিণত করে, যা আন্দোলনকে আরও শক্তিশালী করে তোলে। ২১শে ফেব্রুয়ারির নৃশংস হত্যাকাণ্ড পূর্ব পাকিস্তানে ব্যাপক ক্ষোভের সৃষ্টি করে এবং ভাষার অধিকারের দাবিকে আরও জোড়ালো করে তোলে। শেষ পর্যন্ত, ১৯৫৬ সালে পাকিস্তান সরকার বাংলাকে উর্দুর পাশাপাশি রাষ্ট্রভাষার স্বীকৃতি দিতে বাধ্য হয়। এই বিজয় বাংলাদেশে জাতীয়তাবাদী চেতনাকে শক্তিশালী করে এবং ১৯৭১ সালে বাংলাদেশের স্বাধীনতার পথে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে।

২১শে ফেব্রুয়ারির গুরুত্ব শুধু বাংলাদেশের মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়। ১৯৯৯ সালে, ইউনেস্কো দিনটিকে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস হিসেবে ঘোষণা করে, যা বিশ্বব্যাপী ভাষাগত ও সাংস্কৃতিক বৈচিত্র্য সংরক্ষণের গুরুত্ব তুলে ধরে। তখন থেকে, এই দিনটি বিশ্বব্যাপী পালিত হয়ে আসছে, যা ভাষা আন্দোলন ও মাতৃভাষার অধিকারের গুরুত্ব স্মরণ করিয়ে দেয়। ভাষা আন্দোলন বাংলাদেশের ইতিহাসে একটি গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়, যা জাতীয় পরিচয় ও স্বাধীনতার পথ সুগম করে। ২১ শে ফেব্রুয়ারি কেবল স্মরণের দিন নয়, এটি ভাষা ও সাংস্কৃতিক অধিকারের শক্তির প্রতীকও। ভাষা শহীদদের আত্মত্যাগ আজও বিশ্বব্যাপী ভাষাগত ও সাংস্কৃতিক সংরক্ষণের আন্দোলনকে অনুপ্রাণিত করে চলেছে।

আজও যখন ফেব্রুয়ারি মাস আসে, তখন চারদিকে উদাত্ত কণ্ঠে শোনা যায়-

‘আমার ভাইয়ের রক্তে রাঙানো একুশে ফেব্রুয়ারি
আমি কি ভুলিতে পারি
ছেলে হারা শত মায়ের অশ্রু-গড়া এ ফেব্রুয়ারি
আমি কি ভুলিতে পারি
আমার সোনার দেশের রক্তে রাঙানো ফেব্রুয়ারি
আমি কি ভুলিতে পারি।’

সাংবাদিক ও লেখক আবদুল গাফফার চৌধুরী ১৯৫২ সালের ২১শে ফেব্রুয়ারিতে

গানটি রচনা করেন। এই গানের কথায় ১৯৫২ সালের ফেব্রুয়ারি ২১ তারিখে সংঘটিত বাংলা ভাষা আন্দোলনের ইতিহাস ফুটে উঠেছে।

কবি ও গায়ক প্রতুল মুখোপাধ্যায় বাংলা ভাষাকে ভালোবেসে লিখেছেন—

'আমি বাংলায় কথা কই, আমি বাংলার কথা কই
আমি বাংলায় ভাসি, বাংলায় হাসি, বাংলায় জেগে রই
আমি বাংলায় মাতি উল্লাসে, করি বাংলায় হাহাকার
আমি সব দেখে শুনে খেপে গিয়ে-করি বাংলায় চিৎকার
বাংলা আমার দৃপ্ত স্লোগান, ক্ষিপ্ত তীরধনুক
আমি একবার দেখি, বারবার দেখি, দেখি বাংলার মুখ।'

১৩.৩.২ : বরাক উপত্যকার ভাষা আন্দোলন

এই বাংলা ভাষার জন্যই বাংলাদেশের২১শেফেব্রুয়ারির ভাষা আন্দোলনের পাশাপাশি আরেকটি ভাষা আন্দোলন উল্লেখ করা প্রয়োজন সেটি হলো আসাম রাজ্যের বাঙালি অধ্যুষিত বরাক উপত্যকার ভাষা আন্দোলন। বাংলাদেশে ৫২সালের ভাষা আন্দোলনের চেতনায় ১৯৬১সালে ১৯ মে ভারতের আসামে বরাক উপত্যকায় বাংলা ভাষার স্বীকৃতির দাবিতে আন্দোলন করতে গিয়ে শহীদ হয়েছিলেন ১১জন। এই ভাষা আন্দোলনে শহীদ হন, কানাইলাল নিয়োগী, চণ্ডীচরণ সূত্রধর, হিতেশ বিশ্বাস, সত্যেন্দ্রদেব, কুমুদরঞ্জন দাস, সুনীল সরকার, তরণীদেব নাথ, শচীন্দ্রচন্দ্র পাল, বীরেন্দ্র সূত্রধর, সুকোমল পুরকায়স্থ এবং কমলা ভট্টাচার্য। এরপর ১৯৭২ সালের ১৭আগস্ট সেবাসার্কুলার প্রত্যাহারের দাবিতে ভাষা আন্দোলনে শহিদ হন শ্রীভূমি জেলার বিজন চক্রবর্তী। এছাড়া ১৯৮৬ সালের ২১ জুলাই বিশ্ববিদ্যালয় স্তরে বাংলা ভাষার দাবির আন্দোলনে শহিদ হন করিমগঞ্জের আরো দুজন, জগন্ময় দেব এবং দিব্যেন্দু দাস।

১৯৬০ সালে অসম প্রদেশ কংগ্রেস সিদ্ধান্ত নেয়, গোটারাজ্যে শুধু অসমিয়া ভাষাই সরকারি স্বীকৃতি পাবে। প্রতিবেশী পূর্ব পাকিস্তানে ৫২'র ভাষা আন্দোলনের চেতনায় সমৃদ্ধ বরাকের বাঙালিরা প্রতিবাদে শামিল হন। শুরু হয় ভাষা আন্দোলন। বাংলা ভাষার স্বীকৃতির দাবিতে গোটা বরাক জুড়ে শুরু হয় আন্দোলন। এই আন্দোলনকে গুরুত্ব না দিয়ে কংগ্রেসি মুখ্যমন্ত্রী বিমল প্রসাদ চালিহা ১০ অক্টোবর বিধান সভায় বিল আনেন একমাত্র অসমিয়া ভাষার সরকারি স্বীকৃতির। এর প্রতিবাদে আন্দোলনে নামলে সরকারী প্ররোচনায় পুলিশ-মিলিটারি গুলি চালালে এগারোজন সত্যাগ্রহী প্রাণ হারান। তাঁদের আত্ম বলিদানকে স্মরণে রেখে ২১শে ফেব্রুয়ারির পাশাপাশি ১৯মে ভাষা দিবস পালন করা হয়।

জেনে রাখা ভালো

ভাষা শহীদ কমলা ভট্টাচার্য

১৯৬১ সালের বরাক উপত্যকায় আন্দোলনকারীদের স্লোগান ছিলো 'জান দেবো, তবু জবান দেবো না'। সে আন্দোলনে অংশগ্রহণ করেছিলেন অত্যন্ত সাধারণ ঘরের মেয়ে কমলা ভট্টাচার্য। বাংলা ভাষার মর্যাদা ফিরিয়ে আনতে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে তিনিও আন্দোলনে যোগ দিয়েছিলেন। কমলা ভট্টাচার্য ১৯৪৫ সালে তৎকালীন আসাম প্রদেশের সিলেটে জন্মগ্রহণ করেন। বাবা রামরমণ ভট্টাচার্য ও মা সুপ্রবাসিনী দেবীর সাত সন্তানের মধ্যে পঞ্চম, কমলা। ১৭মে ম্যাট্রিক পরীক্ষার শেষ দিন ছিল কমলার। ১৮ মে বেশ ভালোই কাটছিলো। সে দিন তিনি শুনতে পান ১৯শে মে শিলচর রেল স্টেশনে মাতৃভাষায় প্রাথমিক শিক্ষার দাবিতে একটি পিকেটিংয়ের ডাক দেওয়া হয়েছে। তার আগে ১৪ এপ্রিল শিলচর, শ্রীভূমি (তৎকালীন করিমগঞ্জ) এবং হাইলাকান্দির আন্দোলনকারীদের সংকল্প দিবসের কথাও তিনি শুনতে পেয়েছিলেন। আন্দোলনকারীদের সাথে তিনিও উপবাস পালন করেছিলেন। ২৪ এপ্রিলের দীর্ঘ পদযাত্রা তাকে ভীষণ ভাবে উদ্দীপ্ত করেছিল। অন্যদিকে সত্যাগ্রহীরা যে গ্রামে গ্রামে ঘুরে প্রচার চালিয়েছিলেন তাও কমলাকে নাড়া দিয়েছিল দারুণ ভাবে। ১৯শে মে দুপুর ২ টা ৩৫ মিনিটের সময় বিনা প্ররোচনায় অবস্থানকারী ছাত্র ছাত্রীদের নির্মমভাবে লাঠি ও বন্দুকের কুঁদো দিয়ে পেটাতে শুরু করে পুলিশ। পুলিশের গুলিতে সে দিন মাটিতে লুটিয়ে পরেন এগারোজন ভাষা সেনানী। মাত্র ১৬ বছর বয়সে মাতৃভাষার জন্য আত্মত্যাগ করে চির অমর হয়ে যান পৃথিবীর ইতিহাসে প্রথম নারী ভাষা শহীদ কমলা ভট্টাচার্য।

১৩.৪ নক্‌শাল আন্দোলন

রাজনৈতিক আন্দোলন একধরনের সামাজিক আন্দোলন, যার লক্ষ্য রাজনৈতিক পরিবর্তন আনা। এগুলো সাধারণত সরকারী নীতিতে প্রভাব ফেলতে বা সরকার পরিবর্তনের উদ্দেশ্যে পরিচালিত হয়। উদাহরণ হিসেবে 'ভারত ছাড়ো আন্দোলন' (Quit India Movement) উল্লেখযোগ্য, যা ১৯৪২ সালে ব্রিটিশ শাসনের বিরুদ্ধে এক গুরুত্বপূর্ণ প্রতিরোধ গড়ে তুলেছিল। এমনই একটি উল্লেখযোগ্য আন্দোলন নকশাল আন্দোলন।

নকশাল আন্দোলন, যা নকশালপন্থী বা মাওবাদী বিদ্রোহ নামেও পরিচিত, ভারতের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ অভ্যন্তরীণ নিরাপত্তা সংকট। বামপন্থী চরমপন্থার ভিত্তিতে গড়ে ওঠা এই আন্দোলন ১৯৬০-এর দশকের শেষের দিকে কৃষক বিদ্রোহ হিসেবে শুরু হয় এবং ধীরে ধীরে ভারতীয় রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে একটি বৃহৎ সশস্ত্র বিপ্লবে পরিণত হয়। এই আন্দোলনের মূল চালিকা শক্তি হলো ভূমি অধিকারের দাবি, অর্থনৈতিক বৈষম্য এবং আদিবাসীদের শোষণের মতো সামাজিক সমস্যা। নকশাল আন্দোলনের সূচনা হয় ১৯৬৭ সালে পশ্চিমবঙ্গের নকশাল বাড়ি গ্রামে এক কৃষক বিদ্রোহের মাধ্যমে। চারু মজুমদার, কানু সান্যাল এবং জঙ্গল

সান্তাল এই বিদ্রোহের নেতৃত্ব দেন। এই আন্দোলনের পেছনে মাওবাদী মতাদর্শ কাজ করেছিল যেখানে সাম্যবাদী শাসন ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার জন্য লড়াই শুরু করা হয়।

১৯৬৯ সালে কমিউনিস্ট পার্টি অফ ইন্ডিয়া (মার্কসবাদী-লেনিনবাদী) গঠিত হলে এই আন্দোলন একটি নতুন মাত্র পায়। নকশালবাড়ি বিদ্রোহ দমন করা হলেও এর মতাদর্শ দ্রুত ছড়িয়ে পড়ে ঝাড়খণ্ড, ছত্তিশগড়, ওড়িশা, বিহার, অন্ধ্রপ্রদেশ এবং মহারাষ্ট্রসহ বিভিন্ন রাজ্যে। ১৯৮০ এবং ১৯৯০-এর দশকে এই আন্দোলন একটি নতুন মাত্রা লাভ করে এবং বিভিন্ন নকশালপন্থী গোষ্ঠীগুলি একত্রিত হয়ে ২০০৪ সালে কমিউনিস্ট পার্টি অফ ইন্ডিয়া (মাওবাদী) গঠন করে। নকশালপন্থীরা মূলত আদিবাসী, ভূমিহীন শ্রমিক এবং বঞ্চিত সম্প্রদায়ের মধ্যে সমর্থন লাভ করে, যারা সরকারি অবহেলা, উচ্ছেদ এবং জমিদার ও কর্পোরেট প্রতিষ্ঠানগুলোর শোষণের শিকার ছিল। গেরিলা যুদ্ধের কৌশলে আন্দোলনকারীরা নিরাপত্তাবাহিনীর ওপর হামলা চালায় এবং সরকারি পরিকাঠামো ধ্বংস করে। ভারত সরকার সামরিক অভিযান এবং উন্নয়নমূলক কর্মসূচির সংমিশ্রণে এই বিদ্রোহ মোকাবিলার চেষ্টা করেছে। কিছু গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ হলো:

১। অপারেশন গ্রিনহান্ট (২০০৯): নকশাল গোষ্ঠীগুলোর ঘাঁটি নির্মূল করার জন্য একটি ব্যাপক আধা-সামরিক অভিযান।

২। উন্নয়নমূলক উদ্যোগ: নকশাল-প্রভাবিত অঞ্চলে অবকাঠামো, কর্মসংস্থান এবং শাসন ব্যবস্থা উন্নত করার জন্য সমন্বিত কর্মপরিকল্পনা (IAP) চালু করা।

৩। আত্মসমর্পণ ও পুনর্বাসন নীতি: নকশালদের অস্ত্র পরিত্যাগ করে সমাজের মূলস্রোতে ফিরে আসার জন্য উৎসাহিত করা। তবে এই প্রচেষ্টাগুলি অনেক চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন হয়েছে, যার মধ্যে রয়েছে দুর্গম ভূখণ্ড, বিদ্রোহীদের প্রতি স্থানীয় জনসমর্থন এবং আক্রান্ত অঞ্চলে শাসন ব্যবস্থার অভাব।

নকশাল আন্দোলন ভারতের রাজনৈতিক ইতিহাসে এক ঐতিহাসিক আন্দোলন হিসেবে রয়ে গেছে। যদিও এটি দমন করা হয়েছিল, তবে এই আন্দোলনের চিন্তা-ধারা এবং প্রভাব কিছু অঞ্চলে এখনও রয়েছে। বছরের পর বছর ধরে পুলিশি অভিযান কারণে নকশাল সহিংসতার মাত্রা অনেকটাই কমে এসেছে। তবে এখনো ছত্তিশগড় এবং ঝাড়খণ্ডের মতো রাজ্যে মাঝে মাঝে হামলার ঘটনা ঘটে। বিশেষজ্ঞরা মনে করেন যে সামরিক পদক্ষেপের পাশাপাশি রাজনৈতিক সংলাপ ও সামাজিক- অর্থনৈতিক উন্নয়নের মাধ্যমে বিদ্রোহ সম্পূর্ণ নির্মূল করা সম্ভব। নকশাল আন্দোলন একটি জটিল বিষয়, যা সামাজিক ও অর্থনৈতিক বঞ্চনার গভীর শিকড়ে প্রোথিত। সামরিক পদক্ষেপ বিদ্রোহ দুর্বল করলেও, দারিদ্র্য, ভূমি অধিকার এবং আদিবাসী কল্যাণের মতো মূল সমস্যাগুলি সমাধান করাই দীর্ঘমেয়াদে শান্তি প্রতিষ্ঠার জন্য অপরিহার্য।

এই নকশাল আন্দোলন নিয়ে অনেক সাহিত্যকর্ম রচিত হয়েছে, তৈরি হয়েছে সিনেমা। নকশাল আন্দোলন নিয়ে প্রচুর সাহিত্য রচিত হয়েছে। অরুন্ধতী রায় বুকার পুরস্কার জয়ী

'গড অব স্মল থিংস্' উপন্যাসে একটি চরিত্র নকশাল আন্দোলনে যোগ দেয়। মহাশ্বেতা দেবী তাঁর 'হাজার চুরাশির মা' উপন্যাসে নকশাল আন্দোলন নিয়ে লিখেছেন। ১৯৯৮ সালে এ উপন্যাসের উপর ভিত্তি করে একটি চলচ্চিত্র নির্মিত হয়, নাম ছিল 'হাজার চুরাশি কি মা'। সমরেশ মজুমদার, সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়, কিন্নর রায় রচিত বেশ কিছু উপন্যাসে নকশাল আন্দোলনের কথা রয়েছে।

নকশাল আন্দোলন ভিত্তিক কিছু উল্লেখযোগ্য বাংলা চলচ্চিত্র:

- প্রতিদ্বন্দ্বী (১৯৭০) — সত্যজিৎ রায়ের পরিচালিত এই চলচ্চিত্রটি বেকার যুবকদের সংগ্রাম এবং নকশাল আন্দোলনের প্রভাবকে তুলে ধরে।
- কলকাতা '৭১ (১৯৭২) — মৃণাল সেন পরিচালিত এই চলচ্চিত্রটি নকশাল আন্দোলন এবং তার তরুণ প্রজন্মের উপর প্রভাব নিয়ে নির্মিত।
- পদ্মানদীর মাঝি (১৯৯৩) — গৌতম ঘোষ পরিচালিত এই চলচ্চিত্রটি বাংলার নকশাল আন্দোলনের প্রসঙ্গ ছুঁয়ে যায়।
- লাল দরজা (১৯৯৭) — বুদ্ধদেব দাশগুপ্ত পরিচালিত এই চলচ্চিত্রটি নকশাল আন্দোলনের দ্বারা ক্ষতিগ্রস্ত মানুষের জীবন কাহিনি তুলে ধরে।

নকশাল আন্দোলন নিয়ে নির্মিত অন্যান্য ভারতীয় চলচ্চিত্র:

- দ্য নকশালাইটস (১৯৮০)— কে এ আব্বাস পরিচালিত হিন্দি চলচ্চিত্র, যেখানে মিঠুন চক্রবর্তী অভিনয় করেছেন।
- আঁধিগলি (১৯৮৪)— ১৯৭০-এর দশকের নকশাল আন্দোলনের পটভূমিতে নির্মিত একটি বলিউড চলচ্চিত্র।
- লাল সালাম (২০০২)— নন্দিতা দাস, শরদ কাপুর, এবং বিজয় রাজ অভিনীত একটি কম পরিচিত অ্যাকশন-ড্রামা।
- হাজারো খোয়াইশে অ্যায়সি (২০০৫)— ১৯৭০-এর দশকের নকশালবাড়ি আন্দোলনের প্রেক্ষাপটে নির্মিত চলচ্চিত্র, যেখানে কে কে মেনন, চিত্রাঙ্গদা সিং এবং শাইনি আহুজা অভিনয় করেছেন।
- চামকু (২০০৮)— বিহারে নকশাল আন্দোলনের পটভূমিতে নির্মিত একটি অ্যাকশন থ্রিলার, যেখানে ববি দেওল, প্রিয়াঙ্কা চোপড়া, এবং ইরফান খান অভিনয় করেছেন।
- রেড অ্যালার্ট: দ্য ওয়ার উইদিন (২০১০)— আনন্ত মহাদেবন পরিচালিত, বাস্তব কাহিনির ওপর ভিত্তি করে নির্মিত চলচ্চিত্র, যেখানে সুনীল শেট্টি, সমীরা রেড্ডি, এবং আশীষ বিদ্যার্থী অভিনয় করেছেন।
- চক্রব্যূহ (২০১২)— পুলিশ ও মাওবাদীদের মধ্যে রাজনৈতিক সংঘর্ষ নিয়ে নির্মিত চলচ্চিত্র, যেখানে অর্জুন রামপাল, অভয় দেওল, এবং মনোজ বাজপেয়ী অভিনয় করেছেন।

- নিউটন (২০১৭)— রাজ কুমার রাও অভিনীত একটি ব্ল্যাক কমেডি ড্রামা, যেখানে একজন নতুন সরকারি কর্মকর্তা নকশাল-নিয়ন্ত্রিত এলাকায় নির্বাচন পরিচালনার দায়িত্ব পায়।
- বীরাট পর্বম (২০২২)— ১৯৯০-এর দশকের তেলেঙ্গানার নকশাল আন্দোলনের সত্য ঘটনা অবলম্বনে নির্মিত একটি তেলেগু চলচ্চিত্র, যেখানে রানাদাগ্গুবাতি ও সাই পল্লবী অভিনয় করেছেন।



অগ্রগতি নির্ধারক প্রশ্ন

১. নকশাল আন্দোলনের সূত্রপাত কী করে হয়েছিল আলোচনা করুন। (১০০ শব্দের মধ্যে)

১৩.৫ হাংরি আন্দোলন

হাংরি আন্দোলন একটি সাহিত্যিক আন্দোলন। যা আধুনিক বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে তুমুল সাড়া জাগিয়েছিল। বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে হাংরি আন্দোলনের লেখকরা যা কিছু প্রাতিষ্ঠানিক, সে-সবকে সমূলে তুলে ফেলতে চেয়েছিলেন। এই আন্দোলন শুরু হয় ১৯৬৩-১৯৬৪ এর দিকে। সাহিত্যের ইতিহাসে জায়গা করে নেওয়া এই আন্দোলন সাহিত্য চিন্তা, ভাবনা, শব্দ ইত্যাদি প্রতিটি ক্ষেত্রেই নিজের স্বকীয়তা নিয়ে হাজির হয়, এবং সমাজে আলোড়ন সৃষ্টি করে। এই আন্দোলনের সাথে যুক্ত লেখকরা কোনো রকম ফর্মকে সামনে রেখে লেখেননি, কোনো দর্শনকে ভেবেও লেখেননি। জীবন তাঁদের যা দেখিয়েছে, শিখিয়েছে তাকে ই তাঁরা তুলে এনেছেন লেখায়। জীবন মন্থিত এইসব লেখায় তাই রুক্ষতা লক্ষণীয় হয়ে ওঠে।

যে পাঁচজন হাংরি জেনারেশন আন্দোলন শুরু করেছিলেন তাঁরা হলেন, বাসুদেব দাশগুপ্ত, সুভাষ ঘোষ, প্রদীপ চৌধুরী, সুবো আচার্য এবং শৈলেশ্বর ঘোষ। হাংরি আন্দোলনের উল্লেখযোগ্য কবি, শৈলেশ্বর ঘোষ, প্রদীপ চৌধুরী, সুবো আচার্য, সমীর রায় চৌধুরী, মলয় রায় চৌধুরী, ফাল্গুনী রায়, দেবী রায়, উৎপল কুমার বসু, সুবিমল বসাক, ত্রিদিব মিত্র, রবিউল হুসাইন, অরুণেশ ঘোষ। কথা সাহিত্যিক হিসেবে উল্লেখ করা যেতে পারে, বাসুদেব দাশগুপ্ত, সুভাষ ঘোষ, সুবিমল বসাক, প্রমুখের নাম। নাটকের ক্ষেত্রে মলয় রায় চৌধুরী, ফাল্গুনী রায়ের কথা উল্লেখ করা যায়।

হাংরি জেনারেশন (অথবা হাংরিয়ালিস্ট আন্দোলন) ১৯৬০-এর দশকে ভারতের বিশেষত বাংলার একটি সাহিত্য ও সাংস্কৃতিক আন্দোলন ছিল। এটি একদল বিদ্রোহী কবি, লেখক ও শিল্পীর নেতৃত্বে গড়ে ওঠে, যারা প্রচলিত সাহিত্যিক রীতি নীতিকে প্রত্যাখ্যান করে এক নতুন, কাঁচা, বিদ্রোহী ও আধুনিকতাবাদী (অ্যাভান্ট-গার্ড) প্রকাশভঙ্গি তৈরি করতে

চেয়েছিলেন। এই আন্দোলন শুরু হয় ১৯৬১ সালে কলকাতায়। এর প্রধান উদ্যোক্তা ছিলেন মলয় রায় চৌধুরী, সমীর রায় চৌধুরী, সুবিমল বসাক ও দেবী রায়। এই আন্দোলন আন্তর্জাতিক আধুনিকতাবাদী সাহিত্য ধারার দ্বারা গভীরভাবে প্রভাবিত ছিল, বিশেষ করে আমেরিকার বিট জেনারেশন এবং ইউরোপের দাদাবাদও অতিবাস্তববাদী (সুররিয়ালিস্ট) আন্দোলন। হাংরি লেখকরা মূল ধারার প্রথাগত ও অভিজাত বাংলা সাহিত্যকে প্রত্যাখ্যান করেন এবং তাদের রচনায় তুলে ধরেন ক্ষুধা, দারিদ্র্য, অস্তিত্বের সংকট, বিদ্রোহ ও সামাজিক অবিচার। তাঁদের সাহিত্যচর্চা ছিল ইচ্ছাকৃত ভাবে রূঢ়, ধাক্কা দেওয়ার মতো, এবং প্রচলিত কাঠামো ও ভাষা ভেঙে দেওয়া।

হাংরি জেনারেশনের সাহিত্য ভারতবর্ষের স্বাধীনতা-পরবর্তী অস্থির সময়ের দ্বারা গভীর ভাবে প্রভাবিত ছিল। তাঁদের লেখায় উঠে আসে-

- অর্থনৈতিক বৈষম্য—শ্রমজীবী মানুষের সংগ্রামের প্রতিফলন
- বিচ্ছিন্নতা ও হতাশা—অস্তিত্বের সংকট ও মোহভঙ্গের চিত্র
- যৌন স্বচ্ছন্দতা—যৌনতা ও দেহতৃষ্ণা নিয়ে ট্যাবু ভাঙা আলোচনা
- নগর জীবনের বিশৃঙ্খলা—পরিবর্তনশীল শহুরে জীবনের অরাজকতা
- বিদ্রোহ—প্রচলিত সামাজিক, রাজনৈতিক ও সাহিত্যিক ধারা প্রত্যাখ্যান

তাদের ভাষা ছিল ইচ্ছাকৃত ভাবে অমার্জিত, যেখানে বাংলা ভাষার সঙ্গে স্ল্যাং, অসম্পূর্ণ বাক্য ও গালি-গালাজ পর্যন্ত মেশানো হতো, যা প্রচলিত শুদ্ধ ও গঠনমূলক সাহিত্যের বিপরীত ছিল। উদাহরণ হিসেবে উল্লেখ করা যেতে পারে—

১। "ক্ষিপ্রহাত, ছিন্নমুণ্ড, কয়েক ঝলক রক্ত, লকলকে জিভ
উল্লোল স্ফুরিত হিংস্র সারি সারি ভীষণ জল্লাদ...
..'খচ', করে শব্দ এক, আমার কর্তিত দেহ, দেখি
ছটফট করিতেছে মেঝের উপর গর্তে! "কেমন বল্লুম শালা
জেদে গোঁয়ার তুমি করিসনে, শিল্প-ফিল্প গ্যাঁড়াকল বহুদিন শেষ হয়ে গেছে"
(মেঘনাদের পুনরুজ্জীবন, মলয় রায় চৌধুরী)

২। "হলুদ পাতা ঝরে পড়ে, আকাশের জলে শুকনো মাটি হয় কাদা
তবে সব কিছু শেষ হয়নি পৃথিবীতে! নাও ঘ্রাণ...ওই উন্মোচিত স্তন...
শিকারীর গন্ধ দূর থেকে পায় পশুরা...."
(সরস্বতী, শৈলেশ্বর ঘোষ)

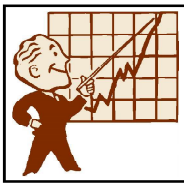
৩। কবি প্রদীপ চৌধুরী লীনা নামক তাঁর নারীকে বলেছেন—
"এখন তোমার মুখে আদিম জ্যোৎস্না
ফোটে কাছাকাছি হ্রদতট ও খাদ
জ্যোৎস্নায় শুকিয়ে যাচ্ছে আমাদের বিরহ ও যৌন কোলাহল"
(বিধ্বস্ত উপজাতি, প্রদীপ চৌধুরী)

৪। প্রেম যখন রিরংসা ও ঘৃণার অর্থহীনতায় অলংকৃত হয়, তখন শোনা যায় কবির উচ্চারণ—

"গণিকার বাথরুম থেকে প্রেমিকার বিছানার দিকে
আমার অনায়াস যাতায়াত শেষ হয় নাই"
(আমিও সৌন্দর্য রাক্ষস, ফাল্গুনী রায়)

এই আন্দোলন তৎকালীন মূলধারার সাহিত্যিক সমাজ এবং সরকারের প্রচণ্ড বিরোধিতার মুখে পড়ে। অনেক লেখা অশ্লীল ও রাষ্ট্র বিরোধী বলে বিবেচিত হয়, যার ফলে পুলিশের হানা, নিষেধাজ্ঞা ও লেখকদের কারাবরণ পর্যন্ত ঘটে। বিশেষত মলয় রায় চৌধুরীর বিখ্যাত কবিতা "স্টার্ক ইলেকট্রিক জিসাস" অত্যন্ত বিতর্কিত হয়েছিল।

১৯৬৫ সালে তিনি অশ্লীলতার অভিযোগে গ্রেপ্তার হন, যদিও পরবর্তীতে তিনি মুক্তি পান। যদিও হাংরি জেনারেশন আন্দোলন দীর্ঘস্থায়ী হয়নি, তবে এটি আধুনিক ভারতীয় সাহিত্যে স্থায়ী প্রভাব ফেলেছে। এই আন্দোলনের হাত ধরে ভারতের সাহিত্য আরও পরীক্ষামূলকও বিদ্রোহী ধারায় প্রবাহিত হয়। পরবর্তী সময়ে লিটল ম্যাগাজিন আন্দোলন ও নকশালপন্থী সাহিত্য আন্দোলন-এর অনেক লেখক হাংরি লেখকদের দ্বারা অনুপ্রাণিত হন। ১৯৬০-এর দশকের শেষ দিকে এই আন্দোলন ক্ষীণ হয়ে এলেও এর বিদ্রোহী চেতনাও শিল্পের স্বাধীনতার লড়াই আজও বহুকবি-লেখকের সৃষ্টিতে প্রতিফলিত হয়।



অগ্রগতি নির্ধারক প্রশ্ন

২. হাংরি আন্দোলন বিষয়ে সংক্ষেপে লিখুন। (১৫০ শব্দের মধ্যে)

১৩.৬ অধ্যায় সংক্ষেপ

যে কোনো আন্দোলন সমাজ বদলের অন্যতম কারিগর। ফলত সমাজ অভ্যন্তরে সংগঠিত যে কোনো আন্দোলনের প্রত্যক্ষ প্রভাব তার সমাজ-সাংস্কৃতিক জীবনে পড়তে বাধ্য। আর তার রূপায়ণেই গড়ে উঠে বাংলার সাহিত্য ও শিল্পভাবনা। আমরা জানি বিগত শতাব্দীতে সংগঠিত নকশাল আন্দোলন, ভাষা আন্দোলন কিংবা হাংরি আন্দোলনের মতো গুরুত্বপূর্ণ সামাজিক বিক্ষোভগুলো বাংলা যাপনের পাশাপাশি তার বৌদ্ধিক ভাবনাকেও যথেষ্ট ভাবে প্রভাবিত করেছে। আলোচ্য অধ্যায় তারই গবেষক অনুসন্ধানে রূপায়িত হয়েছে।



১৩.৭ অধ্যায়টি পাঠ করে আমরা কী শিখলাম

- আমরা এই অধ্যায় থেকে ভাষাগত সামাজিক আন্দোলন তথা ভাষা আন্দোলন, সাহিত্য ভিত্তিক হাংরি জেনারেশন আন্দোলন এবং রাজনৈতিক নকশাল আন্দোলন সম্পর্কে জানতে পারলাম।

- এই আন্দোলনের কারণ ও প্রেক্ষাপট বিষয়ে জানতে পারলাম।
- আন্দোলনগুলোর প্রত্যক্ষ প্রভাব ও সাহিত্যে তথা শিল্পে তার প্রতিচ্ছবি সম্পর্কে সচেতন হওয়া সম্ভব হল।



১৩.৮ অতিরিক্ত পঠন

আচার্য, অনিল (২০১৪); সত্তর দশক; কলকাতা : অনুষ্টুপ

আচার্য, বসু (২০১৪); চারু মজুমদার পরবর্তী পর্যায়ে নকশাল আন্দোলনের প্রামাণ্য দলিল সংকলন; কলকাতা : নবজাতক

কামাল, মোস্তাফা (২০২০); ভাষা আন্দোলন সাতচল্লিশ থেকে বাহান্ন; ঢাকা : বাংলাদেশ কো-অপারেটিভ বুক সোসাইটিলি :

ঘোষ, বিজিত (১৯৯৩); নকশাল আন্দোলনেব. গল্প; কলকাতা : পুনশ্চ

রায়, চৌধুরী, মলয় (২০১৯); হাংরি আন্দোলন; কলকাতা : চন্দ্রবিন্দু



১৩.৯ অগ্রগতি নির্ধারক উত্তর-সংকেত

১। নকশাল আন্দোলন ভারতের একটি কমিউনিস্ট বিপ্লবী আন্দোলন, যা ১৯৬৭ সালে পশ্চিমবঙ্গের নকশালবাড়ি গ্রাম থেকে শুরু হয়েছিল।..... এটি মূলত কৃষকদের জমির অধিকার, সামাজিক ন্যায় বিচার ও সাম্যবাদী রাষ্ট্র গঠনের লক্ষ্য শুরু হয়েছিল। (দ্রষ্টব্য: এই অধ্যায়ের নকশাল আন্দোলন অংশ)

২। হাংরি আন্দোলন একটি সাহিত্যিক আন্দোলন। .....এই আন্দোলনের সাথে যুক্ত লেখকরা কোন রকম ফর্মকে সামনে রেখে লেখেননি, কোনো দর্শনকে ভেবেও লেখেননি।..... জীবন মন্থিত এইসব লেখায় তাই রুক্ষতা লক্ষ্যণীয় হয়ে ওঠে। এই ভাবে সাজিয়ে লিখুন।



১৩.১০ আদর্শ প্রশ্নাবলি

১। নকশাল আন্দোলন সম্পর্কে আপানার সুচিন্তিত মতামত ব্যক্ত করুন।

২। ভাষা আন্দোলন সম্পর্কে সংক্ষেপে আলোচনা করুন।

৩। সাহিত্য আন্দোলন বলতে কী বোঝা যায়? হাংরি আন্দোলন সম্পর্কে আপনার মতামত ব্যক্ত করুন।

৪। নকশাল আন্দোলনকে কেন্দ্র করে যে সমস্ত চলচ্চিত্র তৈরি হয়েছে সে সম্পর্কে আলোচনা করুন।

অধ্যায় ১৪ : স্বাধীনতা উত্তর বঙ্গীয় সমাজ ও সংস্কৃতি-৩

বিন্যাস ক্রম

১৪.১ জ্ঞাতব্য বিষয়
১৪.২ পরিচিতি
১৪.৩ কলোনি প্রতিষ্ঠা
১৪.৪ কংগ্রেসের খাদ্য ও ভূমিনীতি
১৪.৫ পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা ও তার প্রতিফলন
১৪.৬ অধ্যায় সংক্ষেপ
১৪.৭ অধ্যায়টি পাঠ করে আমরা কী শিখলাম
১৪.৮ অতিরিক্ত পঠন
১৪.৯ অগ্রগতি নির্ধারক উত্তর-সংকেত
১৪.১০ আদর্শ প্রশ্নাবলি

১৪.১ জ্ঞাতব্য বিষয়

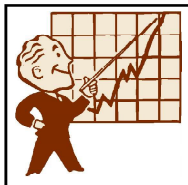
এই অধ্যায় পাঠ করে শিক্ষার্থী—

- স্বাধীনতা উত্তর জাতীয় কংগ্রেসের অবস্থান সম্পর্কে জানতে পারবেন।
- ভাষাকে কেন্দ্র করে বাংলাদেশে যে গণবিক্ষোভ সে সম্পর্কে জ্ঞান অর্জন করতে পারবেন।
- বাংলাদেশে পাকিস্থান শাসনের বর্বরতায় ভারতসহ পশ্চিমবঙ্গে যে অনুপ্রবেশতা বুঝতে সক্ষম হবেন।
- পশ্চিমবঙ্গের যে উদ্বাস্তু সমস্যা ও তার ফলশ্রুতি সে সম্পর্কে ওয়াকিবহাল হবেন।

১৪.২ পরিচিতি

কেবল মাত্র স্বাধীনতা অর্জন কখনোই একটি জাতির একমাত্র লক্ষ্য হতে পারেনা। আর্থ-সামাজিক ক্ষেত্রে গণতন্ত্রের প্রতিষ্ঠাই প্রতিটি জাতির মূল লক্ষ্য এবং সেই লক্ষ্যে উপনীত হওয়ার জন্য প্রয়োজন বহিঃশত্রুর নিয়ন্ত্রণমুক্ত পূর্ণস্বাধীনতা। ভারতীয় গণ-পরিষদের লক্ষ্য ছিল স্বাধীন ভারতের সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক কাঠামোর রূপরেখা অঙ্কন করা। এই লক্ষ্য-নির্ধারণে সংবিধানর চয়িতাগণ গান্ধীজির চিন্তাধারা এবং পাশ্চাত্যের উদার নৈতিক মতবাদ দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিলেন। জওহরলাল নেহরু বলেন যে, গণ-পরিষদের প্রধান কাজ হবে একটি নতুন সংবিধান প্রণয়নের মাধ্যমে ভারতকে স্বাধীন করা, ক্ষুধার্ত মানুষের মুখে দু'মুঠো অন্ন, বস্ত্রহীনকে বস্ত্র এবং প্রতিটি ভারতবাসীকে তার যোগ্যতা অনুযায়ী

আত্মবিকাশের সর্বাধিক সুযোগ প্রদান করা। ড° রাজেন্দ্র প্রসাদ বলেন যে, দুঃখ-দারিদ্র্যয়ের অবসান ঘটানো, বৈষম্য ও শোষণের বিলোপ সাধন এবং সুন্দর জীবন যাত্রার উপযোগী পরিবেশ সৃষ্টি করাই হবে গণ-পরিষদের লক্ষ্য। ড° সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণান বলেন যে, একটি সামাজিক-অর্থনৈতিক বিপ্লব সাধনই গণ-পরিষদের মূল লক্ষ্য।



অগ্রগতি নির্ধারক প্রশ্ন

২. তৎকালীন বঙ্গে বামফণ্ট সরকারের ভূমি নীতিটি পর্যালোচনা করুন। (১৫০ শব্দের মধ্যে)

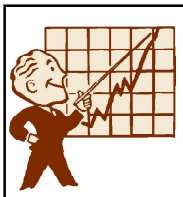
১৪.৩ কলোনি প্রতিষ্ঠা

বাংলায় রোজই কতশত গল্প-কাহিনি ও ইতিহাসের জন্ম দেয়। এমনই একটি ইতিহাস জন্ম হয়েছিল কলকাতা শহরের বুকে উদ্বাস্তু সমস্যাকে কেন্দ্র করে কলোনি প্রতিষ্ঠার মধ্য দিয়ে। যদিও ব্রিটিশ পর্বেই এই কলোনির ধারণা বাঙালির মজ্জাগত হয় রেল কলোনিগুলোর আবির্ভাবের মধ্য দিয়ে। কিন্তু কলোনি জীবন বলতে যে গ্লানি বাংলা বয়ে নিয়ে চলে তার সূত্রপাত কিন্তু দেশ ভাগের ফলে যে উদ্বাস্তু স্রোত তার ফলশ্রুতিতে। তাই কলোনি গড়ে ওঠার ইতিহাসের দিকে চোখ ফেরাতে হলে আমাদের ফিরে যেতে হবে দেশভাগকালীন অনুপ্রবেশের বহু চর্চিত ইতিহাসের দিকে। মূলত ১৯৪৭-এর দেশভাগের ফলে নিপীড়িত ও অত্যাচারিত হয়ে পূর্ব পাকিস্থান থেকে যারা পশ্চিমবঙ্গে চলে এসেছিলেন, মূলত সেই সমস্ত উদ্বাস্তুরাই সরকারি বা ফাঁকা ব্যক্তি মালিকানাধীন জমিজবর দখল করে গড়ে তুলেছিল একের পর এক কলোনি। শহর কেন্দ্রিক এই কলোনিগুলো গড়ে ওঠার প্রক্রিয়াগুলো হল—

- প্রথমে একটি খালি জমি উদ্বাস্তুদের একটি ছোটদল দ্বারা চিহ্নিত করা হত (এটি ব্যক্তিগত মালিকানাধীন, সরকারি সম্পত্তি বা পরিত্যক্ত সামরিক এলাকা হতে পারে)।
- পরে তা উদ্বাস্তুদের দ্বারা বেশির ভাগ সময় রাতের বেলা দখল করা হত।
- পরবর্তীতে সেই চিহ্নিত জমিটিকে ছোটো ছোটো প্লটে বিভক্ত করা হত এবং নিজেদের আয়ত্বে নিয়ে নেওয়া হতো।
- অবশেষে এটি যে আগে আসবে সেভাবে এই মানসিক চুক্তির ভিত্তিতে অন্যান্য উদ্বাস্তুদের মধ্যে বিতরণ করা হত।
- এর পর যত তাড়াতাড়ি সম্ভব সেখানে কুঁড়ে ঘর তৈরি করা হতো।
- এসময় একটি কলোনি কমিটি প্রতিষ্ঠিত হতো যারা কলোনির দৈনন্দিন ব্যবস্থাপনা এবং অবকাঠামো নির্মাণ, স্কুল, বাজার এবং মন্দির স্থাপন এবং সরকার এবং স্থানীয়দের সাথে আলোচনার দায়িত্বে ছিল।

যেহেতু জমির এই ধরনের দখলের কোনো ও আইনি ভিত্তি ছিল না এবং প্রায়শই মালিক অথবা সরকারের সাথে সংঘর্ষের সমস্যা দেখা দিত, তাই এগুলি জবর দখল কলোনি নামে পরিচিতি লাভ করে, যার অর্থ বল প্রয়োগ দ্বারা দখল করা।

এক্ষেত্রে প্রথম উদ্বাস্তু কলোনি গড়ে ওঠে ১৯৪৮ সালে। কলকাতার দক্ষিণে যাদবপুরের বিজয়গড়, যা ১৯৪৮ সালে একটি পরিত্যক্ত সামরিক ব্যারাকে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। ১৯৫০ সালের শেষ নাগাদ এর পার্শবর্তী এলাকায় প্রায় ১৪৯ টি কলোনি গড়ে উঠেছিল। বিশেষ তথ্য অনুযায়ী পরবর্তী কুড়ি বছরে, পশ্চিমবঙ্গে আরও ১৭৫ টি কলোনি গড়ে ওঠে। এ ক্ষেত্রে লক্ষণীয় বিষয়, এধরনের অনেক কলোনির নামকরণ করা হয়েছিল গুরুত্বপূর্ণ স্বাধীনতা সংগ্রামী এবং জাতীয়তাবাদী নেতাদের নামে। কলকাতার দক্ষিণ ও উত্তরপ্রান্তে বা পুজি নগর (এম.কে. গান্ধীর নামে), নেতাজি নগর (সুভাষ চন্দ্র বসুর নামে), আশুতোষ কলোনি (আশুতোষ মুখার্জির নামে), সুচেতা কলোনি (সুচেতা কৃপালিনীর নামে), সূর্য নগর (সূর্যসেনের নামে), কাটজু নগর (কৈলাসনাথ কাটজুর নামে) প্রমূখদের নামে গড়ে ওঠে। এই নামকরণের মাধ্যমে যেমন, এই কলোনিগুলির উদ্বাস্তু নেতারা স্বাধীনতা আন্দোলনের প্রতি শ্রদ্ধানিবেদন করেছিলেন। ঠিক তেমনিই এটি ছিল একটি নতুন স্বাধীন দেশে ভূমিহীন কলোনিগুলিকে বৈধতা দেওয়ার এবং জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের আবহের মধ্যে উদ্বাস্তুদের স্থান দেওয়ার একটি বিশেষ উপায়। তবে, সমস্ত কলোনির নামকরণ জাতীয়তাবাদী নেতাদের নামে করা হয়নি। বিজয় গড়, আজাদ গড় এবং রাম গড়ের মতো উপনিবেশগুলি নামকরণের একটি ভিন্ন রাজনীতির কথা উল্লেখ করে। বাংলায় 'গড়' অর্থ দুর্গ। যেহেতু উপনিবেশগুলি অবৈধ ভাবে দখলকৃত জমিতে স্থাপিত হয়েছিল, তাই জমির মালিক এবং সরকার দখলদারদের অপসারণের চেষ্টা করেছিলেন। এসময় উদ্বাস্তুরা তাদের উচ্ছেদের সরকারি প্রচেষ্টার বিরুদ্ধেও প্রতিরোধ গড়ে তুলেছিল। বিজয় গড় এবং আজাদ গড়ের মতো নামগুলি 'দুর্গ' রাখার পেছনে আসলে, সেগুলো দখলে রাখার ক্ষেত্রে উদ্বাস্তুদের সাফল্যকে চিহ্নিত করেছিল।



অগ্রগতি নির্ধারক প্রশ্ন

১. পশ্চিমবঙ্গের প্রতিষ্ঠিত কলোনিগুলির নামকরণ ও গঠন বিষয়ে আলোচনা করুন। (২০০ শব্দের মধ্যে)

১৪.৪ কংগ্রেসের খাদ্য ও ভূমিনীতি

১৪.৪.১ খাদ্য নীতি ও খাদ্য আন্দোলন :

সরকার দ্বারা খাদ্যের অধিকার সীমাবদ্ধ করা ও কালো বাজারির রমরমা পরিবেশে

বাংলায় খাদ্য সংকট অবশ্যম্ভাবী হয়ে ওঠে। পশ্চিমবঙ্গের জনগণের খাদ্যের ও তাদের বেঁচে থাকার অধিকার রক্ষার আন্দোলন ইতিহাসের একটি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা। খাদ্যের জন্য সংগ্রাম ১৯৫৯ সালের ১৩ জুলাই শুরু হয়েছিল এবং সেপ্টেম্বর মাস পর্যন্ত অব্যাহত ছিল, যেখানে তৎকালীন কংগ্রেস সরকারের নির্মম দমন-পীড়নের কারণে বহু মানুষ মারা যায় এবং বৃহৎ সংখ্যক মানুষ আহত হয়। এছাড়াও কয়েক হাজার মানুষকে কারারুদ্ধ করা হয়। এই সংগ্রাম বাংলার জনগণের মধ্যে বিশাল বিদ্রোহের রূপ ধারণ করে। লক্ষ লক্ষ মানুষ আন্দোলনে পথে নেমে পড়ে। এই গণআন্দোলন কেবল কলকাতা এবং জেলা শহরগুলিতে সীমাবদ্ধ ছিলনা, বরং প্রত্যন্ত গ্রামগুলিতে ছড়িয়ে পড়ে। হাজার হাজার কৃষক, শ্রমিক, ছাত্র, মধ্যবিত্ত কর্মচারী, পেশাদার এবং অন্যান্য অংশের মানুষ এই সংগ্রামে জড়িয়ে পড়ে।

পশ্চিমবঙ্গের প্রথম মুখ্যমন্ত্রী ডঃ বিধানচন্দ্র রায়ের নেতৃত্বে কংগ্রেস সরকারের অধীনে খাদ্য সংকট এবং প্রায় দুর্ভিক্ষ পরিস্থিতি রাজ্যের অর্থনীতির স্থায়ী বৈশিষ্ট্য হয়ে ওঠে। ১৯৫৫ সাল থেকে বাংলার খাদ্য পরিস্থিতি গুরুতর আকার ধারণ করে, বিশেষ করে এপ্রিল থেকে সেপ্টেম্বরের মাঝামাঝি সময়ে এটি আরও তীব্র হয়ে ওঠে। ১৯৫৫ সালের ডিসেম্বরে চালের মূল্য-সূচক প্রতিটন ৩৮২ টাকা থেকে বেড়ে ১৯৫৬ সালের ডিসেম্বরে ৫৩২ টাকায় পৌঁছে। ১৯৫৯ সালের গোড়ার দিকে পরিস্থিতি আরও খারাপ হয়। খাদ্য ও কর্মসংস্থানের সন্ধানে গ্রামাঞ্চল থেকে শহর, বিশেষ করে কলকাতায় লক্ষ লক্ষ মানুষের ব্যাপক অনাহার, মৃত্যু, আত্মহত্যা এবং মর্মান্তিক অভিবাসন নিয়মিত হয়ে ওঠে। দেশের স্বাধীনতার পর থেকে কংগ্রেস সরকারের শাসন জনগণের সমস্যা সমাধানের পরিবর্তে এমন পরিস্থিতির সৃষ্টি করে যেখানে বিপুল সংখ্যক কৃষক তাদের জমি এবং কর্মসংস্থান হারিয়ে দরিদ্র হয়ে পড়ে।

কমিউনিস্ট পার্টি পি.আই.এফ.আর.সি-র মাধ্যমে সরকারের বিবেচনার জন্য একটি বিস্তৃত বিকল্প নীতি পেশ করে। এই বিকল্প নীতিতে রাজ্যে খাদ্য উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য পদক্ষেপ গ্রহণ, কৃষকদের কাছ থেকে সরাসরি ক্রয় করা শস্যের যথাযথ বন্টন নিশ্চিত করার ব্যবস্থা এবং বৃদ্ধ, অসুস্থ এবং বেকারদের জন্য কিছু ত্রাণ ব্যবস্থা গ্রহণের পরামর্শ দেওয়া হয়েছিল। রাজ্য কংগ্রেস সরকার এই দাবিগুলি মেনে নেওয়ার পরিবর্তে, কমিউনিস্ট পার্টি এবং পি.আই.এফ.আর.সি-র প্রতিটি পরামর্শকে দৃঢ়তার সাথে প্রত্যাখ্যান করে। এর ফলে ১৩ জুলাই মেদিনীপুর জেলায় প্রথম এই সংগ্রাম শুরু হয় এবং দশদিনের মধ্যে এটি অন্যান্য সমস্ত জেলায় ছড়িয়ে পড়ে। ৮ আগস্ট, রাজ্য খাদ্য সম্মেলনের আয়োজন করা হয়, যেখানে ২০ আগস্ট থেকে রাজ্যজুড়ে সরাসরি পদক্ষেপ নেওয়ার আহ্বান জানানো হয়। সেইদিন থেকে আন্দোলন আরও গতিশীল হয় এবং ঘটনাগুলি দ্রুত এগিয়ে যায়। ২৫ শে আগস্ট থেকে রাজ্যজুড়ে বর্বর দমন-পীড়ন শুরু হয়। ১লা সেপ্টেম্বর ছাত্ররা বিক্ষোভে যোগ দেয়। সে সময় কলকাতার কলেজ স্ট্রিট ছিল তীব্র লড়াইয়ের দৃশ্য। ৩১শে আগস্ট থেকে ৪ঠা সেপ্টেম্বরের মধ্যে, পুলিশের গুলি ও লাঠি চার্জে ৮০ জনেরও বেশি মানুষ নিহত এবং ৩০০০জনেরও বেশি আহত হয়। কমপক্ষে ২০০ জন নিখোঁজ হয় এবং হাজার হাজার

লোককে গ্রেপ্তার করা হয়। এই বৃহৎ গণ অবনতি বাংলায় খাদ্য আন্দোলন নামে ইতিহাস প্রসিদ্ধ।

১৪.৪.২ কৃষি ও ভূমি সংস্কার নীতি :

ভূমি সংস্কারের ক্ষেত্রে পশ্চিমবঙ্গ দীর্ঘদিন ধরে দেশের অন্যান্য রাজ্যগুলোর তুলনায় অগ্রণী ভূমিকা পালন করে আসছে। স্বাধীনতার আগে তেভাগার মতো কৃষক আন্দোলনের ফলস্বরূপ ১৯৫৬ সালে পশ্চিমবঙ্গ ভূমি সংস্কার আইন পাশ হয় ও কার্যকর করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। ১৯৪৯-র পশ্চিমবঙ্গ অ-কৃষি জমি প্রজা আইন অনুযায়ী অ-কৃষি জমিতে প্রজাদের ও উপ-প্রজাদের সমস্ত অধিকার ও স্বার্থ, ভূমি-সংস্করণের অঙ্গ হিসাবে রাজ্যকে ন্যস্ত করতে হবে। পশ্চিমবঙ্গ ভূমি-সংস্করণ আইন ১৯৫৫ অনুযায়ী, কোনো ব্যক্তির ২৪.৭ একরের অধিক জমি নিজের কাছে রাখার অনুমতি নেই। The West Bengal Bargadar Act, ১৯৫০, বর্গাদার বা ভাগচাষীদের স্বার্থ রক্ষায় এই আইন গৃহীত হয়। কংগ্রেস শাসনে পশ্চিমবঙ্গে জমিদারী প্রথা বিলোপ সাধনের জন্য পশ্চিমবঙ্গ জমিদারী অধিগ্রহণ আইন, ১৯৫৩ (The West Bengal Estates Acquisition Act, ১৯৫৩) পাশ হয়। এই আইনের ফলে ১৯৫৮ সালের ১৫ এপ্রিল, লর্ডকর্নওয়ালিশ প্রবর্তিত ১৭৯৩ সালের চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের অবসান ঘটে। ১৯৫৬ সালে পশ্চিমবঙ্গ ভূমি সংস্কার আইন পাশ হয়। উদ্দেশ্য ছিল জমির পুনর্বণ্টন, জমির মালিকানার ঊর্ধ্বসীমা নির্ধারণ, রায়তদের খাজনা হ্রাস।

বাম শাসনে পশ্চিমবঙ্গে অপারেশন বর্গা চালু হয় ১৯৭৮ সালে। বর্গাদার বা ভাগচাষিদের স্বার্থ রক্ষায় এই আইন গৃহীত হয়। এই আইনে বলা হয় বর্গাদার যদি চাষের ব্যয় ভারপুরোটা বহন করে তা হলে ৭৫ : ২৫ অনুপাতে ফসল ভাগাভাগি হবে। কিন্তু চাষীর অনুন্নত অবস্থা এখানে বাধ সাধল। চাষের বিপুল ব্যয় ভার বহন করা ক্ষুদ্র চাষীদের দুরূহ হয়ে উঠল। পশ্চিমবঙ্গের আর্থ-সামাজিক-রাজনৈতিক পেক্ষাপটে ১৯৭৮-এর অপারেশন বর্গা এক ঐতিহাসিক ঘটনা। ভারতবর্ষের বিভিন্ন রাজ্যের মধ্যে এটি ছিল দৃষ্টান্ত স্বরূপ। পশ্চিমবঙ্গের ১৯৭০ সালের ইতিহাসে নজর দিলে দেখা যায়, ক্রমশ আগত উদ্বাস্তু মানুষের চাপ পশ্চিমবঙ্গের আর্থ-সামাজিক-রাজনৈতিক পরিস্থিতির উপর উল্লেখযোগ্য প্রভাব বিস্তার করে। ১৯৬০-৭০-এর দশক ভূমি সংস্কার ব্যবস্থায় এক গুরুত্বপূর্ণ মাইল ফলক। একদিকে রাজনৈতিক অস্থিরতার কারণে পশ্চিমবঙ্গের রাজনৈতিক পালা বদল আর অন্যদিকে নানান জমি সংক্রান্ত আন্দোলনের ঘাত-প্রতিঘাতের মধ্যদিয়ে ভূমি সংস্কার ব্যবস্থা এক সুনির্দিষ্ট রূপ নেওয়ার দিকে অগ্রসর হয় এবং ১৯৭৮ সালে অপারেশন বর্গার মাধ্যমে ভূমি সংস্কার ব্যবস্থা কার্যকর হয়। ভারতবর্ষের একাধিক রাজ্যের মত পশ্চিমবঙ্গে জমিকে কেন্দ্র করে কৃষকদের মধ্যে অসন্তোষের বহিঃপ্রকাশ বিভিন্ন সময়ে এবং বিভিন্ন ভাবে ঘটেছে। ১৯৭৮ সালের অপারেশন বর্গা কেবল মাত্র দু'একদিনের আন্দোলনের ফলাফল নয়, যদিও এর পেক্ষাপট গড়ে উঠেছিল অনেক আগেই। দার্জিলিং জেলার পার্শ্ববর্তী এলাকা নকশালবাড়ীতে ১৯৬৭

সালে শুরু হয় কৃষক আন্দোলন। নকশালবাড়ীর এই কৃষক আন্দোলনের উদ্ভাবন পশ্চিমবঙ্গের আর্থ-সামাজিক-রাজনৈতিক পরিস্থিতিকে অশান্ত করে তোলে। শুরু হয়েও খুব অল্প সময়ে মধ্যে ১৯৭০ সালে এই নকশালবাড়ীর কৃষক আন্দোলন ভেঙ্গে যায়। কৃষক সংগ্রামের এই প্রত্যক্ষ ধারা অস্তমিত হলেও এই আন্দোলন পশ্চিমবঙ্গের রাজ্য-রাজনীতিতে উল্লেখযোগ্য প্রভাব বিস্তার করে। এহেন নকশালবাড়ীর কৃষক আন্দোলন ১৯৭৮ সালে অপারেশন বর্গার ভিত্তি প্রস্তরের প্রেক্ষাপট নির্মাণে অনেকাংশে সহায়ক হয়।

এই সময়ে অর্থনৈতিক বৈষম্যের বাস্তব চিত্রটি ছিল অতি দুর্বিসহ। বিশেষভাবে লক্ষ করা যায়, গ্রামীণ জনসাধারণের ১.৪ অংশ বাদ দিলে, সমগ্র কৃষি পরিবারের প্রায় অর্ধেক পরিবারের জমির মালিকের হাতে ছিল পরিবার পিছু ২.৫ একরের কম পরিমাণ জমি। জমি বণ্টনের চূড়ান্ত বৈষম্যের বাস্তব চিত্রটি শুধু মাত্র নকশালবাড়ী অঞ্চলের ভূমিহীন কৃষক, ক্ষেতমজুর ও বর্গাদারদের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল না। এই পরিস্থিতি সামগ্রিক ভাবে পশ্চিমবঙ্গের সমগ্র ভূমি কাঠামোতেও পরিলক্ষিত হয়। পশ্চিমবঙ্গের প্রক্রিয়াগত জমি বণ্টনের শতকরা হিসাবের তথ্যে ও বৈষম্য লক্ষ্য করা যায়। পশ্চিমবঙ্গে ১৯৬০-৬১ খ্রিস্টাব্দে ১২.৭৪ শতাংশ পরিবারের অধীনে মাত্র ২.৩০ শতাংশ একর জমি ছিল, যেখানে কেবল মাত্র ৪.৫০ শতাংশ পরিবারের অধীনে ছিল ২৫.৮২ শতাংশ একর জমি। তাই সার্বিক ভাবে বলা যায় যে, কৃষিক্ষেত্রে ধনী-দরিদ্রের অসাম্যের বাস্তব পরিস্থিতি শুধু মাত্র নকশালবাড়ী অঞ্চলে নয়, সমগ্র পশ্চিমবঙ্গেই ছিল।

সারা পশ্চিমবঙ্গে জমি মালিকানা সংক্রান্ত বৈষ্যমের সাথে সাথে জমি হারানোর অসহায় পরিস্থিতি ও সেই সময় পরিলক্ষিত হয়। পশ্চিমবঙ্গের বাঁকুড়া, বীরভূম, মেদিনীপুর সহ একাধিক এলাকায় কৃষিজীবী সম্প্রদায় অর্থনৈতিক বৈষম্যের সাথে জমি হারানোর কঠিন পরিস্থিতির মুখোমুখি হয় এবং এর বিরুদ্ধে লড়াইও শুরু করেন। এই প্রেক্ষাপটে এক প্রকার নতুন ধরনের সমস্যার উদ্ভব ঘটে। পশ্চিমবঙ্গে রায়তরা চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের সময় অ-চাষযোগ্য পতিত জমিকে চাষযোগ্য করে তোলে। পাশাপাশি এই সময় বনদপ্তর তার সীমানা নির্ধারণের প্রক্রিয়া শুরু করে। বনদপ্তরের সীমানা নির্ধারণের ফলে বহু চাষযোগ্য জমিই বনবিভাগের সীমানার মধ্যে পড়ে যায় এবং বনদপ্তর সেই জমির উপর দখলী স্বত্বকায়েম করে। এহেন পরিস্থিতিতে বহু কৃষক তার জমির মালিকানা হারিয়ে ফেলে এবং ভূমিহীন কৃষকে পরিণত হয়। একদিকে জমির মালিকানাধীন বৈষম্য, অন্যদিকে জমি হারা কৃষক অসন্তোষ এহেন অগ্নিগর্ভ পরিস্থিতি প্রায় সমস্ত পশ্চিমবঙ্গে ছড়িয়ে পড়ে। এমত পরিস্থিতি রাজ্যের বামফ্রন্ট সরকার 'অপারেশন বর্গা' শুরু করে। যেখানে বিজ্ঞপ্তির দ্বারা মৌজায় জানিয়ে দেওয়া হতো, জমির তথ্য যাচাই করে বর্গাদার সুনিশ্চিত করে তাদের নথিভুক্ত করা হয় এবং বর্গাদার ও মালিক উভয়পক্ষের স্বার্থ সুরক্ষিত করে এই অপারেশন বাস্তবায়িত হয়। মূলত এই ভূমি নীতির ফলে পশ্চিমবঙ্গের কৃষিকেন্দ্রিক সমস্যা সুরাহার পথ দেখে এবং জোতদার ও মহাজনদের দাপট সীমায়িত হয়।

১৪.৫ পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা ও তার প্রতিফলন

একটি নির্দিষ্ট সময়কালে কিছু নির্দিষ্ট উন্নয়নমুখী লক্ষ্য পূরণের জন্য যে কর্মসূচি গৃহীত হয় তাই ব্যাপক অর্থে পরিকল্পনা বলে পরিচিত। পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা ছিল ভারতের উন্নয়নে সরকার গৃহীত একটি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ, যা পরবর্তীতে বিভিন্ন ক্ষেত্রে ইতিবাচক ও নেতিবাচক উভয় প্রভাব ফেলেছিল। স্বাধীন ভারতের প্রধানমন্ত্রী জওহরলাল নেহেরু সমাজতান্ত্রিক চিন্তনে ১৯৫১ সালে প্রথম এই পরিকল্পনার সূত্রপাত ঘটান।

১৪.৫.১ পরিকল্পনা কমিশন গঠন

১৯৪৭ সালে ভারত স্বাধীন হলে গতানুগতিক ভাবনার দ্বারা রক্ষণশীল গোষ্ঠীর অনিচ্ছায় পরিকল্পিত অর্থনীতির স্বপ্ন বাস্তবায়িত হল না। তাই পরিকল্পনা কমিশন সাংবিধানিক মর্যাদা পেল না, তবে সংবিধানের নির্দেশমূলক নীতি অংশে অর্থনৈতিক ও সামাজিক অগ্রগতির জন্য পরিকল্পনার প্রয়োজনকে স্বীকার করে নেওয়া হলো। মোট ১২ জন সদস্য নিয়ে পরিকল্পনা কমিশন গঠিত হয় এবং তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী জওহরলাল নেহেরু এর সভাপতি হন।

১৪.৫.২ পরিকল্পনার মুখ্য উদ্দেশ্য

সংবিধানে উল্লেখ না থাকলেও ভারতীয় নেতৃত্ব ভারতের অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য পরিকল্পনাকেই মূল ভিত্তি হিসেবে গ্রহণ করেছিল। এক্ষেত্রে একদিকে সমাজতান্ত্রিক চিন্তা ভাবনা এবং সোভিয়েত মডেল যেমন ভারতীয় নেতৃত্বকে প্রভাবিত করেছিল, একই সঙ্গে ভারতের বাস্তব অর্থনৈতিক অবস্থা, দীর্ঘ ২০০ বছর ধরে ঔপনিবেশিক শাসনের অধীনে থাকার ফলে যে অনুন্নত অর্থনৈতিক কাঠামো ছিল, তাকে উন্নয়নশীল হিসেবে গড়ে তোলার প্রয়াস ভারতীয় নেতৃত্বকে পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার মাধ্যমে উন্নয়নের কর্মসূচি গ্রহণ করতে সাহায্য করেছিল।

প্রতিটি পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনারই কতকগুলি নির্দিষ্ট লক্ষ্য থাকে এবং সেই লক্ষ্য পূরণের উদ্দেশ্যে সেই পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনাটিকে গড়ে তোলা হয়, তা সত্ত্বেও কতকগুলি সামাজিক লক্ষ্য মাথায় রেখে প্রথম থেকেই ভারতে পরিকল্পনা মাফিক উন্নয়নকে গ্রহণ করা হয়েছিল। এই লক্ষ্যগুলিকে কোনো নির্দিষ্ট বছরের পরিকল্পনার লক্ষ্য হিসাবে চিহ্নিত করা হয় না। সামগ্রিক ভাবে ভারতীয় পরিকল্পনার লক্ষ্য হিসেবে এগুলিকে গণ্য করা হয়—

১। জাতীয় আয়ের বৃদ্ধি।

২। বিনিয়োগের হার বৃদ্ধি করা, যাতে সামাজিক ভাবে বিনিয়োগের হার বৃদ্ধি পায়।

৩। আয় এবং সম্পদের ক্ষেত্রে বৈষম্য দূর করা; এক্ষেত্রে আঞ্চলিক বৈষম্য দূর করার ওপরও বিশেষ নজর দেওয়া হয় এবং আঞ্চলিক উন্নয়নের ক্ষেত্রে যাতে একটি ভারসাম্য রক্ষা করা যায়, সেদিকেও দৃষ্টি রাখা।

৪। কর্মসংস্থানের ক্ষেত্র প্রসারিত করা, অর্থাৎ চাকরির সংস্থান বাড়ানো।

৫। অর্থনীতির বিভিন্ন ক্ষেত্র, যেমন কৃষি, শিল্প, পরিষেবা এগুলির পারস্পরিক উন্নয়ন ঘটানো; এই প্রতিটি ক্ষেত্রকেও বিভিন্ন শ্রেণিতে ভাগ করা যেতে পারে এবং সেই প্রতিটি শ্রেণিই যাতে সঠিক ভাবে গড়ে উঠতে পারে, সেদিকে পরিকল্পনা দৃষ্টি দেয়।

৬। অর্থনীতির ক্ষেত্রে আধুনিকীকরণ, অর্থাৎ বিশেষ করে কৃষি এবং শিল্প ক্ষেত্রে আধুনিক যন্ত্রপাতির প্রয়োগের ব্যবস্থা করা।

৭। সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ যে বিষয়টি মাথায় রেখে পরিকল্পিত উন্নয়ন শুরু করা হয়েছিল, তা হল দারিদ্র্যের হার যথা সম্ভব কমানো এবং বি.পি.এল. (Below Poverty Line), দারিদ্র্য সীমার নীচে বসবাস করা মানুষের সংখ্যা যথাসম্ভব হ্রাস করা।

যে পরিস্থিতিতে প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছিল, সে সময়ে ভারতের অর্থনৈতিক অবস্থা ছিল অত্যন্ত দুর্বল। একদিকে দারিদ্র্য দূরীকরণ এবং অপরদিকে ধনী-দরিদ্রের বৈষম্য কমানো, পরিকল্পনা অনুযায়ী উন্নয়নের লক্ষ্য চিহ্নিত করা ও সেই লক্ষ্যে উপনীত হওয়া সহজ কাজ নয়। এই ভাবে অর্থনীতির দিক থেকে এই ধরনের জটিল কিছু বিষয় উন্নয়নের লক্ষ্য হিসেবে রাখা হয়েছিল, কারণ সেই সময়ে ভারতীয় নেতৃত্বের মূল লক্ষ্য ছিল, একটি অত্যন্ত অনুন্নত ও বিপর্যস্ত রাষ্ট্রকে উন্নয়নশীল রাষ্ট্রে রূপান্তরিত করা।

১৪.৫.৩ পরিকল্পনা কমিশনের কার্যাবলি

১। দেশের বস্তুসম্পদ ও মানবসম্পদের পরিমাপ ও মূল্যায়ন।

২। সম্পদ বৃদ্ধির সম্ভাবনাগুলির অনুসন্ধান ও এই উদ্দেশ্যে পরিকল্পনা গ্রহণ।

৩। প্রাপ্ত সম্পদ ও চাহিদার মধ্যে সামঞ্জস্য বিধান করে অগ্রাধিকার চিহ্নিত করণ।

৪। অগ্রাধিকারের ক্ষেত্রগুলোতে ব্যয় বরাদ্দের সুপারিশ করা।

৫। উৎপাদনের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ।

৬। শিল্পায়নের সমস্যা ও সম্ভাবনাগুলো চিহ্নিত করা ও উপযুক্ত ব্যবস্থার সুপারিশ।

৭। আমদানি-রপ্তানি, বাণিজ্য বিস্তার বিষয়ে পরিকল্পনা গ্রহণ।

৮। শিক্ষা ও স্বাস্থ্য পরিকল্পনা গ্রহণ।

৯। দ্রব্যমূল্য ও জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণের জন্য পরিকল্পনা গ্রহণ।

১০। তপশিলি জাতি ও উপজাতি, অনুন্নত শ্রেণি, নারী ও শিশুদের কল্যাণের জন্য বিশেষ পরিকল্পনা গ্রহণ।

১১। কেন্দ্র ও রাজ্যের চাহিদার মধ্যে সমন্বয়।

১২। কেন্দ্র বা রাজ্যের বিশেষ অনুরোধক্রমে বিশেষ কোনো সমস্যার সমাধান কল্পে পরামর্শ দান।

১৩। পরিকল্পনা রূপায়ণ ও প্রয়োগের জন্য প্রয়োজনীয় প্রশাসনিক ব্যবস্থা নির্দেশ।

১৪.৫.৪ পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার সার্বিক সংক্ষিপ্ত পরিচয়

১। এই পরিকল্পনাগুলো কৃষি উন্নয়নকে প্রাধান্য দিয়েছিল খাদ্য উৎপাদন বাড়াতে এবং জীবন-যাপনের মান উন্নত করতে।

২। এই পরিকল্পনার প্রধান লক্ষ্য ছিল খাদ্য ঘাটতি মোকাবেলা করা ও শিল্পখাতেও কিছু উন্নতির চেষ্টা লক্ষ্য করা যায়।

৩। এই পরিকল্পনা দ্রুত শিল্পায়ন ও ভারী শিল্প স্থাপনের উপর বেশি জোর দিয়েছিল।

৪। এই পরিকল্পনা কৃষি এবং গম উৎপাদনে ক্রমোন্নতির উপর জোর দিয়েছিল, কিন্তু চীন-ভারত যুদ্ধের কারণে অর্থনীতিতে দুর্বলতা দেখা যায়।

৫। এই পরিকল্পনা খাদ্য উৎপাদন বৃদ্ধি, দারিদ্র্য হ্রাস ও কর্মসংস্থান সৃষ্টির ওপর জোর দিয়েছিল।

৬। এই পরিকল্পনা অর্থনৈতিক উদারী করণের সূচনা করে, যা মূল্য নিয়ন্ত্রণ ও রেশনের দোকান বন্ধ করার দিকে পরিচালিত করে।

৭। এর ফলে খাদ্যের দাম বৃদ্ধি পায় এবং জীবনযাত্রার ব্যয় বাড়ে।

৮। এই পরিকল্পনায় যোজনা কমিশন বিকেন্দ্রীকরণ পরিকল্পনা চালু করে।

৯। এই পরিকল্পনা অর্থনৈতিক সংস্কারের মাধ্যমে দ্রুত প্রবৃদ্ধি অর্জনে সফল হয়।

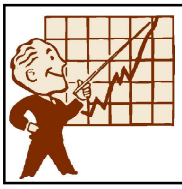
১৪.৫.৫ ইতিবাচক দিক :

- শিল্প ও অবকাঠামোর উন্নতি ও প্রক্রিয়াকরণ।
- কৃষিতে শক্তি ও স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জনের চেষ্টা।
- অর্থনৈতিক অবস্থার উন্নতি।
- জীবনযাত্রার মানোন্নয়ন।

১৪.৫.৬ নেতিবাচক দিক:

- যুদ্ধ ও অর্থনৈতিক সংকট।
- মুদ্রাস্ফীতি।
- দারিদ্র্য ও বৈষম্য।
- রাজনৈতিক অস্থিরতা।

সামগ্রিকভাবে, পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা ভারতীয় শাসন ব্যবস্থা উন্নয়নের প্রচেষ্টার চিন্তনে প্রযুক্ত হলেও এর কাঠামোগত ত্রুটি ও বাস্তবায়নের অসংগতি ক্রমান্বয়ে পরিকল্পনাগুলোর নেতিবাচক দিকটিকে বেশি করে উন্মুক্ত করে। যদিও এ কথা বললে অত্যুক্তি হবে না যে এই পরিকল্পনাগুলোর সুষ্ঠু প্রয়োগনীতি গৃহীত হলে তা ভারতের পক্ষে খুবই হিতকর হতো।



অগ্রগতি নির্ধারক প্রশ্ন

৩. পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার ফলাফল বিষয়ে আলোচনা করুন। (১৫০ শব্দের মধ্যে)

১৪.৬ অধ্যায় সংক্ষেপ

সমাজকে অংশ করেই যেহেতু সাহিত্যের হয়ে ওঠা তাই সমাজের বহুমাত্রিক প্রভাবগুলোর আঁচ সাহিত্যে পড়তে বাধ্য। আমরা জানি, বঙ্গভঙ্গ প্রস্তাবনা থেকে স্বাধীনতা উত্তরকাল পর্যন্ত বঙ্গীয় সমাজব্যবস্থা বহুমাত্রিক ঘটনা দ্বারা ক্ষত-বিক্ষত হয়েছে। এই প্রক্রিয়া আরও মারাত্মক হয়ে ওঠে যখন বাঙালি দেশভাগের বদলে পায় আত্মবিচ্ছেদের বেদনা ও অনুপ্রবেশের প্রবল আঘাতে নিজের অধিকার বাঁচিয়ে রাখার লড়াই। সুতরাং বাঙালির এই সকল সামাজিক বিক্ষোভের আঘাত যে সাহিত্যের পাতায় আছড়ে পড়তে বাধ্য তা বলার অপেক্ষা রাখে না। তাই বঙ্গীয় সাহিত্য বারংবার গলা ফাটিয়েছে এই সকল অসহায় মানুষের সঙ্গী হয়ে। আসলে বঙ্গের এই সামাজিক পরিস্থিতি ভারত কেন বিশ্ব সামাজিক ইতিহাসের বিরলতম ঘটনা যার দৃষ্টান্ত আমরা আলোচ্য অধ্যায়ে পাই। আর বিরল ঘটনার সার্থক আত্মপ্রকাশ তো সাহিত্যের মননশীল হাত ধরেই হওয়া সম্ভব।



১৪.৭ অধ্যায়টি পাঠ করে আমরা কী শিখলাম

- স্বাধীনতা উত্তর বঙ্গের সমাজ গঠনের বিষয়ে বিশেষ জানা সম্ভব হলো।
- পশ্চিমবঙ্গের রাজনৈতিক পটপরিবর্তন ও দুই ভিন্ন সরকারের বিভিন্ন নীতি ও তার ফলাফল সম্পর্কে জানা গেল।
- ভারতীয় সমাজ তথা অর্থনীতির অন্যতম পরিচয় যে পরিকল্পনা সে বিষয়ে বিশদে জানা সম্ভব হল।



১৪.৮ অতিরিক্ত পঠন

গঙ্গোপাধ্যায়, সৌম্যেন্দ্র (১৩৬৭ বঙ্গাব্দ); স্বদেশী আন্দোলন ও বাংলা সাহিত্য; কলকাতা : বসুধারা প্রকাশনী

চন্দ্র, বিপিন (১৯৬০); আধুনিক ভারত: ঔপনিবেশিকতাবাদ ও জাতীয়তাবাদ; কলকাতা : পাল পাবলিশার্স

দাশগুপ্ত, শ্রীঅমর প্রসাদ (১৯৬০); আধুনিক ভারত পরিচয়; কলকাতা : ইণ্ডিয়ান বুক কনসার্ন

বন্দ্যোপাধ্যায়, হিরন্ময় (১৯৭০); উদ্বাস্তু; কলকাতা : শিশু সাহিত্য সংসদ প্রাইভেট লিমিটেড

মুখোপাধ্যায়, হরিসাধন ও মুখোপাধ্যায়, উমা (১৩৬৮ বঙ্গাব্দ); স্বদেশী আন্দোলন ও বাংলার নবযুগ; কলকাতা: সরস্বতী লাইব্রেরী

সরকার, সুমিত (১৯৬০); আধুনিক ভারত; কলকাতা : কেপি বাগচী অ্যান্ড কোম্পানী

সেন, মনিকুন্তলা (১৯৮২); সেদিনের কথা; কলকাতা : নবপত্র প্রকাশন

১৪.৯ অগ্রগতি নির্ধারক উত্তর-সংকেত

১। কলকাতার দক্ষিণে যাদবপুরের বিজয়গড় ..... এ ধরনের অনেক কলোনির নামকরণ করা হয়েছিল ..... কলকাতার দক্ষিণ ও উত্তর প্রান্তে বাপুজি নগর..... এভাবে উত্তর নির্মাণ করুন। (দ্রষ্টব্য১৪.৩. অংশ)

২। ভূমি সংস্কারের ক্ষেত্রে পশ্চিমবঙ্গ দীর্ঘ দিন ধরে দেশের অন্যান্য রাজ্যগুলোর তুলনায় অগ্রণী ভূমিকা ..... ১৯৫৬ সালে পশ্চিমবঙ্গ ভূমি সংস্কার আইন পাশ হয়। ..... এভাবে উত্তরটি গড়ে তুলুন। (দ্রষ্টব্য ১৪.৪.২ অংশ)

৩। শিল্প ও অবকাঠামোর উন্নতি ও প্রক্রিয়া করণ। ..... উত্তরটি এভাবে নির্মাণ করুন। (দ্রষ্টব্য১৪.৫.৫ ও ১৪.৫.৬ অংশ)

১৪.১০ আদর্শ প্রশ্নাবলি

১। বাংলার সমাজিক ইতিহাসে কলোনি প্রতিষ্ঠার কারণ ও বাস্তবায়ন সম্পর্কে আলোচনা করুন।

২। পশ্চিমবঙ্গ সরকার গৃহীত খাদ্যনীতি ও তার ফলশ্রুতিতে সংগঠিত খাদ্য আন্দোলন সম্পর্কে বুঝিয়ে বলুন।

৩। অপারেশন বর্গা বলতে কি বোঝানো হয়, এই বিষয়ে বিশদে আলোচনা করুন।

৪। বাংলার আর্থ-সামাজিক প্রেক্ষাপটে ভূমি সংস্কার নীতির প্রভাব কতখানি আলোচনা করুন।

৫। ভারত সরকার গৃহীত পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা বিষয়ে আলোচনা প্রস্তুত করুন।

৬। পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার উদ্দেশ্য ও কার্যাবলি সম্পর্কে নাতিদীর্ঘ আলোচনা প্রস্তুত করুন।